উপদেশ ।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ।

প্রথম সংস্করণ ।

নববিধান ট্রষ্ট

কলিকাতা ।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ—১৮৪০ শক ।

মূল্য ।০ আনা ।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH,

AT THE MANGALGANJ MISSION PRESS.

3, RAMANATH MAZUMDAR'S STREET.

1919.

ভূমিকা।

—*—

পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্বের ফাইল হইতে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সমস্ত উপদেশ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহারই কয়েকটী উপদেশ এই খণ্ডে ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। সমস্ত উপদেশ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই উপদেশ প্রকাশের জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই উপদেশ প্রকাশের ভার নববিধান ট্রষ্টের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রচারাশ্রম।
৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
১১ই মাঘ, ১৮৪০ শক, কলিকাতা।

শ্রীগণেশপ্রসাদ।

সূচীপত্র।

উপদেশ।

উদ্বোধন। *

সায়ংকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে অনন্ত আকাশের শূন্যতার মধ্যে যে প্রাণস্বরূপ বিরাজ করিতেন, নব পৃথিবী সৃষ্ট হইলে তাহার মধ্যে জ্বলন্তভাবে যাঁহার আত্মা বিরাজ করিত, অদ্যাপি সকল পরমাণুর মধ্যে যে দেবতা সর্ব্বকাল বিদ্যমান, এই উপাসনা মন্দিরে এখন তিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই সময়ে কত ব্যক্তি হয়ত তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে তিনি যেমন বিশেষভাবে বিদ্যমান, এমন আর অন্য কাহার প্রতি নহে। যদ্দ্বারা ভারতের সকল নীচতা চলিয়া যাইবে, অদ্য সেই মঙ্গল-সমুদ্র খনন হইয়াছিল। অদ্য আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। আমরা দীনহীন, কোথায় আমরা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিব, না আপনার শুষ্কতা দেখিয়া নিরন্তর হাহাকার করি; কিন্তু আমাদের ন্যায় দীনহীন ব্যক্তিরাও আজ আনন্দ প্রকাশ করিবে—ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব অনুভব করিবে। এখন অনেক পণ্ডিত ভারতের অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন; কিন্তু কতক-

---

* গোপাল মল্লিকের বাড়ী—সিন্দুরিয়াপটী, চিৎপুর।

গুলি ব্রাহ্মের নিকট সে সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হয় না। আমাদের দুঃখজীর্ণ মাতৃভূমির সৌভাগ্য দেখিয়া হৃদয় উথলিত হইতেছে, আমাদের আত্মা উৎসাহিত হইতেছে; কিন্তু আমাদের হস্তের ক্ষমতা দেখিয়া কি এই আশা হইতেছে? কি দেখিয়া এই বিশ্বাস মনে উদয় হয়? আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, রাজরাজেশ্বর বলিতেছেন, ভারতের ভয় নাই; কারণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথমে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার বিষয়ে অল্প আশা ছিল বটে, কিন্তু যাঁহার অঙ্গুলির নির্দ্দেশে কোটি কোটি নক্ষত্র ভ্রাম্যমান হইতেছে তিনি বলিয়াছেন, যে দিবস ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের সৌভাগ্য আরম্ভ হইয়াছে। হে মাতৃভূমি-প্রিয় ভ্রাতৃগণ! অদ্য উৎসাহে হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দাও। রাজরাজেশ্বর যখন আমাদের সম্মুখে অনন্ত জ্যোতিতে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে আশা দিতেছেন, তখন আর ভয় কি? যদিও আমরা জরাজীর্ণ, তথাপি তাঁহার সেই মুক্তিপ্রদ চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিব। ভ্রাতৃগণ! আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার উপাসনা কার্য্যে নিযুক্ত হই।

ব্যাখ্যান।

"হে প্রভো! দেবতাদিগের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ নাই, এবং তোমার কার্য্যের তুল্য আর কোন কার্য্য নাই। তোমার সৃষ্ট সকল জাতি, হে ঈশ্বর! তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার পূজা করিবে, এবং তোমার নামের গৌরব প্রকাশ করিবে। কেননা তুমি মহান্ এবং তুমি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর; তুমি একমাত্র ঈশ্বর।"

ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং। *

সায়ংকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক ;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

"ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" এই জয়-পতাকা হস্তে করিয়া আমরা প্রত্যূষে এই মহানগরীর পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছি। এক্ষণ সেই জয়পতাকা এই উৎসব-গৃহের দ্বারে বায়ু-হিল্লোলে উড্ডীয়মান হইতেছে। "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" এই সত্য, যাহা আমাদের অপবিত্র আত্মা কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নিরবধি উচ্চারণ করিতেছে, ইহাই আমাদের ভবিষ্যতের দণ্ডায়মান হইবার স্থান। আমাদের চরণের নিম্নে ভূমি আন্দোলিত হয়, এমনি ভয়ানক আমাদের অবস্থা। আমাদের দেশের নিকট আমরা ঘৃণিত হইয়াছি। কোন দিকে আশা নাই। সুতরাং এই সত্যটী আমরা সর্ব্বদা ধারণ করি। আমরা সকল স্থানেই এই জয়ধ্বনি ঘোষণা করি ; ইহা ভিন্ন অন্য বিশ্বাস অসম্ভব। ঈশ্বর আমাদের ইতিবৃত্ত মধ্যে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, তাঁহার কৃপা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান দশায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কয় বৎসর কত ভ্রম, কত বিচ্ছেদ, কত নাস্তিকতা ইহার উপরে বহমান হইয়াছে। কোথায় সেই দর্শনশাস্ত্রের নাস্তিকতার ভয়াবহ প্রবাহ, কোথায় সেই নূতন সূর্য্যের আবির্ভাব। এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ মধ্যে তাঁহার করুণাই সেতুস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার কৃপা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিয়াছে ; তাঁহারই কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থায় অনেক বিরোধ বর্ত্তমান আছে বটে, ইহার মধ্যে নানাপ্রকার বন্ধুতার ভেদ আছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার কৃপা প্রকাশিত

---

* গোপাল মল্লিকের বাড়ী—সিন্দুরিয়াপটী, চিৎপুর।

রহিয়াছে। ইহা হইতে আমাদের পুনর্জ্জন্ম হইল। এই বিচ্ছেদ হইতে সেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে, যে ধর্ম্ম সকল দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় এই বিরোধের যে পবিত্র ফল তাহা প্রসূত হইবে; ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার হস্ত হইতে যে সত্যের বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা তাবৎ ভারতবাসীদিগকে খাদ্য দিবে, আমাদের এই বিশ্বাস, এই ভবিষ্যদ্বাণী। সেই বিশ্বাসের ধর্ম্ম আমাদের হইবে। ঈশ্বরের কৃপাবারি অভিষিঞ্চিত হইবে। সেই হৃদয়ভার পর্য্যালোচনা করিলে শোকসঞ্চার হয়; কিন্তু যখন আবার তাঁহার কৃপা স্মরণ করি, তখন অশ্রুমোচন করি, কারণ ঈশ্বর সত্যস্বরূপ ও আনন্দপূর্ণ। ৩৮ বৎসর যদি তিনি তাঁহার শিশুকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহার অনুগ্রহে যদি নূতন ফল প্রসূত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার স্নেহ-চক্ষু তাহার উপর এখনও নিপতিত থাকিবে।

যাঁহার জ্ঞান-সূত্র ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, ত্রিকালকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাবৎ বিশ্বভার যাঁহার দক্ষিণ হস্তে, তিনি জানেন হৃদয়ভেদ হইতে শান্তি-প্রদ অমৃত প্রসূত হয় কি না। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ অন্ধের যষ্টি, ভারতের সম্বল। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁহার কৃপার উপরেই আমরা নির্ভর করিতেছি। এই পরাধীন দেশের একমাত্র সম্বল ব্রাহ্মধর্ম্ম; ইহাকে তিনি কখনও বিনাশ করিবেন না। আমরা দীপ্তশিরা হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; সেখানে সেই ব্রহ্মকৃপা— কেবলমাত্র ব্রহ্মকৃপাই বিদ্যমান। যেরূপ ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে, সেইরূপ প্রতিজনের বিষয়ে। যদি কেহ দিবানিশি হাহাকার করিতে থাকেন তাহাকে বলিতে পারি, হে পাপাত্মা দীপ্তশিরা ভ্রাতঃ! তোমার মলিনতা অপসারিত হইবে, কারণ ব্রহ্মকৃপা আমাদের সহায়। সেই ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর স্বচক্ষে

তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এতদিন যদি মলিনত্ব ও দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া থাক, ভ্রাতঃ! আর দিন কয়েক তিতিক্ষাকে ধারণ কর, অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। সেই কৃপাসিন্ধু, অনাথের নাথের ইচ্ছায় তোমার হৃদয় কখনও অপূর্ণ থাকিবে না। অতি কঠিন বস্তু তাঁহার সংস্পর্শে কোমল হয়, তোমার হৃদয়ও কোমল হইবে। কি আনন্দের সমাচার! আমাদের পাপ তাপ চলিয়া যাইবে, আমরা সেই জ্যোৎস্না সম্ভোগ করিব। অদ্যকার উৎসবদিবসে তাঁহার কৃপা এই আহ্লাদের সমাচার আনিয়া সমুদয় দীন দুঃখীকে বলিতেছে, তাঁহার কৃপা সকল স্থানে প্রজ্বলিত হইতেছে। হে শ্রোত্রবান্ মনুষ্য! এই সময় যদি তুমি বধির হইয়া যাও, এই সমাচার শুনিয়া তুমি বধির হইও। হে দূরদেশাগত ভ্রাতৃগণ! কিসের আকর্ষণে তোমরা এত দূরদেশে আসিয়াছ? কিসের প্রত্যাশায় হে ভগ্নীগণ! তোমরা এই লোকালয়ে আসিয়াছ? ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! তোমরা কি ঈশ্বরের জন্য আইস নাই? যে পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবে, যে যে মোহ কোন প্রকারে হৃদয় হইতে যায় নাই, তাহা চলিয়া যাইবে, এই জন্য কি আইস নাই? ভ্রাতৃগণ! যদি ইহার জন্য উপস্থিত হইয়া থাক, তাহা হইলে "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং" অন্তরের সহিত এই অমূল্য সত্য উপার্জ্জন কর। এই সাম্বৎসরিক আর শীঘ্র আসিবে না। কল্য হইতে এক বৎসর আবার আরম্ভ হইবে, কত লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিবে, এই উৎসবের উৎকৃষ্ট ব্যবহার করিয়া লও; উদাসীন হইও না। ভ্রাতৃগণ! ভগ্নীগণ! অদ্য হইতে যেন সাধুপ্রতিজ্ঞা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। এক বৎসর কি করিব? যদি পরলোকে যাইতে হয়, তাঁহার কৃপাতরণী যেন লাভ করিতে পারি। ভ্রাতৃগণ! কোমল-হৃদয়া ভগ্নীগণ! এই শুভ সমাচার ভুলিও না,

তাঁহার করুণা আমাদের হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যে প্রার্থনার ক্ষমতা অদ্য শুনিয়াছি, অদ্য হইতে যেন সেই প্রার্থনা অবলম্বন করি। সেই বিনয় দ্বারা অহঙ্কারের মস্তক চূর্ণ করি; সেই বিনয় যেন আমাদের সকলের অহঙ্কার হয়।

ভয় কি? ভাবনা কি? "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং।" কারণ তিনি আমার পিতা, তিনি আমার মাতা; আমরা পাপী, তিনি পাপীর পরিত্রাতা। সেই পাপীর পরিত্রাতাকে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করি। পিতঃ, নূতন কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, এইমাত্র বলিতেছি, দুঃখী যে প্রকারে রাজার নিকট করিয়া থাকে, সেই ভাবে তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, অদ্য যে সত্য আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিলে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমরা তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছি। যে কার্য্যে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইবে, সেই কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছি। ভূতলে পতিত, কর্দ্দমে জঘন্য হইয়াছি। কি করিব! যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, চিরকাল সেই ব্রত প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিব, এই আমার আশা। আমার শরীর আত্মাকে তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্ণ, জিহ্বা অপকর্ম্মের দিকে ধাবিত হয়, তোমাকে চিন্তা করিতে যায় না। কিরূপে এই অপবিত্র শরীরকে গ্রহণ করিবে? এই রক্তকে অস্থিকে গ্রহণ কর, এই জ্ঞানকে গ্রহণ কর, হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে গ্রহণ কর। মস্তককে অবনত করিতেছি, তোমার পবিত্র আশীর্ব্বাদ দান কর, কৃতার্থ হইয়া গৃহে গমন করি। হে কৃপাময়! তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করি।

ইহকাল ও পরকাল। *

রবিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৭৯২ শক; ২৬শে জুন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

একদিকে ইহকাল, অপর দিকে পরকাল, মধ্যে মৃত্যু দণ্ডায়মান। একদিকে পৃথিবী, অন্যদিকে অনন্তলোক রহিয়াছে, মধ্যে মৃত্যুর সাগর প্রসারিত। কোথায় এই জীবন, কোথায় সেই পরকাল; কোথায় এখানকার ভাব, আর কোথায় সেইখানকার ভাব! যে দিকে দৃষ্টি করি, কি শোভা পৃথিবী ধারণ করিয়াছে! কি শোভা উদ্যান, পুষ্প, বৃক্ষ, নদ, নদী, জীব জন্তুর! শুভ্র ঊষার বিশুদ্ধ বায়ু-হিল্লোল, সন্ধ্যাকালের হেমবর্ণ মেঘমালা; দ্বিপ্রহর দিবার প্রচণ্ড জ্যোতিঃ, নিশীথ সময়ের গম্ভীর শান্তি; যে দিকে দেখি, অনুপম পরিচ্ছদে জগত বিভূষিত রহিয়াছে! দর্শন করিয়া কবির নয়ন পরিশ্রান্ত হইল না। জড়জগতের ত এই শোভা, জীব জন্তুর ত এই সৌন্দর্য্য; মনুষ্য পরিবারের আবার কি নূতন সৌন্দর্য্য! সন্তানের ভক্তি, স্বামী স্ত্রীর প্রণয়, বন্ধুতা, হিতৈষণা, মাতা পিতার স্নেহ, কত প্রকারে মানবসমাজকে সুশোভিত করিয়াছে। জ্ঞানের উন্নতি, ভাবের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, সভ্যতার উন্নতি, নানা প্রকার বহির্বিষয়ের উন্নতি, বিধিমতে মনুষ্যের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। এতদিন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অদ্যাবধি ইহা পুরাতন হইল না। প্রতিদিন নূতন শিক্ষালাভ করিতেছি, নূতন সুখ ভোগ করিতেছি, নূতন প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইতেছি। জগতের চারিদিকের শোভা ও শান্তিসুখের হিল্লোল মধ্যে বোধ হয় যেন শোক, মৃত্যু এখানে অবস্থিতি করে না। এমন সুন্দর পরমেশ্বরের পৃথিবী এই, ইহার মধ্যে আবার ইহকাল আর পরকাল কি?

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সংসারের ব্যস্ততার মধ্যে মৃত্যু ও পরকাল এই কথা শুনিয়া লোকে চমকিত হয়। কম্পিত হয় মনুষ্যের হৃদয়, যখন সে মনে করে সেই লোক যেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, পিতা মাতা নাই, স্ত্রী পরিবার, স্বজন বন্ধু কেহ নাই ; যেখানে পাপীর বিচার হয়, দুরাত্মাদিগের দণ্ড হয়। সেই অন্ধকারময় অজানিত লোকের কথা শুনিয়া কাহার হৃদয় না তটস্থ হয় ? অদ্যকার দুর্ভাগ্য কল্য যাইতে পারে। অদ্যকার বিচ্ছেদের পর কল্য পুনর্ম্মিলন, অদ্যকার অনুন্নতি ও পাপের পর কল্য অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু কি হইবে সেই লোকেতে যেখানে কালের পরিবর্ত্তন নাই, জীবনের পরিমাণ নাই, অবস্থার পর্য্যায় নাই। যখন আবার পরলোক, ইহলোক দুই লোকের সঙ্গে প্রভেদ করি, আরও মন চমকিত হয়। পরলোকের পথ কোথায়, কোন দ্বার দিয়া সেখানে প্রবেশ করিতে হয়, কে বলিতে পারে ? সেই পথের নাম, দ্বারের নাম ভয়ানক। তাহার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর নাম উচ্চারণ করিলে উল্লাসের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, বিষয়-লালসার উচ্চ মস্তক ধূলিতে অবনত হয়। "অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম, ক্রোধ রিপুগণ।" মৃত্যুর নামে জগত অবসন্ন ; পণ্ডিত ভয়ে সঙ্কুচিত, মূর্খ ভয়ে বিহ্বল, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, নরনারী সকলেই বিশুষ্ক-বদন। এই যে মৃত্যু, ইহা পরলোক যাইবার সোপান। অন্ধকারের পর অন্ধকার বৃদ্ধি হইল, ভয়ের উপর ভয়। কোথা সেই পরলোক, তাহার সহিত আবার মৃত্যুর ক্লেশ। এমন সুন্দর শরীর যাহাকে এত বস্ত্র অলঙ্কারে সুশোভিত করিলাম, তাহা অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইতে চলিল। সেই শরীর শবে পরিণত হইয়া বিকৃত আকারে জঘন্য শয্যাতে, শ্মশানে শয়ন করিল। ধনীর সুন্দর তনু দীনের কুৎসিত দেহের সঙ্গে একত্রে শয়ন করিয়াছে। হে মনুষ্য, কোথায় তোমার জীবনের

অহঙ্কার বিবেচনা করিয়া দেখ। সকলে একই স্থানে যাইতেছি। ধূলি ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত হইল ; যেখানে ধনীর শরীরের ধূলি, সেইখানে দরিদ্র-দেহের ধূলি। শূন্য ধনীর অট্টালিকা, দরিদ্রের পর্ণকুটীরও শূন্য ; ধনীর বিধবার হাহাকার ধ্বনি দরিদ্রের দুঃখিনী বিধবার চীৎকারের সহিত মিশ্রিত হইল। হে সম্ভ্রান্ত শব, কোথায় তোমার অট্টালিকা, তোমার ধনের অভিমান কোথায় ? তোমার সৌন্দর্য্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, মান সম্ভ্রম কোথায় ? নীরব সেই ধনীর মুখ। যখন জিজ্ঞাসা করি, হে দরিদ্রের শব, কোথায় তোমার পর্ণকুটীর, ছিন্নবস্ত্র, শাকান্ন কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ? জঘন্য ভাবে এখানে শয়ন করিয়া আছ কেন ? কোন উত্তর পাই না। এই ভয়ঙ্কর পথ দিয়া আমাদিগকেও পরলোকে প্রবেশ করিতে হইবে। হে মনুষ্য ! তোমার জীবনের স্রোত অনন্তকালের সাগরে মিশ্রিত হইতে যাইতেছে, সাবধান হইয়া পৃথিবীর পথে পদপরিচালনা করিও। এই সমুদায় কথা শুনিলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। চতুর্দ্দিকের উন্নতি, জগতের শোভা, পরিবারের বন্ধন সকলই স্বপ্ন বোধ হয়, অসার বোধ হয়, আত্মা উদার হয়, বিহ্বল হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহলোকে পরলোকে বিশেষ প্রভেদ অবস্থিতি করে না। মৃত্যু তত ভয়ানক নহে, হঠাৎ যেমন হৃদয় মনে করে। এই পৃথিবীর মধ্যে জীবন মৃত্যুর পরিচয় দেয় এবং আত্মা অনন্তকালের আভাস প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর ইহলোকের, ঈশ্বর পরলোকের। "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে, এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না।" তাঁহারই ইহজীবন, তাঁহারই সেই অনন্ত জীবন। পরকালের ভয় কিসে ? কেবল পাপ করিয়াছি বলিয়া মৃত্যু পরলোককে ভয়। এই পৃথিবীতেই যে তোমার পাপের দণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত পরকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে

না। একজন পাপীর জীবন আলোচনা কর, একজন সরল পাপীকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহার হৃদয়ের কি অবস্থা? কি উত্তর পাইবে? সে বলিবে, পরলোকের যে যন্ত্রণায় ভয় করিয়াছিলাম, ইহলোকেই তাহার আরম্ভ হইয়াছে। আমার শরীর বিকৃত, আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন, কত শ্রান্তি কষ্ট আমার জীবন বহন করিতেছে। দুষ্কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে কি আমার শান্তি হয়? পরিবারের মিষ্ট কথাতে, আত্মীয়দিগের যত্নে কি আমার হৃদয় মুগ্ধ হয়? আমি কোথাও আরাম পাই না। এইরূপে জীবন থাকিতে থাকিতে আমার অন্তরে পরলোকের যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, পৃথিবী মধ্যে নরকের শাস্তি মনুষ্যের দেহ মনকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। কিন্তু যখন শরীর বিনষ্ট হইবে, আত্মা যখন শরীরবিহীন হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইবে, পাপ প্রবৃত্তি থাকিবে, পাপের জঘন্য ভাব, চিন্তাও স্মরণ থাকিবে; কিন্তু পাপ চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তৎপরিবর্ত্তে অনুতাপ গ্লানি ও অসহায়তা কেবল হৃদয়কে দগ্ধ করিবে। তখনকার কি শোচনীয় অবস্থা! পুণ্যবানের প্রতিও এই প্রকার উক্তি। পুণ্যবান্ ইহলোক মধ্যে পরলোকের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তিনি বলেন, স্বর্গেতে দেবতারা যে সুখ সম্ভোগ করেন, আমি এই পৃথিবীতে তাহার আস্বাদন পাইতেছি। এইরূপে ইহলোকের মধ্যে পরলোকের আভাস আমরা লাভ করি। হে ভক্ত, এই যে সুখ দেবপ্রসাদে তোমার ধর্ম্মসাধন মধ্যে লাভ করিয়াছ ইহা জীবনের প্রথম, কিন্তু স্বর্গেও ইহার শেষ নাই। এই হৃদয়ের সুখ পরলোকের সুখে পরিণত হয়। যে দয়াময়ের ক্রোড় সম্ভোগ করিয়া তুমি এত শান্তি পাইলে, কত তোমার আনন্দ হইবে, অনিমেষ-নয়নে যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। এখানে ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি-

তেছ, কিন্তু সেখানে স্পষ্টরূপে অনুভব করিবে। যেমন তিনি তোমাকে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তেমনি স্পষ্টরূপে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সূর্য্যের জ্বলন্ত মুখ যেমন প্রতীয়মান হয়, তদপেক্ষা অধিকতর কান্তির সহিত পিতার মুখ সন্তানের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে। যাঁহার চরণ সম্ভোগ করিবার জন্য এত ব্যাকুল-নয়নে দেখিতেছ, অনন্তকালের জন্য তাঁহার শীতল আশ্রয় লাভ করিবে। কোন ভয়, কোন দুর্গতি থাকিবে না। মঙ্গলের পর মঙ্গল অজস্ররূপে তোমার উপর বর্ষিত হইবে। কিন্তু হৃদয় বলে, আমি কিরূপে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিব; হৃদয় বিদীর্ণ হয় যখন মনে করি যে, সকলকে ছাড়িয়া শ্মশানে শব হইয়া পড়িয়া থাকিব। প্রিয়তম হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণসম প্রিয় বন্ধু, আর কখন তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবে না। এই জগতের উন্নতি আলোক আনন্দ সকলই ছাড়িতে হইবে। হে ঈশ্বরের ভৃত্য, এত অধীর কেন? বল দেখি কাহার হস্তে এই জগৎ। বল তোমাকে পরিবারের মধ্যে কে সুখে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন? তুমি যে বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া কাতর হইতেছ, তাহাদের অপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু আছেন, তাঁহাকে লাভ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? আরও বিবেচনা কর, হয়তঃ তোমার মাতা পিতা, কিম্বা স্ত্রী পরলোকে গিয়াছেন। প্রথমে যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইল, শোকে কত অস্থির হইয়াছিলে, স্মরণ আছে? মনে হইয়াছিল, চিরদিনের জগৎ শূন্য হইল, আর কখন সুখী হইতে পারিব না। এখন কি আর তাঁহাদের বিয়োগ-যন্ত্রণা তত অসহ্য বোধ হয়? এই যে তোমার মুখ আবার আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। নূতন আত্মীয়, নূতন আমোদ, নূতন আশা, নূতন কার্য্যভার পাইয়া সে পুরাতন শোকাবেগ সংবরণ করিয়াছ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, যদি পরমেশ্বরের ক্রোড় পাও, তাহা হইলে অবশিষ্ট শোক

সহ্য করিতে কি সমর্থ হও না? পরলোকে গিয়া আবার যখন নূতন শান্তি উল্লাস পাইবে, এই পৃথিবীর বন্ধু বান্ধবদিগকেও সেই ভাবে দেখিবে। সুখের জন্য এত অবসন্ন হও কেন? যিনি ইহজীবনে এত সুখী করিয়াছিলেন, পরকালে তাঁহার ক্রোড় কি সুখশূন্য? যখন তুমি পরলোকে যাইবে, দয়াময় তোমার ক্ষতি পূর্ণ করিবেন। অতএব ভীত হইও না; অন্ধকার মধ্যে নিপতিত হইও না। ইহলোকে যাঁহার, পরলোকেও তাঁহার।

হে ভ্রাতৃগণ! মৃত্যুর জন্য, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হও। পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ এই যে, জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। কল্পনা-পরবশ, সংসার-পরতন্ত্র হইয়া মনে করিতেছ, মৃত্যু ও তৎপরের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশকর। জানিও, জীবনের ক্লেশ মৃত্যুর ক্লেশের অপেক্ষা অধিক। এই পৃথিবীর কর্ত্তব্যভার, পরিশ্রম, প্রতিদিনের সংগ্রাম বহন করিয়া মনুষ্য পরকালে বিশ্রাম লাভ করে। সময় থাকিতে পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহার পদাশ্রয় লওয়ার নাম ইহকালে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাঁহার চরণে পাপী যখন আশ্রয় লইবে, পরলোকের সম্বল হইবে; যখন মনে করিবে তিনি সর্ব্বস্ব, পরকালের আর ভয় থাকিবে না। পরমেশ্বর পাপীকে তাঁহার পদাশ্রয় প্রদান করিয়া মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম।

রবিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৭৯১ শক ; ১০ই জুলাই, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

সত্য সরল বস্তু, সহজ বস্তু, স্বাভাবিক বস্তু—সত্যের ন্যায় স্বাভাবিক বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। আর মিথ্যা যেমন কুটিল, বক্র এবং অস্বাভাবিক, এমন আর কিছু জগতে দৃষ্ট হয় না। শিশু সন্তান যখন বিষয়-বাসনা কুভাব অন্তরে ধারণ করে নাই, তখন সে সত্যের বলে সত্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। সত্য যেমন সরল, সত্যধর্ম্মও তেমনি সরল, তেমনি স্বাভাবিক। যে ধর্ম্ম কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি তর্কমাত্রের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম যেমন কুটিল, অস্বাভাবিক, এমন আর কিছুই নহে। ধর্ম্মের মধ্যে যে যে ভাব সরল, সত্য, সেগুলি যেমন সকল লোকের পক্ষে সহজ, তেমন আর কোন ভাব নহে ; যে গুলি স্বকপোল-কল্পিত, সে গুলি বুদ্ধির অগম্য। সত্য ধর্ম্ম অতি সহজ বিষয় লইয়া উপদেশ দান করেন। সত্যের মূল যদিও মনুষ্য-প্রকৃতির নীচতম ভূমিতে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সত্যের শাখা প্রশাখা এত প্রশস্ত যে, তাহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিলেও হানি হয় না। আমাদিগের এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া থাকি। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সহজ ভাব লইয়া আমাদিগের সম্মুখে আসেন। অতি কঠিন তর্ক যুক্তির মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারে গমন করিতে হয় না ; পণ্ডিতদিগের নিকটেও গমন করিবার আবশ্যক নাই। দুইটি কথা ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব, এই দুইটি কথা লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবের অনন্ত উন্নতি সাধন করেন। মনুষ্যের অন্তরে যে সকল সত্য নিহিত আছে, সে সমুদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য। সেই সত্য একখানি পুস্তকে ও এক জাতিতে পরিবদ্ধ নহে। সমুদয় কাল, সমুদয় লোক মধ্যে সেই ঈশ্বরের

পিতৃত্ব, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি তাবৎ সত্য নিহিত রহিয়াছে। পরমেশ্বরের দয়া, পরমেশ্বরের শক্তি, আনন্দস্বরূপ, মহান্ ভাব ইত্যাকার সমস্ত সত্যই তাঁহার পিতৃত্বের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মনুষ্যের তাবৎ উন্নতি মহত্ত্বও তাঁহার ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বর্ত্তমান। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ সত্য সমূহ মূর্ত্তিমানরূপে অগণ্য ঘটনা ও পদার্থ মধ্যে দৃষ্ট হইবে। সত্য যাহা, তাহা সমুদয় জগতের বস্তু। তাহাতে তাবৎ মনুষ্যের অধিকার। এক দেশ, কি এক জাতিকে লইয়া, কি কতকগুলি মনুষ্যকে লইয়া থাকিতে পারে না। তাহাতে সকল জাতির অধিকার। পৃথিবীতেই কেবল সত্য বদ্ধ নহে। তাহা পৃথিবী হইতে পৃথিবীতে, স্বর্গ হইতে স্বর্গেতে উত্থান করে এবং অনন্তলোকে অবস্থান করে। সত্যের লক্ষণ এইরূপে সহজভাবে আরম্ভ হইয়া মনুষ্যকে অধিকার করে, এবং স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যেও পরিসমাপ্ত হয় না। এই সত্য আবার অবিনশ্বর।

সত্যকে যখন সহজ সামান্য বলিয়া বোধ হয়, তখন যেন বোধ হয়, সেই সত্যকে বিলোপ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর নাই। ঈশ্বর যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সত্যও তেমনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার একটি ক্ষুদ্রতম জীবকে, ক্ষুদ্রতম সৃষ্ট বস্তুকে যেমন কাহার সাধ্য নাই যে ধ্বংস করে, সত্য ধর্ম্মকে বিনাশ করাও তেমনি অসম্ভব। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি যত কেন মিথ্যা প্রচার করুক না, তথাপি এই সত্যের এত বল আছে যে, সমুদয় পৃথিবীকে ধূলিবৎ তুচ্ছ করিয়া জগৎকে পরাজয় করিবে। জগতে ত কেবল মিথ্যার প্রাদুর্ভাব। শত সহস্র লোক মিথ্যার মহিমা প্রচার করিতেছে। এমনি মিথ্যার প্রভাব যে, যদি ঈশ্বর জগৎকে না ধরিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইত। মিথ্যা ধর্ম্মের মধ্যে, মিথ্যা বিদ্যার মধ্যে, মিথ্যা সভ্যতার মধ্যে। কিন্তু যে মিথ্যা বলে, সে লোক

সমক্ষে বলিতে ভয় করে। রাজাধিরাজ যদি মিথ্যা বলেন, লোকে তাঁহাকেও মিথ্যাবাদী বলে। দীনহীন ব্যক্তি যদি সত্য বলে, তাহার সমক্ষে রাজাও কম্পিতকলেবর হইয়া যায়। পৃথিবীতে যত সত্য প্রচার হইয়াছে কাহার দ্বারা? পরাক্রমশালী রাজা ও ধনিগণের দ্বারা নহে, দীন দরিদ্রদিগের দ্বারা। সেই দরিদ্র "সত্যমেব জয়তে" বলিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিল, তাহার শোণিতধারে পৃথিবী অভিষিক্ত হইল। সেই সত্যের পরাক্রমে পৃথিবী পরাজিত হইল। সেই ছিন্নবস্ত্র দরিদ্রকে দেখিয়া রাজা পণ্ডিত সমুদয় দূরে পলায়ন করিল। এই সত্যের ভাণ্ডার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এ সত্য এক জাতি, একজন লোকের জন্য নহে। আমরা যাহাকে সত্য ধর্ম্ম বলি, তাহা পূর্ণ সত্যের প্রতিকৃতি। এক্ষণে আমাদের হয়ত কত ভ্রম থাকিতে পারে। পূর্ব্বে আমরা কত অধর্ম্মকে ধর্ম্ম নাম প্রদান করিতাম। তবে আমাদিগের একমাত্র সম্বল ছিল, কি না সত্যপরায়ণতা। দুর্ব্বল মনুষ্য যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহাতে আপনা অপনি দুর্ব্বলতা আনে। কেবল সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাবধি বঙ্গদেশে উন্নতি লাভ করিতেছে। ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া ভ্রমকে অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরমেশ্বর সমুদয় জগতের সত্য করিলেন। কাহাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে আনীত হইল? কাহার দ্বারা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে প্রচারিত হইতেছে? দরিদ্র অজ্ঞান ইহাদিগের দ্বারা। বঙ্গদেশে ত কত রাজা ধনী আছেন, তাঁহাদিগের হস্তে সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন ও প্রচারের ভার দেওয়া হইল না কেন? ইহার উত্তর ভবিষ্যৎ প্রদান করিবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্ত মধ্যে কত অশ্রুবারি নিপতিত হইয়াছে, কত লোকের

শরীর শীর্ণ হইয়াছে। কিসের অনুরোধে? কেবল সত্যের অনুরোধে। দীন দরিদ্র মনুষ্যের কথা ধনীরা শুনিতে না পারেন, কিন্তু আমরা জানি, এই ব্রাহ্মধর্ম্মে কত শত লোকের উপকার হইয়াছে। পরমেশ্বর এই বঙ্গদেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া সমুদয় ভারতের, সমুদয় পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবেন। সকলকে এই বিশ্বাস করিতে হইবে। কেবল তুলনা ও অনুভব করিবে কেন? যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া গমন করিবে, সেই-খানেই তাহার জয় স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। বিদেশী মনুষ্যদিগের মধ্যে গমন কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সঞ্চারণ করিতেছে দেখিবে; দেখিতে পাইবে, সকলে ভ্রাতা বলিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় আসাম, কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় বম্বে, কত সহস্র সহস্র স্থানে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উচ্চারণ করে, তাহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিয়া দেখ, গ্রহণ করে কি না। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, আমি স্থানে স্থানে যেখানে গমন করিয়াছি, যেখানে সত্য ধর্ম্মের কথা উচ্চারণ করিয়াছি, সেখানে সমাদর, স্নেহ আমার শরীরকে, আত্মাকে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। একি আমার গুণে? কখনই নহে, কেবল এই সত্যের মহিমাতে। প্রাসাদের উপর উত্থান করিয়া দেখ, ভারতের সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-প্রদীপ প্রদীপ্ত হইয়াছে; এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যেখানে যায়, সেখানেই ভ্রমরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। অনেক সাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর, দেখিবে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সত্যপ্রচার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। একজন সামান্য ব্যক্তি সত্য বলিয়া রাজা প্রজাকে অবনত করিতেছে; তাহার কথা শুনিয়া শত শত নরনারী একত্র হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেন। এইরূপে বঙ্গ ভারত একত্র হইতেছে। সকল দেশ পিতার

চরণে সমাগত হইতেছে। এই সময়ে যে আন্দোলন শুনিতেছি, তাহার কি অর্থ নাই ? একজন মনুষ্যের নামে যে যত ঘৃণা বিদ্বেষ উথলিত করিতে চায় করুক, কিন্তু যে সত্য তিনি প্রচার করিতেছেন, সেই সত্যের জয় কে নিবারণ করিবে ? সমুদয় পৃথিবীকে তাহা অধিকার করিবে। সেই সত্যের আলোক আমরা হস্তে ধারণ করিতেছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই যে সত্য, ইহাতে আমাদিগের বিশ্বাস কতদূর ? এ দেশের এবং অন্য দেশের লোক ত সত্যের মহিমা শুনিয়া চমকিত হইল ; কিন্তু হে ব্রাহ্ম ! বল দেখি, তুমি এই সত্যকে কতদূর সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে জীবন, মৃত্যু। তাহাতে এমন বস্তু আছে যাহার জন্য মনুষ্য শরীরের রক্ত দিতে পারে। যদি এ বিশ্বাস তুমি না কর, তাহা হইলে বৃথা তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, বৃথা তোমার ব্রহ্মমন্দির। ঈশ্বর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা একটি রত্ন তুল্য। ইহা বক্তৃতার বিষয় নহে ; ইহা মৃত্যুর বিষয়, জীবনের বিষয়। এই যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি, ইহা হৃদয়ের ধন। যিনি রক্ত দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিয়াছেন। আর যাহারা কেবল মুখে সত্যের মহিমার পরিচয় দেয় এবং যাহাদিগের জীবন তাহার কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না, ধিক্ তাহাদিগকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে সমধিকরূপে প্রচারিত হইতেছে না কেন ? এই জন্য যে, ঈশ্বরের সত্যে ব্রাহ্মদিগের সত্য বলিয়া বিশ্বাস নাই। হায়, ইহা অতি দুঃখের বিষয় ! দয়াময় ঈশ্বর কি এখান হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্য দেশে লইয়া যাইবেন ? বঙ্গদেশ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। ইহার দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে গেলে স্বদেশহিতৈষীর নয়নে অশ্রুজল ধরে না। সে কথা আমরা সকলেই জানি। এক্ষণে আমরা এই বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। কই ব্রাহ্মগণ ! তোমাদিগের

দ্বারা ভ্রাতা ভগিনীর কল্যাণ সংসাধিত হইল? এখনও সত্যকে স্বপ্ন, স্বপ্নকে সত্য বলিতেছ? তোমাদের দ্বারা কত দূর ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হইল? কিন্তু এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তোমাদিগের দ্বারা পরমেশ্বর জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচয় দিবেন যে, অতি নীচ হইলেও মুক্তি ও উন্নতির উপায় হইতে পারে। এমন অবসন্ন দেশের হীন ঘৃণিত মনুষ্য পরিত্রাণ পাইলে অন্য কোন মনুষ্যের ভয় থাকিবে না। ভারতে সত্যের জয় পরিত্রাণের জয় হউক, মনুষ্য সত্যের বশীভূত হউক। সত্যের পতাকা পৃথিবীতে আলোক দান করুক, স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে অনন্তলোকে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করুক।

আত্মবলিদান।

রবিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৭৯২ শক ;
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

সকল ধর্ম্মে বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন না কোন জীবের রক্তপাত হয়। কেন না, সাধারণতঃ তাহার জীবনের মূল্যে অন্য লোক পরিত্রাণ ক্রয় করে। এই যে হিন্দুদিগের মহোৎসব উপস্থিত, গৃহে গৃহে পূজার আড়ম্বর, ধূপ ধূনার গন্ধ, বিষম কোলাহল, বাদ্যের ঘটায় চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত, তন্মধ্যে একটি নির্দ্দোষ জীবের প্রাণ বধ হইতেছে। তীক্ষ্ণ খড়্গে তাহার মস্তক ছিন্ন হইল! এইরূপে অন্যান্য দেশেও পশু পক্ষী এবং মনুষ্যের রক্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। কিসের জন্য? ঈশ্বরের ক্রোধ নিবারণের জন্য। আমরা জানি যে, যিনি পশু পক্ষী মনুষ্য সকলকে রক্ষা করেন, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, কেহ রক্তধারায় মেদিনীকে অভিষিক্ত করে; কিন্তু তথাপি মনুষ্যের স্বভাব-গত যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেতেই এই বলিদানের প্রথা আছে। এই বলিদানের কি কিছু তাৎপর্য্য নাই? ইহার মধ্যে অবশ্য কোন গূঢ় অর্থ আছে। ধর্ম্মেতে শান্তি হয় ইহা সত্য; ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ হয়, পুণ্য হয়, ইহকালের পরকালের সদ্গতি হয় সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সেই সদ্গতি পাইবার কি উপায়? কেবল শুষ্কভাবে কি তাহা আকাঙ্ক্ষা করিলেই পাইব? পরিত্রাণ লাভ করিতে গেলে সাধনার, তপস্যার প্রয়োজন। শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে পরমেশ্বরের বর লাভের জন্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কত পরিশ্রম, কত তপস্যা করিয়াছিলেন। সে নিয়মে তপস্যা করিবার বিধি প্রচলিত নাই। প্রচলিত নাই বলিয়া কি

ধর্ম্মের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে অবহেলা করিব? তবে সে মহাবাক্যের অর্থ কি যে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্মের পথ দুর্গম? সেই পথে যখন শরীর আত্মাকে নিযুক্ত করিলাম, তখন কষ্ট পরিশ্রম তো হইবেই হইবে। যে ব্যক্তি শাণিত ক্ষুরধারে হস্তক্ষেপ করে, স্বাভাবিক নিয়মে তো তাহার রক্তপাত হইবেই। ধনের জন্য, মান, বিদ্যা, খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য কত পীড়া সহ্য করিতেই না হয়, তবে ধর্ম্মের জন্য কি কিছু সহ্য করিতে হইবে না? ধর্ম্মের জন্য যাহারা ক্লেশ পায়, তাহাদিগের নিমিত্ত কত উচ্চ পুরস্কারের অঙ্গীকার শুনিতে পাই। যদি ধর্ম্মেতে কোন কষ্ট না থাকে, তবে তজ্জন্য পুরস্কার বা অঙ্গীকার, ইহার অর্থ কি? অতএব ধর্ম্মের পথ চিরদিনই কঠিন, এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সর্ব্বকালেই তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের জন্য ক্লেশ বহন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মের ইতিহাস যদি পাঠ করি, দেখি যেখানে সরল ভাবে ঈশ্বরের ভৃত্য পৃথিবীতে অগ্রসর হইয়া পরমেশ্বরের ভাব প্রচার করিয়াছে, সেখানে মনুষ্যেরা শাণিত অস্ত্র লইয়া তাহার বক্ষে আঘাত করিয়াছে। যেখানে অসত্য অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছে, সেখানে সবল মনুষ্যেরা তাহার প্রতি বিষম শত্রুতা প্রকাশ করিয়াছে। সত্যের পতাকা হস্তে লইয়া যিনি পৃথিবীতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার শরীর হইতে শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়াছে এবং যতদূর তিনি গমন করিয়াছেন, ততদূর তাঁহার শোণিতের দাগ লোকে দেখিতে পাইয়াছে। রক্ত না দিলে ঈশ্বরের বীজ সারবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হয় না। যন্ত্রণারূপ অস্ত্রফলকে জীবনের ভূমি কর্ষণ না করিলে ঈশ্বরের বারিধারা বর্ষিত হয় না। যেখানে ধর্ম্মের সাধন, সেখানে মনুষ্যের ক্লেশ ও রক্তপাত—ইহাই প্রকৃত বলিদানের অর্থ। নির্দ্দোষ পশুদিগকে যন্ত্রণা দিয়া পুণ্য ক্রয় করিতে হইবে না। যদি আপনাকে,

সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র করিতে চাও, ছাগরক্তপাত করিলে কি হইবে? নিজের রক্তপাত করিতে প্রস্তুত হও। যদি উজ্জ্বল বসনে শরীর শোভিত করিতে চাও, যদি আতর গোলাপ চন্দন লেপন করিয়া শরীরকে সুগন্ধিময় করিতে চাও, যদি অশ্ব শকট দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে চাও, হইতে পার; কিন্তু তাহার দ্বারা তোমার ধর্ম্মসাধনের সম্ভাবনা নাই, এবং ব্রাহ্মসমাজেরও বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর এমন না করুন, যেন আমাদিগের মাতারা পুত্রহীন হন, ভার্য্যাগণ বিধবা হন, পুত্র-কন্যাগণ পিতৃহীন হয়; কিন্তু যদি পরম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে গিয়া জননীর ক্রোড় শূন্য হয়, স্ত্রী পতিহীনা হয়, গৃহমধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, তথাপি ঈশ্বরের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে, জীবনের ব্রত প্রতি-পালন করিতে হইবে। পুত্র পরিবার, মাতা পিতা, গৃহ সম্পত্তির ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সত্য প্রচার করিতে উদ্যত হও, তাঁহার প্রদর্শিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ কর। তোমাদিগেরও মঙ্গল হইবে, আত্মীয় স্বজনেরও মঙ্গল হইবে, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে, স্বদেশের মুখোজ্জ্বল হইবে। সকল লোকে তোমাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে, বিঘ্ন বিপদের ঝটিকা তোমাদিগের শরীর আত্মার উপরে আঘাত করিতে পারে, তথাপি "সত্যমেব জয়তে" বলিয়া ঈশ্বরের কার্য্য সাধন কর। যেখানে মনুষ্য আপনার জীবন বিক্রয় করিয়া সত্যধর্ম্ম সঞ্চয় করে, সেখানে প্রকৃত শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। যেখানে মনুষ্য ঈশ্বরাজ্ঞার অনুরোধে নিজের জীবন বলিদান দেয়, সেখানে সে অনন্ত জীবনের উৎকৃষ্ট সম্বল লাভ করে। আর যেখানে মনুষ্য কেবল সাংসারিক ও ইন্দ্রিয়সুখে লোলুপ হইয়া শরীর মনের বীর্য্যক্ষয় করে, সেখানে ইহলোক পরলোক উভয় লোকেরই আশা-সূর্য্য অস্তমিত হয়। মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, দূর

হইতে যুদ্ধধ্বনি আসিতেছে। সহস্র কামানের ভীমনিনাদে চতুর্দ্দিকে নরনারীর হৃদয় বিকম্পিত হইতেছে, অস্ত্রের সহিত অস্ত্রের প্রতিঘাতে যোদ্ধৃগণ ধরাশায়ী হইতেছে, শোণিতধারায় পৃথিবীর কর্দ্দম, নদীর জল আরক্তিম হইতেছে। এ সকল কিসের জন্য? সামান্য নরপতিদিগের অহঙ্কারের জন্য—সাংসারিক গৌরবের জন্য। যদ্যপি মনুষ্যের পরাক্রম প্রতিপত্তির জন্য লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুকে আহ্বান করিতে সমর্থ হয়, তবে রাজরাজেশ্বরের সত্য সমরে একজন মনুষ্যও কি অগ্রসর হইবে না? তাঁহার মহিমা প্রচার করিবার জন্য কি কেহ কোন কষ্ট স্বীকার করিবে না? হে অন্যায়পথগামী মনুষ্যগণ, আর বিলম্ব কেন? এখন সেনাপতি সত্যপতি ধর্ম্মপতি পরমেশ্বরের বিশ্ববিজয়ী নাম চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে; তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হও, সত্যপতাকা হস্তে ধারণ কর, ধর্ম্মব্রতে দেহ প্রাণ উৎসর্গ কর, আত্মবলিদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, জীবন সার্থক হইবে। এইরূপে বলিদানের ভাব ব্রাহ্মসমাজে আসার অতিশয় প্রয়োজন। এ সময় হয়ত রক্তপাতের প্রয়োজন হইবে না। কৃষক যখন ভূমি কর্ষণ করে, সে কি সূর্য্যের প্রখর কিরণ গ্রাহ্য করে, না, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারার প্রতি মনোযোগ করে? সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতেছে, ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য সংগ্রহ করাই তাহার লাভ, কিন্তু সে ক্লেশ পরিশ্রম গণনা করে না। সেইরূপ আমরা এক্ষণে যেন সত্য-ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারি। আত্মা যদি তাহাতে ক্লেশ পায়, একগুণ ক্লেশের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর সহস্র গুণ সুখ দিবেন। ইহা বলিতেছি না, এখনই ভিখারী হও। এই নিবেদন, পরমেশ্বর যে কার্য্য-ভার, যে যন্ত্রণা-ভার মস্তকে দিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ কর। তিনি যাহাকে দরিদ্র করেন, ধনী অপেক্ষাও সে সৌভাগ্যবান্। তিনি যাহাকে যন্ত্রণা দান

করিয়াছেন সে ধন্য, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। পিতা যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকেই তাড়না করেন। কত লোক ঐশ্বর্য্যের স্তম্ভে বসিয়া আছে, সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে। তাহাদের ত ঈশ্বর যন্ত্রণা দিতে চান না; একগুণ ঐশ্বর্য্যকে শতগুণ করেন। দুঃখ দান করেন কাহাদের? যাহারা দরিদ্র। ক্লেশযুক্ত হইয়া যাহারা কম্পিত হয়, তাহাদের উপরে তিনি আরও আঘাত করেন। হে দুঃখী ভ্রাতাগণ! তোমাদের উপর ঈশ্বরের অনেক করুণা। এই যে যন্ত্রণা পাইতেছ, পরমেশ্বর দয়া করিয়া ইহা তোমাদের দান করিতেছেন, এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করিবেন। ভ্রাতৃগণ! পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের প্রতি, ধনীর ধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। অতি আহ্লাদের সহিত আপনাদের দারিদ্র্য, দুঃখ, অজ্ঞানতার ভার মস্তকে লও। আহ্লাদের সহিত উদারচিত্তে দয়াময়ের নাম মুখে বল; পরমপিতার দয়া পাইলে আদরের সহিত লোক তোমাদিগকে গ্রহণ করিবে। এই জন্য পিতা তোমাদের এই অবস্থায় আনিয়াছেন। এক বিন্দু রক্ত যদি পড়ে, শত বিন্দু অমৃত লাভ করিবে। মৃত্যু ত একদিন সকলেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ধন্য সে, যে মরণের সময় দয়াময় বলিয়া মরিতে পারে! ঈশ্বর করুন, আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়। যদি তাঁর সত্য প্রচার হয়, আমাদিগের জন্ম সার্থক হইবে, আমাদিগের জন্মভূমি সার্থক হইবে। তিনি এইরূপে আমাদিগের জীবনকে চিরকাল তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ রাখুন!

সমস্ত পৃথিবী এই ধর্ম্মের গৃহ।

(মাসিক সমাজে বিবৃত)

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক ;
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

নয় মাসকাল পরে ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র বেদী হইতে সকল ব্রাহ্মভ্রাতা ও উপাসক মণ্ডলীকে সম্ভ্রম ও আদরের সহিত নমস্কার করি। তোমাদের আত্মীয় ও সেবক হইয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, এক্ষণে যাঁহার হস্ত ধরিয়া দূরদেশে গিয়াছিলাম, তাঁহারই অঙ্গুলি ধরিয়া আবার স্বদেশে আসিলাম। সকল ভক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চরণে, পরে স্নেহ সহানুভূতি তোমাদের জন্য। বহুকাল পর আবার তোমাদের সেবা করিতে আসিলাম, দাসকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যখন আমরা কেবল স্বদেশের প্রতি দৃষ্টি করি তখন মনে হয়, এই আমরা কয়েকজন ভিন্ন বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্মের আর গতি নাই, এই বিশ্বাসে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া, কত সময়ে আপনাদের সর্ব্বনাশ করি। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য যখন আপনাদের উপর নির্ভর করি, ইহাকে বলের ও মহত্ত্বের আকর মনে না হইয়া দুর্ব্বল মনে হয়। এই দুর্ব্বলতা একদিন আমার হৃদয় অনুভব করিয়াছিল। যখন সাগরের বক্ষে একাকী এই দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম, তখন ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, গভীর দুঃখ আসিয়া প্রাণকে মলিন করিল। তৎপর সাগর অতিক্রম করিয়া যখন বিদেশে উপস্থিত হইলাম, সেখানে আবার বিদেশীয়দিগের সহানুভূতি না পাইয়া এই ভয় দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সেই বিদেশে যখন অসহায়ের সহায় সেই দীননাথ পরমেশ্বর হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আশা এবং উৎসাহ দিলেন, তখন অন্তরের অন্তরে আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন আসিল। চারিদিকে শীতল বায়ু এবং অন্ধকার, বাহিরে সহায়তা প্রেম ও বন্ধুতার অভাব ; কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের হস্তলিখিত পবিত্র সত্য শাস্ত্র প্রকাশিত। প্রথমতঃ নিজের ক্লেশ, তারপর জগতের ক্লেশ ও অভাব দেখিয়া যখন ঈশ্বরের ভৃত্য জগতের সেবা করিতে যায়, তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার আপনার প্রত্যাদেশরূপ মহা অগ্নি দ্বারা ভৃত্যের নিরাশা এবং সন্দেহ-অন্ধকার দূর করেন। দাসের অন্তরের অত্যন্ত ক্ষীণ যে প্রদেশ, ঈশ্বর প্রথমে সেই স্থানে প্রবেশ করেন। যেখানে ভৃত্য আপনার অসহায়তা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ পায়, ঈশ্বর প্রথমতঃ সেই স্থানে উপবিষ্ট হন। দুর্ব্বলতা তাঁহার বলের আধার, অসহায়তা তাঁহার প্রেম প্রকাশের স্থান হয়। যখন অসহায়, বন্ধুবিহীন হইয়া আমি সেই দূরদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন আত্মীয়েরা স্বদেশে সুখে নিদ্রা যাইতেন, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী প্রাণেশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেন, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইত। আমি বিদেশে, দরিদ্রতার মধ্যে, লোকের প্রেম এবং সহানুভূতির অভাবে, দীননাথকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতাম। কেবল তাহাও নহে ; তোমাদিগকেও ভাবিতাম, তোমরা উপাসনার আনন্দ সম্ভোগ করিতেছ মনে করিয়া সুখী হইতাম। সেই দূরদেশে অনেক ধর্ম্মালয়ের অপরূপ গাম্ভীর্য্য ও মধুরতা আস্বাদ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি ; কিন্তু এখানকার উপাসকমণ্ডলী, এখানকার আচার্য্যের মুখ কি হৃদয় হইতে কখন অপনীত হইতে পারে ? সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে প্রাণমধ্যে বদ্ধ করিলাম, তারপর এখানকার ব্রাহ্মমণ্ডলীকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম। ক্রমে ক্রমে মনের ভয়, অন্তরের ক্লেশ দূর হইল। একদিন যখন চারিদিকে সকলেই নিদ্রিত, আমার নিদ্রাবিহীন রাত্রিতে ঈশ্বর আসিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার নিজের প্রেম ও গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ

বাহিরেও তাঁহার গুণ ও মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখান হইতে, ওখান হইতে, এই পল্লী হইতে, ঐ পল্লী হইতে শত শত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহারা বলে, "আমাদের দেশের ধর্ম্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; আমাদের ধর্ম্মযাজকেরা অত্যাচার করে। হে ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মসমাজের কথা আমাদিগকে বল। আমরা ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি না, আমরা এত বৎসর বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছি। তোমরা কি প্রণালী দ্বারা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়া মনোহর প্রার্থনা কর, কোন্ কথা বলিলে ঈশ্বরের দ্বার খুলিয়া যায়, আমাদিগকে এ সকল কথা বল।" তোমরা যাহা আমাকে শিখাইয়াছিলে, তাহাই আমি তাহাদিগকে বলিলাম। আমাদের প্রাণনাথের কত দয়া, আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা-প্রণালী কিরূপ, আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, এ সমুদয় উচ্চ বিষয়ে তোমরা আমাকে যে সকল শিক্ষা দিয়াছিলে, আমি তাঁহাদিগকে আমার ক্ষমতানুসারে তাহাই বলিতাম। আজ যদি এক শত জন শুনিতে আসিত, কাল চারি শত, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে আসিত। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সেই বিদেশীয় লোকদিগের গভীর সহানুভূতি দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি কিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলাম, বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের ভৃত্য, ঈশ্বরের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইল। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইল। ধনের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। আমার কথায় তাহাদের কত উপকার হইল বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। যখন তাহারা ব্রাহ্মসমাজের দেবতার গুণের পরিচয় পাইল, তাহারা বলিল, এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ হইবে। ফলতঃ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের

প্রতি পশ্চিম দেশীয় লোকের গাঢ় সহানুভূতি দেখিলাম, তখন অন্তরের আশা এবং সাহস শতগুণ প্রবল হইল। বাস্তবিক এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ত আমরা সৃজন করি নাই, ইহাকে ত আমরা গঠন করি নাই। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত মনুষ্যজাতি এই ধর্ম্মের গৃহ। প্রতিদিন যখন এই সত্যের প্রমাণ পাইলাম, প্রতিদিন যখন লোকের উৎসাহপূর্ণ চক্ষু বলিতে লাগিল তাহাদের নিকট এই ধর্ম্ম আদৃত, তখন বলিলাম, তবে ত আমাদের ধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম, আমাদের ঈশ্বর সমুদয় সংসারের ঈশ্বর, তবেত আমাদের মন্দির সমুদয় পৃথিবীর মন্দির হইবে। দূর হউক বন্ধু বান্ধবদের সন্দেহ অবিশ্বাস। ঈশ্বরের ধর্ম্ম ঈশ্বরের বলে জয়যুক্ত হইবে। সেই বিদেশীয়দিগের নিকটে তোমাদের ঈশ্বরের গুণ বলিলাম, আর তোমাদের সঙ্গে সকলের সহানুভূতি হইল। তোমাদের সুন্দর সরল সত্য-শৃঙ্খলেতে অনেক দেবমন্দির একত্র হইল। তোমাদের সেবক সেই দূরদেশে যে ঈশ্বরের সেবা করিয়াছে, স্বদেশে তাঁহারই সেবা করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইংলণ্ড এবং ইউরোপে সহস্র নরনারী তোমাদের সত্য গ্রহণ করিয়াছেন, তোমাদের মতকে অতি যত্নের সহিত পালন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় প্রস্তুত, তোমরা তাঁহাদিগকে তোমাদের অন্তরের প্রেম দিয়া আপনার করিয়া লও। তাহা হইলে পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ সকলের প্রদীপের আলোক একত্র হইবে। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধন্য তাহারা, যাহারা দুর্ব্বল হইয়াও ঈশ্বরের বলে নির্ভর করে! ধন্য তাহারা যাহারা পাপাত্মা হইয়াও ঈশ্বরের মধুর উপাসনার অধিকারী হয়! কিন্তু আরও ধন্য তাহারা, যাহারা এই উপাসনার মধুরতা জগৎকে দিবার জন্য প্রাণ মন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে! তাহারা জানে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জয়লাভ করিবেই করিবে। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জয়,

সত্যের জয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি এক পরিবার হইবে।

দীননাথ! আমরা কি দেখিব না, পূর্ব্বকালের অপেক্ষা তুমি কত উচ্চতর বিধান আমাদিগকে আনিয়া দিলে? যে দেশে ভক্তি প্রেম শুকাইয়া গিয়াছিল, সেখানে প্রেমের বন্যা আনিয়া দিলে। লও তবে আমাদের প্রাণ মন। যাদের সব দিয়াছ, তাদের সামান্য শরীর মন প্রাণ—যাহা কিছু, তোমার ইচ্ছা সাধনে নিযুক্ত কর। তোমার প্রেম বিধানে সকলের হৃদয়কে এক কর। নরনারীর মধ্যে এক পরিবার কাহাকে বলে, তোমাতে জীবন ধারণ করা কি, ইহজীবনেই অনন্ত জীবন লাভ করা কি, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। ধন্য তোমার মহিমা, যে তুমি আমাদিগকে প্রেমের অধিকারী করিলে! নিজগুণে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আদানপ্রদান।

সায়ঙ্কাল রবিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শক ;
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

আদান প্রদান সংসারের নিয়ম। গ্রহণ করিতে হইলে দিতে হয়। কাহারও নিকট প্রত্যাশা রাখিলে তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে হয়। দুই পক্ষ হইতেই সাহায্য আসিবে, মনুষ্যজীবনের সম্পর্ক এই। পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কি ইউরোপের নিকট ঋণী নহে? পৃথিবীর পূর্ব্ব এবং পশ্চিমখণ্ড দ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, ইহা হইতে জগতের পরিত্রাণরূপ অমৃতফল প্রসূত হইবে। যদি পরিষ্কাররূপে প্রতি ব্রাহ্ম বুঝিতে না পারেন, কি তিনি দিবেন, পশ্চিমের বন্ধুগণ তাঁহার নিকট কি প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি এখনও তাঁহার জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন নাই। সকলেই আমরা জানি, পৃথিবীর পশ্চিম বিভাগে অনেক সভ্যতা, জীবন, উন্নতি এবং শক্তি ; কিন্তু আমরা সকলে হয়ত অবগত নই, এই উন্নতির মধ্যে এমন কোন অভাব আছে কি না, যাহাতে জীবনের মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এই নয়মাসকাল ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া আমার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ইউরোপবাসীদিগের হৃদয়মধ্যে একটি গভীর অভাব আছে, তাহা দূর না করিলে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মজগতের উন্নতি হইবে না।

প্রথমে যখন সকল শোভাতে সুভূষিত হইয়া প্রকৃতি আসিয়া মনুষ্যের চক্ষুকে চুম্বন করিল, মনুষ্য বলিল, সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহার মহিমা। বস্তুতঃ সকল দেশের লোকেরাই প্রথমতঃ প্রকৃতি অর্থাৎ বাহ্য

জগতের মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন সন্দর্শন করিয়াছে। তাবৎ বাহ্য বস্তুতে তাহারা ঈশ্বরের সত্তা ও গুণ অনুভব করিয়াছে। মেঘের গর্জ্জন তাহাদের কর্ণে ঈশ্বরের ভীষণ নিনাদকে প্রকাশিত করিয়াছে, পুষ্পের লাবণ্যে তাহারা ঈশ্বরের অঙ্গুলিরচিত কারুকার্য্য দর্শন করিয়াছে। এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ মধ্যে এবং তাবৎ পদার্থের সুচারু শৃঙ্খলার মধ্যে তাহারা জাগ্রত ঈশ্বরকে দর্শন করিত। ধর্ম্মকে পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। যেমন বাহিরের ঘটনাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল, তেমনই আবার মনের যাবতীয় শক্তির ও গুণের উপরেও ধর্ম্ম-সংস্কারকে আনিয়া ফেলিল এবং পরিশেষে জনসমাজের পরস্পর সম্বন্ধ ও সাধারণ নিয়মাবলীর মধ্যেও ধর্ম্মসংস্কার স্থাপিত করিল। এই সময়েই ধর্ম্ম সম্পর্কে নানা মত, নানা পূজা, নানা আচার ব্যবহার শাস্ত্র প্রচলিত হইল। ধর্ম্মবিদ্যা সার বিদ্যা, একমাত্র বিদ্যা বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিল। এই প্রকারে বেদ, বাইবেল, পুরাণ ; যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা ; ন্যায়, সাংখ্য ; ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। কিছুকাল পরে প্রকৃত বিজ্ঞান সংসারে জন্ম গ্রহণ করিল। মনুষ্য সৃষ্টিশাস্ত্র আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভারতবর্ষেই এককালে প্রকৃত বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহা ধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নিজেরই সত্তা হারাইয়াছিল। পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডে বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের দোষ গুণ দেখাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। যখন ইউরোপে এইরূপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে যুদ্ধ হইতেছিল, যখন বিজ্ঞানের আলোক মনুষ্যের ভ্রমাত্মক সংস্কার প্রমাণ করিল, সেই বিজ্ঞান আসিয়া পৃথিবীর পূর্ব্ব বিভাগের ধর্ম্ম সংস্কার সকলও বিনাশ করিতে লাগিল। পুরাতন ধর্ম্মসংস্কারের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান নূতন সংস্কার সকল স্থাপন করিতে লাগিল। বাহ্য জগৎ হইতে ধর্ম্ম পলায়ন করিল। বিজ্ঞান যখন দেখিল, বাহ্য জগৎ হইতে ধর্ম্ম পলায়ন

করিল, তখন মনোজগতেও আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিজ্ঞান মনুষ্যের মন হইতেও ধর্ম্মকে বিদূরিত করিতে লাগিল। আত্মার অস্তিত্ব মানিল না, ঈশ্বরকে স্বীকার করিল না, সকল তত্ত্ব বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর জনসমাজে হস্তক্ষেপ করিল। মনুষ্যের যে সকল সম্পর্ক আছে, যাহাকে আমরা নীতিতত্ত্ব বলি, বিজ্ঞান তাহার পুনঃ সংস্কার আরম্ভ করিল। চারিদিকে বিজ্ঞানের জয় দেখিয়া ধর্ম্মযাজকেরা ভয়ে নিরাশায় কাঁপিতে কাঁপিতে, আরও দৃঢ়তররূপে আপনাদের শুষ্ক কর্ম্ম কাণ্ড লইয়া লোকের মন ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই সমুদয় ভীত লোক-দিগের ব্যবহার দেখিয়া ইউরোপখণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের সাহস বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, আমরাও কি বলিব, ধর্ম্ম নাই? জন-সমাজে ধর্ম্মবল এবং ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা নাই? ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নের উত্তরদান করা। এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জন্ম। বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা একটি প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারিলেন না; তাঁহারা স্বীকার করিলেন, ইহা বিজ্ঞানের অতীত। সেই প্রশ্ন কি? এ বিশ্বের পশ্চাতে এক প্রাণরূপ মহাসাগর রহিয়াছে, যাহাতে সমুদয় সৃষ্টি ভাসিতেছে। এই যে প্রাণরূপ মহাব্যাপার, ইহার মধ্যে ঈশ্বরের নিবাস। মহাভ্রম তাহাদের, যাহারা কেবল জড়ের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে, ইহা হইতেই পৌত্তলিকতা আসিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা পাইয়াছে, যাহারা এই জড় বিশ্বের অতীতস্থানে প্রাণালয়ে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়াছে। বাহিরেও প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর, ভিতরেও এই প্রাণরূপ মহামূর্ত্তি। এই প্রাণ-রূপ মহাচক্রে সমস্ত বিশ্বরাজ্য ঘুরিতেছে। তাঁহার জগৎ হইতে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেয় কাহার সাধ্য? যতক্ষণ মনের মধ্যে আনন্দ, পবিত্রতা, প্রেম, সদ্ভাব, জ্ঞান এবং ইচ্ছা, ততক্ষণ প্রাণের প্রাণ সেখানে। যেখানে

জীবন এবং কৌশল কার্য্য করে, যেখানে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্য, ঈশ্বর আপনি আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান। এই প্রাণ অন্তরে, এই প্রাণ বাহিরে। তবে মন হইতে কি প্রকারে ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিতে পার? এবং এক জনের মনের মধ্যে যদি ঈশ্বরের আধিপত্য স্থির হইল, তবে দশজনের উপরেও তাঁহারই আধিপত্য। যিনি একজনের প্রাণের প্রাণ, তাঁহারই প্রাণ জনসমাজে প্রাণকে পুনঃ সংস্কার করে। আমরা ব্রহ্মমন্দিরে এই প্রাণস্বরূপের উপাসনা করি। এই প্রাণধর্ম্ম যদি ব্রাহ্ম সাধন করিতে পারেন, তবে পৃথিবীর পশ্চিম বিভাগের মহাগভীর অভাব পূর্ণ হইবে। সেইখানে লোকেরা মতের ঈশ্বরকে পূজা করে, প্রাণের দেবতাকে পূজা করিতে পারে না। তাহারা যদি কাহারও মুখে এই প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে বলে, ধন্য তোমরা, যে তোমরা এমন ঈশ্বরের কথা বলিতে পার। এমন ঈশ্বরের কথা কে তোমাদিগকে বলিল? ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জড়জগতে, মনুষ্যমনে এবং সমাজে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের এই গভীর নিয়তি সুসম্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা কর। এই গুরুভার হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি সকলেই সাধনে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে তাবৎ জাতি সেই প্রেমপরিবারে সংগঠিত হইবে, যাহার কথা এই বেদী হইতে বারম্বার শুনিয়াছি। সকলে উৎসাহের সহিত এই জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।

ঈশ্বরের বিধান সার্ব্বভৌমিক।

(মাসিক সমাজে বিবৃত)

রবিবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক ; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

ভাবুক ব্যক্তি মনুষ্যজীবনকে জলবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেন। সমস্ত মানবজাতি একটি প্রশস্ত সমুদ্র। প্রত্যেক মনুষ্য একটি বিন্দুমাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল জলময় ছিল। তদুপরি ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রক্ষিপ্ত হইল। তিনি ইচ্ছাবলে এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ সমস্ত মানবজাতিরূপ সমুদ্রের উপরে ঈশ্বর ভাসিতেছেন, তাঁহার নিঃশ্বাসে ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব যদি ঈশ্বরের পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এই সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে। যেমন একটি ক্ষুদ্র পাত্রস্থ জলে, সাগরের গভীরতা এবং উহার গাঢ় নীলবর্ণ দেখা যায় না, যদিও তাহার তিক্ততা অনুভব করা যায়, সেইরূপ একটি মানবকে নির্ব্বাচন করিয়া লইলে সমস্ত মানবজাতির গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। সত্য যে, একটি মনুষ্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্য আছে, এবং তাহার মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং করুণা দেখা যায় ; কিন্তু তাহাতে সমস্ত মনুষ্য জাতির পূর্ণধর্ম্ম লাভ করা যায় না। এই জন্য ধর্ম্মজগতে যাঁহারা পরিশ্রম করেন, তাঁহারা সমুদয় মানবজাতিকে একটি সামগ্রী বলিয়া দর্শন করেন ; এবং যাহাতে সমস্ত মনুষ্যজাতির কল্যাণ হয়, তাহার চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। যেমন অর্ণবপোত সাগরবক্ষে পরিচালিত হইয়া কত অজানিত দেশ আবিষ্কার করে এবং কত রত্ন সংগ্রহ করে, তেমনই ধর্ম্ম-প্রচারক আপনার প্রাণ-পোত ভাসাইয়া, মানবপ্রকৃতিরূপ সমুদ্রের নিগূঢ় স্থানে যে সকল রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ এবং যে সমস্ত দেশ অজানিত

তাহা আবিষ্কৃত করেন। ইহা দ্বারা নানা উপকার সাধিত হয়, জ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, এবং প্রেমেরও গভীরতা বৃদ্ধি হয় এবং জগতের সুখসিন্ধুর জলরাশি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যতই এইরূপে মহাসাগররূপ মানবপ্রকৃতি হইতে নানার্থ সংগ্রহ করেন, ততই জগতের সুখ শান্তির রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই শিক্ষা কোথা হইতে আইসে? ঈশ্বর নিজে এই শিক্ষা দেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রত্যেকেরই ঈশ্বর। প্রতি-জনের সম্পদে বিপদে ঈশ্বরের কৃপা; কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধান আমার জন্য নয়, তোমার জন্য নয়; কিন্তু সমস্ত মানবজাতির জন্য। যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বঙ্গদেশের জন্য, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করিলে। হয় বল, ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম নহে, নতুবা বল, ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত মানবজাতির জন্য। ঈশ্বর যাহা প্রেরণ করেন, তাহা সমুদয় মানবজাতির কল্যাণের জন্য। এখানকার যে সঙ্গীতের কোমল ধ্বনি, এবং উপদেশের যে মিষ্টতা আমরা আস্বাদ করিতেছি, ইহা সমস্ত পৃথিবীর জন্য। এই জন্য এক দেশের উপদেষ্টা অন্য দেশের উপদেষ্টা হইতেছেন। এক দেশের সত্য অন্য দেশেও গৃহীত হইতেছে, সাগর পার হইয়া ধর্ম্ম বিস্তারিত হইতেছে। কি বিলাতীয়, কি বঙ্গদেশীয় লোক, কেবল মানব বলিয়া গৃহীত হইতেছে, এক সাধারণ বিধানে উপকৃত হইতেছে। জ্ঞানের বিধানে, প্রেমের বিধানে, ধর্ম্মের বিধানে, এক দেশের সম্পত্তি, অন্য দেশের সম্পত্তি হইল। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম নিজ নিজ সীমাকে অতিক্রম করিয়া, জগ-তের নানা স্থানে অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, ইহার অর্থ কি? এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই সত্যস্বরূপের হস্ত আছে। যাহার উপর ঈশ্বর স্বহস্তে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন, সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা যে দেশ-সম্ভূত হউন না, তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য। তাঁহার যাহা জানাইবার আছে,

তিনি একজনকে জানাইয়া সন্তুষ্ট হন না। যিনি ঈশ্বরের ভৃত্য, তিনি কাহার সেবা করিবেন, তাহা ভাবেন না; কিন্তু তিনি মানবজাতিরূপ সাগরতটে দণ্ডায়মান থাকেন, সমুদয় মানবপ্রকৃতির কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে অঙ্গীকার করেন। এইরূপে যিনি জগতের সেবা করেন, এইরূপে যিনি শিক্ষা দেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের আলোক, তাঁহার চরিত্রের ক্ষমতা কে পরাজয় করিবে? একজন লোকের মুখ দিয়া ঈশ্বরের কথা বহির্গত হয়, সহস্র সহস্র লোক তাহাতে বিমোহিত হয় কেন? একজন লোকের জ্ঞানালোক কেন সহস্র লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়? যদি মানবে মানবে নিগূঢ় সম্বন্ধ না থাকে, তবে এ সমুদায় ঘটনার অর্থ কি? যদি সমুদয় মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হইল, তবে পরের দুঃখ দূর করিবার জন্যই ত মনুষ্যের জীবন। নিজের অভাব মোচনে যিনি চিরব্রতী, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত কি বুঝিলেন না। একজন লোক কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য দিবানিশি চেষ্টায় রহিলেন, তিনি বুঝিলেন ব্রাহ্ম কত উদার ও মহৎ। যাঁহার চক্ষুর ক্রন্দন ক্ষান্ত হইল না, যতক্ষণ না তিনি দেখিলেন, আর সকলের ক্রন্দন থামিল, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিলেন। এই দুই জন মনুষ্যের মধ্যে যে কত প্রভেদ, কে বুঝিতে পারে? ধর্ম্মোপদেষ্টারা যে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝেন, তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত প্রভেদ বুঝিতে পারুন আর না পারুন, কোন্ স্থলে ঈশ্বরের আলোক, তাহা দেখিতে পান। বিশ্বাসী যেমন নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, তেমনি তিনি নিরাকার মানবপ্রকৃতির আকার দেখিতে পান। দেখিতে পান যে, এই স্থানে যদি সকল লোক আইসে, সকলের সঙ্গে মিল হইবে। ঈশ্বর যেমন প্রেমচক্ষে দেখিতে পান, কোন্ বিধানে জগতে প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত হইবে, সাধকও, যদি তাঁহার প্রেমচক্ষু সীমাবদ্ধ না হয়, পরিষ্কাররূপে

দেখিতে পান, কোন্ অবস্থায় মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হইবে। সাধক সে রাজ্যের প্রেম দেখিয়া প্রেম লাভ করেন এবং প্রেম দান করেন, দিব্য জ্ঞানে মোহবন্ধন ছেদন করেন, তিনি প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করিয়া আপনাকে জগতের সেবায় নিযুক্ত করেন। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকে উৎকৃষ্ট কার্য্য মনে করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এখন হইতে অন্তরকে সংযত করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে একটি সামগ্রী মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হওয়া। অনেক মনুষ্য আসিবে, অনেক মনুষ্য যাইবে, অনেক ব্রাহ্মসমাজ উঠিবে এবং পড়িবে; কিন্তু যে প্রচারক ঈশ্বরকে সহায় করিয়া সমুদায় মানবজাতির গভীরতা হইতে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য লাভ করেন, এবং তাবৎ মানবপ্রকৃতির পাপ-ত্যাগ ও পরিত্রাণের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেন, তাঁহার প্রচারব্রত কখন শেষ হইবে না, এবং তাঁহার চিত্তের অবসাদ হইবে না। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান-নিঃশ্বাস, প্রেম-নিঃশ্বাস এবং পুণ্য-নিঃশ্বাস দ্বারা যাহাতে মনুষ্যস্বভাবরূপ সাগর উচ্ছ্বসিত হয়, তাহার জন্য আমরা যথার্থ প্রচারক হইতে চেষ্টা করিব। ভ্রাতা ভগ্নীদের মুক্তিতে আমাদের মুক্তি হইবে।

অভ্রান্ত শাস্ত্র।

ষট্‌চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

শাস্ত্রালোচনাতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি। ঋষিরা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। শাস্ত্র-গর্ভ-নিহিত মহারত্ন উত্তোলন করিয়া সাধকগণ কণ্ঠের হার করিয়া রাখেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য ধর্ম্মমন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রই ধর্ম্মের মূল। কতবিধ শাস্ত্র পৃথিবীতে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, গ্রন্থসাহেব, ঝেন্দ ইত্যাদি। ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য শাস্ত্রমধ্যে অনেক আদেশ রহিয়াছে, অতএব মনুষ্য শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া চলে। শাস্ত্রের মূল কি? শাস্ত্রকর্ত্তা ঈশ্বর, যে শাস্ত্র ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ না করে, তাহা শাস্ত্রই নহে। শাস্ত্রের মূল এক ঈশ্বর। শাস্ত্রের প্রকার দুই, লিখিত এবং অলিখিত। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ করা। সুশাস্ত্র এবং সুসংবাদ এক। যদি লিখিত সমুদয় শাস্ত্র একত্র করা যায়, ব্রাহ্ম কোন্ বিশেষ শাস্ত্র অবলম্বন করিতে পারেন? লিখিত প্রায় প্রত্যেক শাস্ত্রেই যেমন একদিকে সত্য, তেমনি আর একদিকে মিথ্যা রহিয়াছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া ব্রাহ্ম কি গ্রহণ করিতে পারেন? যাহা দ্বারা পবিত্র দেবতার পবিত্র ইচ্ছা অবগত হওয়া যায়, তাহাই সুশাস্ত্র। কিন্তু কোন পুরাতন শাস্ত্র দ্বারা আমাদের সম্পর্কে মঙ্গলময়ের বর্ত্তমান ইচ্ছা কি তাহা জানা যায় না, সুতরাং পুরাতন শাস্ত্রের আলোক এখনকার সম্পর্কে যথেষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রায়ের অভ্রান্ত সুসংবাদ লাভ করিলে মনুষ্যের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বর আছেন, এই বিষয়ে

যদি অভ্রান্ত আলোক মনুষ্যহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তবে যে তাহার কি আনন্দ হয়, তাহা বলা যায় না। সে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে দেবত্ব লাভ করে। একে ত ঈশ্বর আছেন এই সুসংবাদ, তার পরে তাঁর সঙ্গে মনুষ্যের সাক্ষাৎ হয়; ব্রহ্মদর্শন সম্পর্কে এই গভীরতর সংবাদ। তার পর ঈশ্বর সাধকের অন্তঃকরণের গভীরতম নিলয়ে পৃথিবীর সম্পর্কে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাঁহার কি ইচ্ছা, যখন তাহা প্রকাশ করেন, তখন সাধকের কত আহ্লাদ হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর যখন তাঁহার বিধি প্রচার করিবার জন্য মুষাকে আহ্বান করেন, তখন মুষা সম্মুখে অগ্নি দেখিয়া বলিলেন, প্রভো! :আর যে অগ্রসর হইতে পারি না। পরে মুষা গভীর ধ্বনিপূর্ণ এই কথা শ্রবণ করিলেন, মুষা, অগ্রসর হও। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি সেই উজ্জ্বল আলোকের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুষাকে ঈশ্বর যাহা বলিলেন, তাহা প্রস্তরে লিখিত আছে। তাহা বাহিরের কর্দ্দম-নির্ম্মিত প্রস্তর নহে। পাঁচ ছয় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল;—মিথ্যা কহিও না, দুরাচার করিও না ইত্যাদি। এখন পৃথিবী তদপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কি শেষ হইয়াছে? প্রেমপরিবার গঠন করিতে হইবে, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল, তার পর ভক্তিভাবে উন্মত্ত হইতে হইবে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ হইল। এখন কি আর তিনি কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন না? বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে কি তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই? এখান হইতে পঞ্জাবে, পঞ্জাব হইতে বঙ্গে পর্য্যন্ত গমন কর, দেখিবে শুষ্কতা, অভক্তির কীট ব্রাহ্মসমাজ-পুষ্পকে আক্রমণ করিতেছে। ধন্যবাদ করি ঈশ্বরকে, এখনও ব্রাহ্মসমাজের মূল বিনষ্ট হয় নাই। পুস্তক পাঠ কর, কাঙ্গালকে অন্ন বস্ত্র দাও, সদনুষ্ঠান করিয়া দেখ, সেই কীটকে দূর করিতে

পার কি না। অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই কীটের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই এই কীট হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না, বরং ইহার মৃত্যু হইতে আরও সহস্র কীট জন্মগ্রহণ করে; যেমন শুনিয়াছি, রাক্ষসের এক বিন্দু রক্ত হইতে সহস্র রাক্ষস জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই যে মানব-প্রকৃতি-নিহিত শুষ্কতা ও অভক্তি, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা প্রকাশ ভিন্ন তাহা কেহ দূর করিতে পারে না। সেই শাস্ত্র চাই, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হইলে, হৃদয়-প্রস্তরে সেই শাস্ত্র লিখিত হইবে। তাহারাই কেবল প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য পদবীতে আরোহণ করিবে, যাহারা ঈশ্বরের বর্ত্তমান অভিপ্রায় অবগত হইবে। অন্যেরা কেবল সেই অবস্থার উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষা করিবে। আজ্ঞা কর প্রভো! কিসে তোমার ইচ্ছা জানা যায়, এই বলিয়া যখন ঈশ্বরসন্তান-কাতর প্রাণে তাঁহার দিকে তাকাইবে, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ উজ্জ্বল কিরণ তাহার অন্তরে প্রকাশিত হইবে। জ্যোতিঃ কোথায়? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে। ঐ শুভ্র বস্ত্র, ঐ তেজোময় মুকুট আমরা পরিতে চাই। ঐ ইচ্ছা যখন অবতীর্ণ হয়, মনুষ্যের আত্মা অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে। সেই ইচ্ছার সৌরভে সাধকের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই ইচ্ছাই শুদ্ধ জ্যোতিঃ, তাহাই সার শাস্ত্র। অশব্দ ঈশ্বরের সেই অশব্দময় কথা, সেই গভীর ইচ্ছা কেমন করিয়া বুঝিব? সেই অশব্দ শব্দ না শুনিয়া কে যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারে? আমি বলিলাম, ঐ জ্যোতির্ম্ময় মুকুট আমরা চাই। যাঁহারা ঐ মুকুট পরিয়াছেন, যাঁহাদের মস্তকে ঈশ্বরেচ্ছারূপ উজ্জ্বল পবিত্র কিরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা গভীর এবং অলৌকিক উপাসনার কল্লোলে পৃথিবীকে পুণ্যবতী করিতেছেন। আমি বলিলাম, আমরাও ঐ মুকুট চাই। অন্ধেরও ইচ্ছা হয়, সূর্য্য দর্শন

করে; কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে? অগ্রে এই লৌহাস্ত্রে এই দাম্ভিক মস্তক চূর্ণ হউক, আগে বিনয়ের কন্থা এবং বৈরাগ্যের কম্বলে শরীর আচ্ছাদিত হউক, তবে সেই অভিপ্রায়ময় ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হইবে। যদি ইচ্ছাময়ের রাজ্যে গিয়া তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা জানিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হইবে। এইত মুকুট পাইবার সময়। মূঢ়মতি সংসারাসক্ত মনুষ্যগণ! দেখ দেখি, যাহারা ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐ মুকুট পরিয়াছে, সে সকল নরনারীদিগের হৃদয় কি সুন্দর ভাব ধারণ করিল! তাহারা ঐ চির নিরাপদ দুর্গ মধ্যে যাইতেছে। ঈশ্বরসন্তান পৃথিবীর প্রেমের প্রত্যাশা করিলেন না, সংসারের ভালবাসা সংসারে পড়িয়া রহিল, ঈশ্বরের ভৃত্য ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। ধন্য ধন্য ঐ সকল জীবন, যাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হইল! ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! ঐ শুন ঈশ্বরের নাম লইয়া কতকগুলি লোক শব স্কন্ধে করিয়া যাইতেছে। (এই সময় শব স্কন্ধে এক দল লোক "লা এলাহ এল্লেল্লাহ, মহম্মদ রসুলেল্লাহ" বলিতে বলিতে সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল) মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভুর ইচ্ছা জানিতে চেষ্টা কর। তাঁহার ইচ্ছা পালন করিয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহারা ধন্য! ঈশ্বরের কৃপাতে তাহাদের নামের মধ্যে আমাদের নাম লিখাইয়া লই। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিয়া যাহারা প্রাণ দিয়া স্বর্গধামে গিয়াছে, আমরাও তাহাদের অনুবর্ত্তী হই, ঈশ্বর এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব।

ভাদ্রোৎসব।

প্রাতঃকাল, রবিবার ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক;
২০শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কেবল ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ করিও না। আর যাহা হয় করিও। কেবল মঙ্গলময়ের পরিত্রাণ-বিধির সঙ্গে কলহ করিও না, আর যাহা হয় তাহা করিও। হে মনুষ্য! ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীর রাজসিংহাসনে বসাইয়াছেন, তোমার জন্য সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তোমার জন্য প্রাতঃসমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, তোমাকে সুখে রাখিবার জন্য সংসার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিতেছে। সংসারের ভার তোমার হস্তে দিয়া ঠিক যেন পৃথিবীর ঈশ্বর বিদায় লইয়া গিয়াছেন। এখানে কেবা তোমাকে বারণ করে? কেবা তোমার প্রতিবন্ধকতা করে? যাহা ইচ্ছা তাহা কর। কেবল একটি স্থানে গিয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিও না। সেই স্থানটি এই, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। একটি ভার ঈশ্বর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। তাহা কি? জীবকে পরিত্রাণ দিবার ভার। এইটী হে মনুষ্য! তোমাকে দেন নাই। নতুবা ক্ষমতা বল, জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, ধর্ম্ম বল, রাজনীতি বল, সকলই তোমার হস্তে দিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে, শত সহস্র লোক তোমার অনুগামী হইল, বনের পশু সকল স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া তোমার অধীন হইল। তুমি ইচ্ছা করিলে, আর ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কত বিজ্ঞান রচিত হইল। তোমার লেখনী দ্বারা কত পুস্তক লিখিত হইল। তোমার বক্তৃতা দ্বারা কত আশ্চর্য্য ফল

প্রস্তুত হইল। তোমার কি সামান্য অধিকার! কিন্তু একটি স্থানে তোমার অধিকার নাই। সেখানে তোমার নীতি, তোমার নিয়ম স্থাপন করিও না। পরিত্রাণ দিবার ভার ঈশ্বর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। সেখানকার সমুদয় বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার তোমার নয়, তাঁহার। যাহাতে তোমার এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে, সেই প্রণালী তুমি জান না। হে পণ্ডিত! হে ধার্ম্মিক! মনুষ্যজীবনের মহা খেদ এবং মহা দুঃখ আছে, যাহার সান্ত্বনা তুমি দিতে পার না। সে শোক দুঃখের সান্ত্বনা কেবল একজনের হস্তে আছে, যিনি আপনার অস্তিত্বের অহঙ্কার করেন না। তিনি অন্ধকারে থাকেন, যখন দেখেন জীব নিতান্ত নিরাশ এবং ক্ষীণ হইল, তখন আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া আবার অন্তর্দ্ধান হন। ধর্ম্মজীবনের এই চারিটী কঠিন সমস্যা আছে, যাহার মীমাংসা করিতে হে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ! তুমি অক্ষম। একদিকে ভয়ানক অরণ্য, আর একদিকে ভয়ানক সমুদ্র, উভয়দিকেই নিশ্চয় মৃত্যু। অরণ্যের হিংস্র জন্তুর হস্তে মরিব, না, সমুদ্রে মরিব? হে নেতা! হে মনুষ্যদিগের চালক! হে বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ! তুমি আর পথপ্রদর্শন করিতে পারিলে না। তুমি মনে করিয়াছিলে যে, পরিত্রাণ-গঙ্গা-নদীকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইবে, অমুক প্রস্তর এবং অমুক দেশ দিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। আর একজন আসিয়া অন্য উপত্যকার মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। তুমিও বিভ্রান্ত, আমিও বিভ্রান্ত, উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। সেখানে সমুদয় পাণ্ডিত্য, সমুদয় চরিত্রের বল পরাস্ত হইয়া পড়ে, অত্যন্ত বলবান্ মনুষ্যও শিশুর ন্যায় হয়। সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া, পথভ্রান্ত হইয়া কেবল একজনের দিকে তাকাইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা তাকাইতে জানে, তাহারা ধন্য। আর যাহারা জানে না, তাহারাও ধার্ম্মিক বটে;

কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়ের হস্তে সমর্পিত। তুমি শ্রেষ্ঠ, গুণবান্, তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে ধন্যবাদ করি, যখন দুর্ব্বল হইয়াছিলাম, তখন তুমি সাহায্য করিয়াছ; কিন্তু এমন অবস্থা আছে, যখন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্পর্ক থাকে না। সে অবস্থায় যিনি দীন, বিনয়ী এবং শিশুর ন্যায় অসহায়, তাঁহারই জয়। মনে করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে যে অসহায় অবস্থা হইয়াছিল, যখন গৃহহীন হইয়াছিলাম, তখন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হইল; তখন জানিতাম না, বিনয়-সাধনের গভীরতর দেশ আছে। এই যে ধর্ম্মের রথ চালিত হইতেছে, ইহার রাশ রজ্জু ঈশ্বরের হস্তে। ইহার মধ্যে, হে মনুষ্য! তুমি যদি একটি কথা বল, অমনি অমঙ্গলের হ্রদ মুখব্যাদান করিবে। এই ধর্ম্মবিধান কেবলই ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হইতেছে, এই বিশ্বাস করিয়া স্থির হইয়া থাক। ঈশ্বর ভিন্ন এখানে আর অন্য সহায় নাই, ইহা জানিয়া কেবল তাঁহার দিকেই তাকাইয়া থাক। এই অসহায়তার ভিতরে এক গভীর সহায়তা পাইবে। আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা যতই কেন করি না, এই যে নিঃশব্দ নির্ভর, ইহার তুল্য আর কিছুই নাই। এই যে বিদ্যার মধ্যে মূর্খতা, এই যে পরাক্রমের মধ্যে দুর্ব্বলতা, এই যে মনের ভিতরে শিশুর অপেক্ষাও অসহায় অবস্থা, এই অসহায়তাই ব্রাহ্মের পরিত্রাণের সহায়, এই দুর্ব্বলতা তাঁহার বল, এবং এই মূর্খতাই তাঁহার জ্ঞান হয়। যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন, ঈশ্বরের হস্তে কোন্ ভার, এবং তাঁহার নিজের হস্তে কোন্ ভার। সেই যে ভিতরের গভীর জীবন. তাহার সীমা নাই। পরিত্রাণরাজ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হয়, সে নিজে কিছু করে না। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া এমনি চেষ্টা করে যে, পৃথিবীর কোন চেষ্টার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। নিশ্চেষ্ট হইয়া যদি ঈশ্বরের চেষ্টা লাভ

করা যায়, অসহায় হইয়া যদি ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হইল। আপনার সাধন এবং ধর্ম্মচেষ্টা নিষ্ফল বুঝিয়া, যে পরিত্রাণের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করে, সে ব্যক্তি ধন্য। যে ব্যক্তি জীবনের তাবৎ ভার বিধাতার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল, তাহার ধর্ম্মকে কে পরাস্ত করিবে? যে বিধাতার গুণ বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝিয়াছে, সে অবাত-কম্পিত দীপের ন্যায় স্থির থাকে। কারণ সে জানে, ঈশ্বরের হস্ত কম্পিত হইবার নহে। ঈশ্বরের হস্তে যে ভার তাহা সুসম্পন্ন হইবেই হইবে। যে তাঁহার- অনুগমন করে, সে নিশ্চয়ই অপবিত্রতাকে চূর্ণ করিবে; সে দুঃখে পড়ুক, সহস্র যন্ত্রণায় পেষিত হউক, পরিণামে তাহার জয়, পরিণামে তাহার শান্তি, পরিণামে তাহার পরিত্রাণ। এই পন্থা। কেবল ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেই নরনারীর উদ্ধার।

অন্ধকারে আলোক।

রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৭৯৮ শক ;

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

সঙ্কেতপূর্ণ সংসার। মনুষ্য কতবার ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রায় সকলেই ইহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইল। যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের বোধ কেমন নিগূঢ়, যাহারা বুঝিতে পারে না তাহাদের অজ্ঞানতা কত ঘন। সকল সঙ্কেতের মধ্যে আলোক অন্ধকারের সঙ্কেত শ্রেষ্ঠ। যত প্রকার আন্তরিক শক্তি, জ্ঞান, মেধা প্রভৃতি আলোকের সঙ্গে উপমিত হয়। আলোকের ন্যায় জ্ঞানপ্রদ, সুখপ্রদ এমন আর কি আছে? আলোক যেমন বস্তু প্রকাশ করে, এমন আর কে পারে? আলোকের পুনরাগমনে জীবনের পুনরাগমন। সমুদয়ের সঙ্গে এই আলোকের তুলনা। সম্পদ কি? আলোক। যাঁহার ঘরে সম্পদ তাঁহার ঘরে কত আলোক জ্বলে, তাঁহার চক্ষে কত জ্যোতি বাহির হয়। যেখানে সৌভাগ্য সম্পদ সেখানে কত হীরক, মুক্তা এবং স্বর্ণের চাকচিক্য। সম্পদের আলোক যেখানে নাই, সেখানে যদি আলোক জ্বলে, তাহাতে অন্ধকার ঘনতর দেখায়। যেখানে বিপদ সেখানে অন্ধকার, সেখানে কোন স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। অন্ধকার সমুদয় ঢাকিল, আলোক সমুদয় প্রকাশ করিল। আমি বলি, ঠিক ইহার বিপরীত। আলোক সমুদয় ঢাকিয়া রাখে, অন্ধকার সমুদয় প্রকাশ করে! এক পৃথিবী সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, আর আকাশের সমুদয় পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়। সূর্য্য যতক্ষণ অস্ত না হইবে ততক্ষণ মনুষ্য মনে করিবে, এই সূর্য্য ভিন্ন আর

সূর্য্য নাই ; কিন্তু যাই সূর্য্য অস্ত হইল, আকাশে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। অন্ধকার না আসিলে এত পৃথিবীর সমাচার আনিত কে? সহস্র পৃথিবীর সমাচার আনিয়া দিল এই অন্ধকার। সামান্য চিন্তায় দেখা গেল, আলোক ঢাকিয়া রাখে, অন্ধকার দেখায়। বাহিরের অন্ধকার যদি সহস্র সহস্র পৃথিবী প্রকাশ করে, অন্তরের অন্ধকার আরও অধিক প্রকাশ করে। যতক্ষণ ধন, মান, বিদ্যা এবং সুখ ভোগের লালসারূপ আলোক জ্বলিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা লুক্কায়িত থাকে। যে অন্তরে বিদ্যার গর্ব্ব জ্বলিতেছে, সে মনে করে বিদ্যার আলোক ভিন্ন আর কি কোন জ্যোতি আছে? এই বলিয়া আলোকে অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে। আর দুই চার জন লোক, যাঁহাদের উপর স্বর্গীয় কৃপা প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা বাহিরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া শ্রান্ত হন, এবং সকল প্রকার সাংসারিক আলোক দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা ভয়ানক ঘোরান্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিতে ভাল বাসেন। এবং যখনই সেই অন্ধকারের ভিতরে প্রবেশ করেন, অমনই তাঁহার গভীর জীবনাকাশে প্রথমে একটি নক্ষত্র, ক্রমে দশটি নক্ষত্র, পরে শত সহস্র নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে অপরূপ ব্যাপার সকল প্রদর্শন করে। মনুষ্যের অসার বাসনার জ্যোতি তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে, সেই আলোক কি গভীর জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখে! অতএব এই অন্ধকার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অপরূপ জ্যোতি সম্ভোগ কর। উচ্চ হইতে উচ্চতর সূর্য্য দর্শন কর। এই অন্তঃকরণের ভিতরে অপরূপ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল। কে দেখাইবে? ঈশ্বরের কৃপা আসিয়া অবতীর্ণ হইল। দিব্য জ্ঞান আসিয়া তাহার হস্ত ধরিল। আলোক যাঁহার প্রকাশের সহস্র ভাগের একভাগও নহে, তিনি অন্ধকারের মধ্যে এই চমৎকার ব্যাপারের অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

যিনি অন্ধকার মধ্যে এ সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তিনি রাত্রি আসিবে কবে এই বলিয়া দিবাতে অধীর হন, এবং বাহিরের আলোক হইতে বিদায় লইয়া অন্তরের যে অনন্ত আলোক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম ভোগ করেন, আরাম এবং চিরশান্তি লাভ করেন।

নিত্য নূতনতা।

(শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ)

রবিবার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক;
২২শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণের মধ্যে নূতন গৃহে প্রবেশ করা এদেশীয় লোকের মধ্যে একটি প্রধান মঙ্গলাচরণ। জীবন শীঘ্রই এত পুরাতন হইয়া উঠে, এখানকার বন্ধুতা, সুখ, এত পুরাতন এবং অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, মধ্যে মধ্যে কোন একটি নূতন ব্যাপারে যোগ না দিলে মনে সুখ হয় না। নূতনতা মনুষ্যজীবনের আকাঙ্ক্ষা। মনুষ্য পুরাতন সুখ, পুরাতন বন্ধুসঙ্গ ভালবাসে না। ইন্দ্রিয়সুখার্থী নূতন নূতন ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করে। জ্ঞানার্থী নূতন নূতন সত্য লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ধর্ম্মার্থী মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মের ভাব আকাঙ্ক্ষা করে। পুরাতন গৃহে কেহই বহুকাল বাস করিতে চায় না। যে দিন কোন সম্পন্ন ব্যক্তি পুরাতন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করেন, সেই দিন তাঁহাদের মনে কত আনন্দ। এই যে, প্রায় সকল বিষয়েই মনুষ্যজাতির নূতনতাস্পৃহা, ইহার মধ্যে সুগভীর অর্থ আছে। মনুষ্যজীবনে যেমন এই ইচ্ছা, এই নূতনতাস্পৃহা বর্ত্তমান, সমস্ত বিশ্ব-সংসারেও ইহা চরিতার্থ করিবার আয়োজন হইতেছে। পুরাতন সূর্য্য প্রত্যেক দিন নূতন হইয়া আসিতেছে। যদি সূর্য্য একই রকম থাকিত, যদি সম্বৎসরকাল সেই মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ থাকিত, কে তাহা সহ্য করিতে পারিত? এই জন্য নূতন সূর্য্য এবং নূতন পূর্ণচন্দ্রিমার এত

আদর। সৃষ্টির প্রায় তাবৎ বস্তুই পুরাতনতা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাব ধারণ করে। প্রত্যেক বৃক্ষ বৎসরান্তে পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া বসন্তের আগমনে নূতন পত্র ধারণ করে। অতএব কি মনুষ্য-জীবনে, কি পৃথিবীতে, নূতনতাই নিয়ম, নূতনতাই সুখ। কিন্তু হে ব্রাহ্ম! এই যে নূতন বৎসর, নূতন সূর্য্য, নূতন চন্দ্র আসিতেছে, চারিদিকে কত নূতন ব্যাপার হইতেছে, এ সকলের মধ্যেও তোমার জীবন কি পুরাতন থাকিবে? তুমি যে ভগ্নগৃহে বাস করিতেছ, তাহা কি নূতন হইবে না? তোমার মনের বার্দ্ধক্য কি দূর হইবে না? সংসারে যত পুরাতন বৃক্ষ ছিল, বসন্তাগমে নূতন পত্র পুষ্পে শোভিত হইল, কিন্তু তোমার ভক্তি-লতাতে কি পত্র পুষ্প আসিবে না? যে সমস্ত নদী শুকাইয়াছিল, বর্ষার জলে আবার পূর্ণ হইয়া তাহাদের কেমন শোভা হইল, কিন্তু তোমার পঙ্কিল হৃদয়-তড়াগে কি প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে না? সকলের দরিদ্রতা ঘুচিল, ধর্ম্মধন পাইয়া তোমার দারিদ্র্য কি ঘুচিবে না? তুমি জ্ঞানের চর্চ্চা কি কর? তুমি সাম্বৎসরিকের সময় কি সমারোহ কর? যদি তোমার চক্ষে শান্তিবারি বর্ষণ না হইল, যদি তোমার চক্ষু পুণ্যজলে পবিত্র এবং প্রফুল্ল না হইল, তোমার এ সকল আড়ম্বর করিয়া কি লাভ? হে আত্মন্, দেখ, সমুদায় সংসার তোমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। প্রত্যেক কুসুম যাহা প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হয়, এই বলিয়া তোমাকে তিরস্কার করিতেছে, "তুমি এত নূতন ব্যাপার দেখিলে, এত নূতন নূতন চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ সম্ভোগ করিলে, তবু তোমার শুষ্ক পুরাতন অন্তর নূতন প্রেম-সৌরভে পূর্ণ হইল না?" পথের তৃণ পর্য্যন্ত নিত্য নূতন বেশ ধারণ করিয়া তোমাকে নিন্দা ও ধিক্কার করিতেছে। যত লোক পুরাতন কুটীর ত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিতেছে, তাহারা তোমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

বলিতেছে, ঐ দুর্ভাগার অন্তঃকরণ এখনও শুষ্ক রহিল। আকাশের পক্ষীরা আনন্দে কলরব করিয়া তাহাদের কুলায় প্রবেশ করিল, জলের মৎস্যেরা সুখে জলস্রোতে সন্তরণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগা ব্রাহ্ম, তাহার ভগ্ন-হৃদয় রাখিবার জন্য কোথাও আশ্রয়স্থান পাইল না। অথচ চারিদিকে ঈশ্বরের প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্যকে নূতনতা কে দেয়? সেই ঐশ্বর্য্যশালী প্রাণময় ঈশ্বর। তুমি কেন তবে শোভার সাগর তটে বসিয়া কুৎসিত হইয়া রহিলে? ধনীতে ধনীতে, দরিদ্রে দরিদ্রে বন্ধুতা হইল, নদীর জলে জ্যোৎস্না মিলিয়া উভয়ে হাস্য করিতে লাগিল; কিন্তু ব্রাহ্ম! তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে মিলিলে না। তোমার নূতন আনন্দ হইল না। বল, তুমি কেন জন্মিয়াছিলে? কেন ব্রাহ্ম হইলে? কেন ঘটা করিয়া সাম্বৎসরিক কর? যদি তোমার চরিত্রে সৌন্দর্য্য শান্তি না থাকে, যদি তোমার আত্মাতে নূতন পবিত্রতা না আসে, তোমার জীবনে প্রয়োজন কি? এ সকল কথা মনে হইলে আপনার পুরাতন মলিনতা দেখিয়া কাহার না মন ক্ষুণ্ণ হয়? ভাল হইতে পার, যদি সেই চিরনূতন সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ কর। তিনিই একমাত্র নবজীবনদাতা। তাঁহার কাছে গিয়া বল, "বৃদ্ধ পাপী, পুরাতন দুরাত্মা আমি, তুমি নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের আধার, তোমার স্পর্শে তুমি আমাকে নূতন ও পবিত্র করিও লও।" আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি, যদি এইরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হই, আমার জীর্ণ পুরাতন জীবনও নূতন গৃহে প্রবেশ করিবে। যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, তাহার মুখশ্রীর নিকটে কোথায় থাকে প্রাতঃসূর্য্যের জ্যোতি, কোথায় থাকে প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্য! সূর্য্যের জ্যোতি বল, পূর্ণিমা বল, বসন্ত বল, সংসারের সুখ বল, কতক্ষণের জন্য? একটু মেঘ, একটু বিপ্লব, একটু বাত্যাতে সূর্য্যের জ্যোতি, চন্দ্রের

জ্যোৎস্না, সংসারের সুখ কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু যাহার চিত্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে বসিয়া শান্তিরস পান করে, যাহার অন্তরে সেই পাদপদ্ম হইতে চির পবিত্রতার বারিধারা আসিয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ে মেঘ নাই, ঝটিকা নাই, এবং অন্য কোন বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। ঐ দেখ, তাহার সম্মুখে ঈশ্বরের চির উজ্জ্বল গৃহ। ঐ দেখ, চিরবিশ্রামের শয্যা তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দেখ, প্রেমময় পিতা, আনন্দময়ী মাতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কখন সন্তান নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিবে। ঐ দেখ, ভক্তগণের মুখশ্রীতে কি নূতন পবিত্র জ্যোৎস্না, কি মধুর আনন্দের হাস্য! এই উৎসবে তোমাদের এবং আমার জীবন নূতন শোভা লাভ করুক! অদ্যকার দিনের এই শিক্ষা, এই অভিপ্রায়!

জীবন-পুস্তক।

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির)

রবিবার, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক ;

২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ইতিহাস সমুদয় বিদ্যার মূল, কেন না ইহার পৃষ্ঠাতে সমস্ত মানবজাতির কীর্ত্তি লিখিত হয়। ইতিহাসে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নীচত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শ্রেষ্ঠ হইতে চাও, যদি দোষ লজ্জা হইতে মুক্ত হইয়া সৎকার্য্যে উৎসাহী হইতে চাও, তবে ইতিহাস পাঠ কর। কোন্ ইতিহাসের কথা বলিতেছি? ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসের কথা। যেমন পৃথিবীর বিদ্যালয়ে নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিতে হয়, তেমনই ধর্ম্মবিদ্যালয়ে ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস পাঠ করিতে হয়। ধর্ম্মালয়ে ইতিহাস কোথায়? নানা জাতির ধর্ম্মগ্রন্থের কথা বলিতেছি না, তাহা অপেক্ষা নিগূঢ় গ্রন্থের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদ্রবিশেষ, তাহা মন্থন করিয়া রত্ন লাভ করা অনেক সময়ের কার্য্য। একখানি ইতিহাসের পুস্তক তোমার নিকট লুক্কায়িত আছে, যাহা তুমি পাঠ কর নাই। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল এবং কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ; কিন্তু সেই ইতিহাস বদ্ধ রহিয়াছে, তাহার পত্র পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই। অন্য সকলের ইতিহাস পড়া হইল, কিন্তু নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করা হইল না। আমার সম্পর্কে মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কি, তাহা যদি কেহ আমাকে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা আমার আপনার জীবনের ইতিহাস। আমার সম্বন্ধে অন্য কোন স্থানে ঈশ্বরের অঙ্গুলি-লিখিত গ্রন্থ নাই। তাঁহার নিজের স্বাক্ষর

যদি কোথাও থাকে, তাহা আমার নিজের জীবনপুস্তকে। আমার জীবনে যে সকল বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা আমি আপনি আপনার মস্তকে আনি নাই, যে সকল পাপ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, আমার নিজের চেষ্টাতে সে সকল হইতে অব্যাহতি পাই নাই। বাস্তবিক আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে ঈশ্বরের হস্তের স্বাক্ষর রহিয়াছে। জীবন শব্দের অর্থ কি ? যাহা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে, যাহা ঘটিবে। যে সমস্ত আন্তরিক শক্তি ব্যবহার করিয়াছি, ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহার করিব, সে সমুদয় জীবনের মূল। অতএব যতদিন এ সকল শক্তি থাকিবে, ততদিন আমার জীবনের ভিতরে, আমার প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি কার্য্য করিবে। হইতে পারে, অতীত জীবনের ঘটনা সকল এক প্রকার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাসকল অন্য প্রকার অক্ষরে লিখিত হইবে। কিন্তু গত জীবনে যিনি আমাকে আশ্চর্য্যরূপে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় পুরুষই ভবিষ্যতেও আমার সমক্ষে কোন পাপ প্রলোভন আসিলে তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। পূর্ব্বে যিনি পাপ ছাড়িবার জন্য গভীর অর্থপূর্ণ সঙ্কেত করিয়াছেন, পরেও তিনিই প্রত্যাদেশ করিয়া আমাকে পুণ্যপথে লইয়া যাইবেন। প্রলোভন অতিক্রম করার উপরে ভবিষ্যতের জীবন নির্ভর করে। হে মনুষ্য, তুমি ঈশ্বরের নিকটে পরিচিত ব্যক্তি। তোমার এবং তাঁহার সঙ্গে অনেক ঘটনা হইয়াছে। এই জন্য নয় যে তুমি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই জন্য যে তুমি তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তোমার গত জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান সময়ে তোমার জীবনসম্পর্কে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, এই বিষয়ে কি কোন আলোক পাও ? গত জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া কি বর্ত্তমান সময়ের কঠিন

প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে পার? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি চলিবে, পূর্ব্ব ঘটনাবলীর দ্বারা কি ইহা বুঝিতে পার? যদি নিজের জীবনে অন্ধকার দেখ, তবে আর কেহই তোমাকে আলোক দিতে পারিবে না। তোমার কঠিন প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজের জীবন-পুস্তকে লিখিত আছে। প্রতিদিন আপনার জীবনের ইতিহাস পাঠ কর, দিব্য জ্ঞান পাইবে, আলোক পাইবে, সুমধুর সান্ত্বনা পাইবে। সকল লোক তোমার বিপক্ষ হইলেও তোমাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না, তোমাকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তোমার নিজের জীবন ইতিহাসে তোমার সম্পর্কে ঈশ্বরের বিধান সকল পরিষ্কার-রূপে তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। সেই জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার আপনার জীবনপুস্তক দ্বারা তোমাকে যে সকল গভীর শিক্ষা দিয়াছেন, সে সকল বারংবার অধ্যয়ন কর। কিরূপে মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিবে, কিরূপে গূঢ় পাপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে, এ সকল পথ সেই পুস্তকে অঙ্কিত আছে। কেমন করিয়া যাতনা দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল এবং গভীর হয়, এ সকল সঙ্কেত তোমার জীবনের ইতিহাসে ঈশ্বরের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার অন্তঃ-করণে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করে, আপনার জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা অনুভব করে, ঘোর বিপদের মধ্যে, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মধ্যে, ঈশ্বরের সুমধুর সান্ত্বনা এবং আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করে, তাহাকে কেহ বিনাশ করিবে এমন সম্ভাবনা নাই। কি আক্ষেপের বিষয়, আমার সঙ্গে আমার ইষ্টদেবতার ক্রীড়া আর সকলে দেখিল, কিন্তু আমি নিজে দেখিলাম না। আমার সম্পর্কে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়, আমি যদি জানিতে পারি, আমার জীবনের ইতিহাস যদি আমি

পাঠ করিতে পারি, তবে যাঁহাদের দ্বারা ঈশ্বরের বিধানরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, আমিও তাঁহাদের একজন হইব। নিজের জীবন না পাঠ করিতে পারিলে অন্ধকারে থাকিব, ঈশ্বরের বিধান আমার নিকট প্রকাশিত হইবে না।

শক্তিতত্ত্ব।

রবিবার ২১শে কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক ;
৫ই নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

গভীর জল নদীর কোন্ স্থানে ? যেখানে শব্দ নাই, যেখানে আড়ম্বর নাই। যেখানে জলের মহাকোলাহল, সেখানে অতি অল্পদূর সেই জলের গভীরতা। আর যেখানে জলের অত্যন্ত গভীরতা, সেখানে জল স্থির ও পরিষ্কার। তেমনই যে সকল সত্য অতি গভীর, তাহা কোলাহলবিহীন। অতি পুরাতন, সরল এবং পরিষ্কার একটি সত্যের কথা আজ বলিতে চাই, সেইটি কি ? ঈশ্বর শক্তিরূপ। শক্তি দেবতা, শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং ধারণকর্ত্তা। যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিলে, তখন কি বুঝিলে ? শক্তি দুই হয় না। শক্তি এক। কি আগুনের, কি জলের, কি বজ্রের সমুদয়ের এক শক্তি। সকলের মূলে এক শক্তি। সেই এক শক্তি সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি যতক্ষণ শরীরে আছেন, ততক্ষণ চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, রক্ত চলিতেছে ইত্যাদি। আর এই প্রাণশক্তি শরীর হইতে কাড়িয়া লও, জলে জল, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা মিশিয়া যাইবে। যেমন নরদেহে শক্তি, তেমনই পশু-দেহেও সেই শক্তি। যেমন চেতনে শক্তি, তেমন জড়ে শক্তি। আবার শক্তিতে শক্তিতে যোগ দেখ। কোথায় সূর্য্য, আর কোথায় তোমার দেহ ; কিন্তু সূর্য্যের শক্তি তোমার দেহের শক্তির ভাবান্তর করিল। অগ্নির মধ্যে অঙ্গুলি রাখ, কিংবা জলের মধ্যে অঙ্গুলি রাখ, অগ্নির শক্তি ও জলের শক্তি তোমার অঙ্গুলির শক্তির ভাবান্তর করিবে। চন্দ্র তারার শক্তি নাই কে বলিল ? এইরূপ সমুদয় শক্তির মধ্যে পরস্পর যোগ রহি-

য়াছে। যে মৃত্তিকা হইতে আমার আহার্য্য উৎপন্ন হইল, আমার দেহ আবার সেই মৃত্তিকা হইয়া অন্যের আহার্য্য হইল। এইরূপে শক্তিচক্র ঘুরিতেছে। একই শক্তি সকলের মূল। এই আদি শক্তি যিনি বুঝিলেন তিনি ঈশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব জানিলেন। এই শক্তির বাহ্যিক আকার বিদূরিত কর। শক্তি নিরাকার। জড়ের নিজের কোন শক্তি নাই, আমার হস্ত জড়, হস্ত নিজে কিছু করিতে পারে না; কিন্তু মন বলিলেন, হস্ত ঊর্দ্ধদিকে উঠুক, উঠিল। হস্তের আর স্বতন্ত্র শক্তি কি? অতএব শক্তি নিরাকার অথচ আছে। কিছু চিরকাল আছে ইহা যদি স্থির হয় তাহা শক্তি। কেননা শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ এই আছে এই নাই। এই একই শক্তি সমুদয় ভূতের মধ্যে কার্য্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই শক্তি কোথা হইতে আসে? আধার ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তির অবলম্বন কি? শক্তির মূল কি? আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, ভক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। ভক্তি দেখিলেন, চন্দ্রের মধ্যে মাধুর্য্য শক্তি, বজ্রের মধ্যে ভয়ানক শক্তি, সায়ংকালের বিচিত্র ব্যাপারে, এবং ঊষাকালে অরুণোদয় সময়ে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি; কিন্তু এ সমুদয় শক্তির মূলে একজনের শক্তি দেখিয়া, ভক্তি তাঁহাকে জগতের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহাকে ভক্তি জগতের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহাকে বিজ্ঞান জগতের আদি শক্তি বলিল। তাঁহাকেই শাস্ত্রকারেরা চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এখানে শেষ হইল না। এই পর্য্যন্ত কবিত্ব এবং বিজ্ঞানের সীমা। তার পরে ধার্ম্মিকের কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন এই শক্তির ভিতরে আমি বাঁচিয়া আছি, যতটুকু এই শক্তির ভিতরে আছি ততটুকু আছি, ইহার

বাহিরে অন্ধকার মৃত্যু। ধর্ম্মজীবন এই শক্তির অংশ। ততক্ষণ জ্ঞান, সত্য লাভ করি, এই শক্তির ভিতরে যতক্ষণ আছি। ততক্ষণ প্রেম কি বুঝিতে পারি, যতক্ষণ এই শক্তির মধ্যে আছি। ততক্ষণ অন্তরে পুণ্যতেজ থাকে, যতক্ষণ এই শক্তির বর্ত্তমানতা অনুভব করি। আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার পুণ্য সমস্ত এই শক্তির আবির্ভাবে। এই শক্তির অবর্ত্তমানে যত মিথ্যা দুর্ব্বলতা, অন্ধকার, অপ্রেম, পাপ, তাহা আমি। এই শক্তি অন্তর্হিত হইলে যাহা থাকে তাহাই আমি। অর্থাৎ আমি অপদার্থ এবং পাপরাশি, এই শক্তি হইতে বিচ্যুত। যতটুকু এই শক্তি ততটুকু প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি। সমুদয় সৎবস্তুর আধার এই শক্তি। ইহার মধ্যে বিচিত্র ভাব। শক্তি বলিলে কত বুঝায়। শক্তি বলিলে জীবন, প্রেম, সৌন্দর্য্য সকলই বুঝায়। অতএব যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলি তখন তাঁহার মধ্যে গভীর অতলস্পর্শ প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি, সৌন্দর্য্য সকলই আছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই যে শক্তি ঈশ্বর, এই শক্তি শাস্ত্র হইতে এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, আমার প্রাণ এবং রক্ত সঞ্চালন, ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা, ঈশ্বরের আবির্ভাবের ফল। আমার জীবন এই শক্তিরূপী ঈশ্বরের আন্তরিক বর্ত্তমানতা। অতএব অহঙ্কার, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তিকে ডাকিয়া লও। তাঁহার জ্ঞানের ক্ষমতাতে অজ্ঞানতা থাকিবে না, তাঁহার প্রেমের আবির্ভাবে অপ্রেম দূর হইবে, তাঁহার পবিত্র বর্ত্তমানতার প্রভাবে পাপ অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে। এমনি গভীর এই শক্তিতত্ত্ব। অতএব সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতেই যেন আমরা জীবিত থাকি, কার্য্য করি এবং এই শক্তির উপরেই যেন আমাদের ইহকাল পরকাল সমর্পিত হয়।

যুগধর্ম্মবিধান।

মাঘোৎসব।

সায়ংকাল, রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

উৎসবক্ষেত্রবিহারী ব্রাহ্ম, স্থির হও, চল তোমার সঙ্গে এই বিচিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ছায়াতলে বসি, সেখানে বসিয়া দুই একটা কথা কহি। কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহ নির্ম্মিত হয়? কি পদার্থে? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইংলণ্ডদেশে ব্রিষ্টল নামে এক নগর আছে, সেখানে একটি সমাধিস্থান আছে। সেই শ্যামল নবদূর্ব্বাদলের নিম্নে একজন ব্রাহ্মণের কয়েকখানি অস্থি আছে। সেই সমাধিগৃহের দ্বারে একখানি মন্তব্য পুস্তক আছে। সেই পুস্তকে একজন লিখিয়াছেন:—"রাজা, তুমি ভারতবর্ষে যে বীজ বপন করিয়াছিলে, তাহার বৃক্ষের ফল আজ সহস্র সহস্র লোক আহার করিতেছে।" কে সেই রাজা? উৎসববিহারী ব্রাহ্ম, তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দাও। যখন ভূগর্ভে সেই ব্রাহ্মণের অস্থি নিহিত হইয়াছিল, তখন অদ্যকার বক্তা এবং শ্রোতাদিগের জন্ম হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিলে মনোহর পদার্থ চক্ষে আসিয়া পড়ে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদাদি প্রণেতাগণ, প্রাচীন মুনি ঋষি তপস্বী, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি সকলকেই নিকটতর দেখা যায়। যখন বেদ বেদান্ত এবং উপনিষদাদির শব্দ সেই ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। সেই প্রাচীন আর্য্যদিগের পুরাতন বাক্য সকল তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিল। ওঁকারের পর ওঁকার, শ্লোকের পর শ্লোক পঠিত হইল। পরাশর, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমাদের

যাহা যাহা দেয় আছে, তুমি সে সকল গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ নবীন অনুরাগ এবং ভক্তির সহিত সকলের চরণতলে বসিয়া অনেক সত্য শিক্ষা করিলেন। তাঁহার হৃদয়কোষে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ভারতে পুনরায় ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হইল। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে কুসংস্কার পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যাঁহার গম্ভীর ধ্বনি হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইত, পুনরায় নবীন তরুণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা গৃহীত হইলেন। ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের প্রচারিত ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ হইল না। নারদের বীণা আবার বাজিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ গঙ্গাতীরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া পাপাসক্ত জীব সকলকে উদ্ধার করিতেন। ব্রাহ্মগণ, তোমাদেরই দেশে গৌরাঙ্গ হরিনাম করিয়া সকলকে মাতাইতেন, অনেক শতাব্দী হরিনামের অপমান হইয়াছে, হরিনামের মধুরতা আস্বাদন না করিলে হৃদয়ের পাপতাপ যায় না। যেমন শতদ্রু নদী চলিয়া যাইতেছে, তেমনি নারদের বীণানিঃসৃত হরিনাম-লহরী চলিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মগণ, চল, সেই লহরীতে অবগাহন করি, প্রাণ মিষ্ট হইবে, শরীর শীতল হইবে। কত জ্ঞানাভিমানী লোক মনে করিয়াছিলেন চৈতন্যকে গৌরব দিয়া কি কুসংস্কারে মরিব? কিন্তু যখন নারদের মধুর বীণা বাজিল, যখন মধুর হরিনাম কীর্ত্তিত হইল, তখন আর তাঁহারা ভক্তি-ভাগীরথীজলে না নামিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই জলে তাঁহাদের কর্দ্দমিত শরীর নির্ম্মল হইল, প্রাণ সুখী হইল। দুঃখী যুবকগণ পথে পথে নগরে নগরে হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। শত যুবাবৃদ্ধ তাহাতে যোগ দিল। কুলবধূরা বাতায়নে দাঁড়াইয়া সেই নামলহরী পান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিল। যে হতভাগ্য যুবকগণ পিত্রালয়

হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, পিত্রালয় হইতে সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হওয়া কি দুঃখ তাহারাই জানে। তারপরে যখন উৎসবের গন্ধ পাইল, তখন তাহাদের দুঃখ দূর হইল, তাহাদের ভক্তি এবং উৎসাহের পুরস্কারস্বরূপ মৃত্তিকা হইতে এই মন্দির উত্থিত হইল। দুঃখী প্রচারকদিগের এমন একটী স্থান ছিল না যেখানে নিরাপদে বসিয়া ভাই ভগিনীদিগকে গুণ-ধামের গুণ শুনাইতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইতে এ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী ভাবিয়া দেখ, যাঁহাদের কেশ পক্ক তাঁহারাই বলুন দেখি এই প্রেম, এই ভক্তি, এই উৎসাহতরঙ্গ, এই প্রার্থনা, পূর্ব্বে কোথায় ছিল? পুরাতন মুনি ঋষিগণ ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহাদের ধ্যানবল এবং যোগবল দান করিলেন। নারদ এবং চৈতন্য ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহাদের ভক্তিরস প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে আর একজন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কপাল এবং সমস্ত শরীর হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, তিনি প্রেমার্দ্র হইয়া বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ, আমার নিকটেও তোমাদের প্রাপ্য আছে। যাহারা দুরাচার, বেশ্যাসক্ত, পাষণ্ড, অত্যন্ত জঘন্য এবং পতিত, তাহাদিগের কল্যাণের জন্য আমি আমার রক্ত দিয়াছি। এই আশ্চর্য্য অলৌকিক কৃপার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মেরা তাঁহার নিকট গেলেন। সেই মহর্ষি ঈশার স্বর্গীয় কৃপার কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তাঁহাদিগের মনে দৈববলের সঞ্চার হইল। কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইঁহাদিগের দেশ, তাহার উপর আবার দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধান! কিন্তু ঈশ্বরের ইঙ্গিতে স্থান এবং কালের ব্যব-ধান চলিয়া গেল। মহর্ষি ঈশা ব্রাহ্মদিগকে শিখাইয়া দিলেন, ঐ যে পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, উহার নিকট তোমরা বৈরাগ্য শিক্ষা কর, জগতের পরিত্রাণের জন্য অকপটে প্রাণ দান কর। ব্রাহ্মেরা বলিলেন, আমরা

অতি হীন জাতি, আমাদের তেমন বিশ্বাস এবং ভ্রাতৃপ্রেম নাই, তথাপি আমরা প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। আমরা জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইব। দুঃখী বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের উদয় হইল। অবরোধে অঙ্গনা বদ্ধ ছিলেন, ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমিও ব্রহ্মনাম গ্রহণ কর, আর তুমি ইন্দ্রিয়সুখে প্রোথিত থেক না, তোমাকে লইয়া পিতার সিংহাসনতলে দাঁড়াইব। রাজপুরুষেরা বলিলেন, ব্রাহ্ম, তুমি ধন্য! আমরা তোমার সাহায্য করিব। গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্ম বলিলেন, আমি প্রত্যাশার অধিক ফল লাভ করিলাম। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হইতে চলিল। বিদেশীয়েরা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজতরুর উপর জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। ইয়োরোপ, আমেরিকা সকলে মিলিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ বড় সুন্দর! নারদের বীণার সঙ্গে, দায়ুদের বীণা বাজিল। পৃথিবীর সমুদয় সাধুরা ব্রাহ্মকে জয়স্তু জয়স্তু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর উপর হইতে দেব দেব মহাদেব রাজাধিরাজ ঈশ্বর বলিলেন, এই যে ভক্তির ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা নারদ চৈতন্য প্রভৃতি সাধন করিতেন, এই যে যুগের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা মহাদেব প্রভৃতি সাধন করিতেন, ইহাকে নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া, হে ব্রাহ্ম, তোমার হস্তে দান করিয়া এবং ইহার মস্তকে আমার অনন্ত প্রেমের মুকুট পরাইয়া দিব। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল। ব্রাহ্মগণ, এমন সুখের ধর্ম্ম পাইয়া তোমরা কি করিলে? সমুদয় ভারতবর্ষ এই ধর্ম্মের জয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ত্রিম্বকেশ্বর হইতে গোদাবরী, বিশালবক্ষ ধর্ম্মোৎসাহী পুরুষদিগের বাসস্থান পঞ্চনদী পূর্ণ পঞ্জাব এই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত। এই যে বৃহৎ ধর্ম্মগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, ইহাতে অনেক অন্ন বিতরণ করা হইবে। হে উৎসবক্ষেত্রবিহারী ব্রাহ্মগণ,

এমন সুন্দর ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া তোমরা কি হইয়া আছ? আর ব্রাহ্মধর্ম্মের কথাই বা কেন বলি? যাঁহাকে লইয়া সকল ধর্ম্ম, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কত শত যোগী বৃক্ষপত্র খাইয়া কত কষ্টের তপস্যা করিত, যাঁহার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কত রাজা সম্রাট দরিদ্র হইতেন, সেই রাজাধিরাজ আজি এই মন্দিরে স্বয়ং অবতীর্ণ। ইঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আজ কোন্ ব্রাহ্ম এই উৎসবক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে? পুণ্য না লইয়া যেন কোন ব্রাহ্ম আজ এখান হইতে চলিয়া না যান। এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দায়িত্ব কত গুরুতর হয় তাহা সকলে অনুভব কর। তোমাদের ধর্ম্ম কত উচ্চ, আর তোমাদের জীবন কত নীচ। হে নিন্দিত, কলঙ্কিত, অপরাধী প্রাণ, তুমিই বল, তোমার ঈশ্বর কে? তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র কি? আর তুমি কি? এত অসমতা কি ভাল দেখায়? পুণ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রেম লইয়া, আনন্দ লইয়া, কেহই পলায়ন করিতে পারিবে না। পুণ্যহীন প্রেম, পুণ্যহীন আনন্দ কাড়িয়া লওয়া হইবে। উপযুক্ত হইতে হইবে, নইলে দণ্ড আছে, মৃত্যু আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই দণ্ড, কলঙ্ক এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন! আজ যাহা লব্ধ হইল, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের যে পূর্ণ সত্যধর্ম্ম তাহা যেন আমাদের চিত্তে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দ্বারা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিকটতা ঘনতর হয়। ভাই, এই বিধানের সঙ্গে মিশিয়া যাও। ঈশ্বরের বিচিত্রলীলার মধ্যে মগ্ন হও। নানা প্রকার বুদ্ধি চাতুরী করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া আর কি করিবে? এই যে ভক্তি-যোগের ধর্ম্ম এস ইহার সঙ্গে প্রাণ মনকে মিশাইয়া দিই। পরিণামে ভাগ্যই হইবে, মুক্তিই হইবে।

হে স্বর্গের রাজা, আজ তোমার স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাশি রাশি রত্ন দিলে। তোমার উৎসবক্ষেত্র বিচিত্র লীলাপূর্ণ রঙ্গভূমি। কৃপাময়,

এ আশ্চর্য্য স্বর্গের ছবি, এ অলৌকিক ধর্ম্মলীলা কার সাধ্য বর্ণনা করে। জগতের সকল লোকে চারিদিকে 'বলিহারি' 'বলিহারি' এই কথা বলিতেছে। তোমার উৎসবে আসিয়া প্রাণকে সার্থক করিলাম। আর তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। কি লইয়া তোমা হইতে স্বতন্ত্র থাকিব? কোন্ সুখের আশায় এখানকার সুখ পরিত্যাগ করিব? হে কৃপাময়, সামান্য বুদ্ধিও যার আছে সে এই সৌন্দর্য্য, এই অপার সুখ ছাড়িতে পারে না। আশ্চর্য্য তোমার লীলা! বিচিত্র তোমার ব্যাপার! বুদ্ধি লুপ্ত করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার ঐ সুন্দর শ্রীচরণতলে বাঁধিয়া রাখ। তোমার এই পূর্ণ ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া তোমার গৃহে চির-মুগ্ধ হইয়া থাকি, তব চরণে এই মিনতি।

Volum

ume 2

উপদেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

নববিধান ট্রষ্ট

কলিকাতা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ—১৮৪১ শক।

মূল্য ।৵০ আনা।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH,

AT THE MANGALGANJ MISSION PRESS.

3, RAMANATH MAZUMDAR'S STREET.

1919.

সূচীপত্র।

উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বরের বাণীই ধর্ম্ম।

১৯শে চৈত্র রবিবার, ১৭৯৯ শক ;

৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্ম কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করে না। ধর্ম্ম লইয়া সর্ব্বদা কোলাহল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম, সামগ্রী কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য দুই দিক্ হইতে দুইজন আসিলেন। এক-জন গম্ভীরাকৃতি, তাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড শাস্ত্র, তাঁহার মুখ হইতে নিয়ত বেদ বেদান্তের শ্লোক উচ্চারিত হইতেছে। তিনি হোম যাগ যজ্ঞ তপস্যা ব্রত নিয়মাদি সংস্থাপন করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে সকল বর্ণের উপরে উচ্চ স্থান দিয়া সম্মানিত করিলেন। অপর দিক্ হইতে আর একজন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিলেন, তাঁহার হস্তে কোন শাস্ত্র নাই। তিনি বাহিরের কোন আয়োজন লইয়া আসিলেন না। তিনি সংস্কৃত শ্লোক বা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলেন না, যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মও সংস্থাপন করিতে পারিলেন না। ইঁহাদিগের একজন বৃদ্ধ, সংসারের

নানা অবস্থাতে পড়িয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; আর একজন অল্পবয়স্ক অপারদর্শী, পাঠ অধ্যয়নের অবকাশ পান নাই। পৃথিবীতে অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকে সেই প্রবীণ বৃদ্ধের সম্মাননা করিল, শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিবার জন্য নিকটে আসিল। অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিল, তাঁহার জ্ঞানের সুখ্যাতি করিল। তাঁহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনিয়া অনেকে সুখী হইল। তাঁহার নিকট পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণের গভীর জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে জ্ঞানলাভ করিল। তিনি প্রাচীন নিয়মে গৃহকার্য্যের নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, বেদ-সঙ্গত স্মৃতি-সঙ্গত করিয়া সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিলেন।

এ দিকে অল্পবয়স্ক ব্যক্তির কথা অনেকে শুনিল না। ইনি শাস্ত্র বা মুনি ঋষিগণকে লইয়া জনসমাজের নিয়ম সংস্থাপন করিতে চাহিলেন না। ইনি সকলকে সম্ভ্রম করিলেন বটে, কিন্তু কাহাকেও এমন স্থানে সংস্থাপন করিলেন না যে, ধর্ম্মের রীতিনীতি সম্বন্ধের আজ্ঞা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি নিজের অন্তঃকরণ হইতে দুই একটি কথা বলিলেন। যত কিছু তাঁহার আস্ফালন সেই কথার উপরে। বৃদ্ধের প্রণীত গ্রন্থ লইয়া অনেক লোক সেই পথে চলিয়া গেল। এ দিকে অল্পবয়স্কের অন্তঃকরণ হইতে দু একটী কথা মাত্র উচ্চারিত হইয়াছিল,—এমন কথা যাহা শাস্ত্রে লেখে না, যাহা বুঝিতে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, এমন ব্যবহার-প্রদর্শক যাহা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দেখা যায় না, এমন প্রাণপূর্ণ যাহা পুরাতন বাক্যে দৃষ্টিগোচর হয় না,—সেই কথা শুনিয়া অল্পসংখ্যক লোক অন্তঃকরণের পথে আসিল। যে মার্গ তিনি দেখাইলেন, তাহা কাহারও পরীক্ষিত নহে, পথ তত প্রিয় এবং আহ্লাদকর নহে। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের সকল কথা অনেকে গ্রহণ করিল না,

তুচ্ছ সামান্য কথা মনে করিল। তিনি ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি বলিলেন, বেদপরম্পরাক্রমে যাহা বলিয়া আসিয়াছে, তাহা অবশ্য শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের বিষয় বটে, পুরাতনকালে ধর্ম্ম এবং নীতির নিয়ম যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা মান্য এবং পালনীয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম কি, এ প্রশ্নের উত্তর উহাদের দ্বারা হয় না। ধর্ম্মসামগ্রী কি, ইহা ঐ সকল পুরাতন শাস্ত্র বা ব্যবহার হইতে বুঝিতে পারা বা লাভ করিতে পারা যায় না। ইহা জানিবার জন্য অন্য নিয়ম। সে নিয়ম আর কোথাও বিবৃত হইতে দেখা যায় না।

অন্তঃকরণের ভিতরে গভীর স্থানে ঈশ্বরের সহবাস, সেই সহবাস-নিঃসৃত নির্ঝরে সারধর্ম্মের উৎপত্তি। প্রাণোচ্চারিত প্রার্থনার প্রথম শব্দে ধর্ম্মসামগ্রীর জন্ম। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া হৃদয়ের ভিতরে ডাকা হইল। ঈশ্বরকে পিতা কে না বলে; কিন্তু এ পিতা সে পিতা নহে। একজন যাহার পিতা আছে, একজন যে সম্প্রতি পিতৃহীন হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, এ দুয়ের মধ্যে সেই প্রভেদ। যাঁহার অভিভাবক এবং প্রতিপালয়িতা পিতা বর্ত্তমান আছেন, যিনি পিতার উপরে নির্ভর করিয়া স্ফূর্ত্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিয়াছেন, সমুদয় বিষয়ের জন্য পিতার প্রতি নির্ভর করাই যাঁর একমাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র মন্তব্য, গৃহ পরিবারের সমুদয় ভার পিতার হস্তে দিয়া যিনি পরম সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, প্রকৃত পিতা পাওয়া, প্রকৃতভাবে পিতা বলিয়া ডাকা কি। ফলতঃ হৃদয়ের মধ্যে এমন একজন অবতীর্ণ হওয়া চাই, যাঁহাকে দেখিয়া সমুদয় ভয় ভাবনা দুঃখ ক্লেশ চলিয়া যায়, সংসার অসংসার হয়, মনুষ্য বন্ধনবিহীন হয়। সমুদয় দুঃখ দুর্ব্বলতার মধ্যে এমন এক ব্যক্তি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দর্শন করাও যাহা, নির্ভর

করিয়া নির্ব্বিঘ্ন হওয়া এবং নিমগ্ন হইয়া সার ধর্ম্মরত্ন প্রাপ্ত হওয়াও তাহা। এই সন্তানত্বে সমুদয় ধর্ম্ম।

যাঁহার হস্তে সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি, প্রেমপূর্ণ-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে তাঁহাতে স্নেহের ভঙ্গী বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার হস্তে দারিদ্র্য বা ধন নাই, সহায়তা বা অসহায়তা নাই। সমুদয় কেবল এক গভীর পিতৃত্বে আচ্ছন্ন। এই গভীর পিতৃত্ব বহু পরিশ্রম করিয়া বা যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম পালন না করিয়াও লাভ করা যাইতে পারে। এই পিতৃত্বের নিকটে মনের কথা বলিয়া অনুরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পিতা বলিয়া ডাকিলে স্বর্গের মহাফল লাভ হইল। পিতা বলিয়া ডাকিলে পৃথিবীর সমুদয় উচ্চতর ফল একত্র গ্রহণ করা হইল। পিতা বলিয়া ডাকিলে মনুষ্যজগতে মনুষ্যের দেবত্ব লাভ হইল এবং সেই ধ্বনি দেবলোকে প্রতিধ্বনিত হইল। এই পিতৃত্বের আস্বাদ ভক্তেরা লাভ করিয়া থাকেন, এবং ইহাই ধর্ম্মের সার সামগ্রী। সংসারে যে পিতৃহীন, সে এই পিতৃত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে ও আদর করে। পিতৃত্বই তাহার প্রহরী হইয়া, বন্ধু হইয়া, নেতা হইয়া সমুদয় ভয়াপবাদ হইতে রক্ষা করে। পিতৃত্বই ঈশ্বর, পিতৃত্বই ধর্ম্ম, ইহাই জীবনের সার। মনুষ্য এই ধর্ম্ম পাইয়া সর্ব্বথা সুখী হয়। তবে যদি বল, শাস্ত্র কই? বিধান কই? শাস্ত্র মনুষ্যের মুখে। তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তোমাদের জীবনে। যখনই মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমা-দিগকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখনই তোমরা তাঁহার মঙ্গলভাবের সাক্ষী হইলে। এত বৎসর সম্পদে বিপদে তাঁহার পার্শ্বে বাস করিয়া উন্নতি ও বৃদ্ধিলাভ করিলে; এখন জিজ্ঞাসা কর, শাস্ত্র কি? তোমরা নিজেই পরস্পরের নিকট শাস্ত্র। তোমাদের জীবন মঙ্গলময়ের বিধান তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছে। মৃত পুস্তক কি এই

জ্বলন্ত জীবন্ত শাস্ত্রের নিকটে শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে? তোমাদিগের হৃদয়ে যে শাস্ত্র প্রকাশ পায়, তাহাই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। তোমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের কৃপার সাক্ষী হও; তাঁহার সত্যের সাক্ষী হও; তাঁহার পরিত্রাণদায়ী শক্তির সাক্ষী হও। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারী তোমাদের সমুদয় ব্যবহার হউক। এইরূপ হইলে তোমাদের জীবনই শাস্ত্র হইবে। ভ্রাতৃপ্রেম ভগিনীপ্রেম, ঈশ্বরের গৃহ এবং তাঁহার সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় শাস্ত্র অন্বেষণ করিবে? তোমরাই জীবিত শাস্ত্র। তোমাদের পরীক্ষা এবং আত্মার গঠনপ্রণালী শাস্ত্রের পরিচ্ছেদ ও তোমাদের উন্নতি ও সদ্‌গুণ শাস্ত্রের অভ্রান্ততা। ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর এবং পাঠ করাও। কেন না, সার ধর্ম্ম গ্রন্থে বদ্ধ নহে, রীতি বা মতের মধ্যে নহে; কিন্তু জীবনে উৎপন্ন এবং জীবনে ফলবান্। প্রত্যেক নিঃশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, শব্দ উচ্চারণ, হাস্য ক্রন্দন, দণ্ড পুরস্কার, শ্রমারাম, বন্ধুতা শত্রুতা, যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ সেখানেই ঈশ্বরের প্রকৃত শাস্ত্র। ধর্ম্মের সার বস্তু যদি চাও, জীবনের গভীর তত্ত্ব মধ্যে উহা অন্বেষণ করিবে। ইহা এখনকার জন্য যথেষ্ট এবং পরেও ইহা হইতে আরও যথেষ্ট ফললাভ করিবে।

অন্তঃকরণে মঙ্গলভাব কি অবসন্ন হইয়াছে, জীবনবৃক্ষে কি আর রস নাই, ধর্ম্মজীবন কি নিঃশেষ হইল, স্বর্গীয় অভিপ্রায় কি বিরত হইয়াছে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কি বন্ধ হইয়াছে, সদ্ভাব-সরোবর কি শুকাইয়াছে? কেন, ঈশ্বর কি মরিয়া গিয়াছেন? এত গোলযোগ কিসের জন্য? তিনি আর প্রত্যাদেশ করেন না, মনুষ্যের আত্মাতে অগ্নিবৃষ্টি করেন না? এই মন্দিরে যদি ঈশ্বর দাঁড়াইয়া থাকেন, ব্রহ্মের অগ্নিতে সমুদয় বিঘ্ন দগ্ধ হইবে। যিনি আমাদিগকে এখানে আনিলেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা আমা-

দের সঙ্গে কথা কয়, ইহা আমাদের ধর্ম্ম। তাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার প্রত্যাদেশ, ইহা আমাদের বিশ্বাসের প্রাণ। অন্তঃকরণ তাঁহার শব্দ শ্রবণ করিবেই করিবে, নতুবা তোমার ধর্ম্ম মিথ্যা। এত প্রলাপ করিতেছ কেন? মিথ্যা চীৎকার করিতেছ কেন? কে তোমার আড়ম্বরে ভীত হইবে? এ জীবন, এ হৃদয় কি মৃতধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে? অনন্ত ঈশ্বর, অনন্ত তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি মঙ্গলময় হইয়া প্রাণপূর্ণ হইয়া নিয়ত প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিদিন তাঁহার মহদভিপ্রায় পাঠ করিতে পাইবে, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তাঁহার গভীর তাৎপর্য্য নিহিত দেখিবে, সর্ব্বদা জ্বলন্ত হুতাশনে পরিবেষ্টিত থাকিবে। ধর্ম্মসামগ্রী তেজোরাশিতে পরিপূর্ণ, যাহা তেজোবিহীন মনুষ্য তাহা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য তেজের মধ্যে বিরাজিত। ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় কেবল এইরূপ ধর্ম্মের বিশ্বাসেই প্রকাশ পায়। যদি পুস্তকে ধর্ম্ম দেখিতে চাও, যদি পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে ধর্ম্মকে উপার্জ্জন করিতে চাও, তবে যাও, পুরাতন সম্প্রদায়ভুক্ত হও। যাঁহারা ব্রাহ্ম, ব্রহ্মতেজ তাঁহাদিগের জাগ্রত ধর্ম্ম। তাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মের আলোকে চলেন, ব্রহ্মনেতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হন, ব্রহ্মভেরীর শব্দ শুনেন। তাঁহারা সর্ব্বদা স্বাধীন এবং প্রমুক্ত। তাঁহাদের বিচারপতি রাজা সদা দিগ্বিজয়ী। তিনি যাহা বলেন, তাঁহারা তাহা পালন করেন। তাঁহারা তাঁহার কথা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম মানেন না। আলোকবিহীন হইয়া তুমি যাহাকে ধর্ম্ম মনে কর, তাহা অধর্ম্ম, তুমি যাহা সত্য মনে কর, তাহা অসত্য। ধর্ম্ম এবং সত্য কেবল ঈশ্বরের মুখে, মুক্তি এবং পরিত্রাণ কেবল তাঁহার সহবাস। হৃদয়ে তোমার ভালভাব আসুক না, তোমার অভিপ্রায় ভাল হউক না, যদি তোমার ভাবে এবং অভিপ্রায়ে সে জ্যোতি প্রকাশ না পায়, তবে

সকলই ব্যর্থ। আজ্ঞার হুঙ্কার যদি তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, সেনাপতির উৎসাহবাক্যে যদি যুদ্ধে প্রবিষ্ট না হও, তবে তুমি পরাজিত হইবে। যথোচিত বিদ্বান্ হইলে, বিবিধগুণে ভূষিত হইলে, তাহাতে কি হইল? ধর্ম্ম ত হইল না। জ্বলন্ত ঈশ্বরের শক্তি তোমার প্রাণের ভিতরে অনুভূত হইলে, তবে তোমার ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে। এখানে আইন কানুনের প্রচার নাই। ঈশ্বরের প্রকৃত শিষ্য হইলে, ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হইলে, সমুদয় নীতি, সমুদয় ধর্ম্মের সার অবগত হওয়া যায়। প্রাণের মধ্যে সেই মঙ্গলময়ের পিতৃত্ব প্রকাশিত দেখ, গভীর মঙ্গল সহবাস মধ্যে প্রবিষ্ট হও, জীবনে তাঁহার জীবন্ত শাস্ত্র পাঠ কর, তাঁহার গম্ভীর বাণী শ্রবণ কর। যে হৃদয়ে সর্ব্বদা মলয়-সমীরণ বহিতেছে, মধুর শব্দে কর্ণ জুড়াইতেছে, সে হৃদয় নিয়ত শান্তিপূর্ণ আশাপূর্ণ; মুখ সর্ব্বদা তেজোবিশেষে প্রফুল্ল। সেখানে ক্রোধ দুঃখ মনস্তাপের প্রচার নাই। জীবনের আশ্চর্য্য ধন সেখানে লাভ করা যায়, যাহা কিছু যথার্থ ধর্ম্মসামগ্রীর সার, তাহা সেখানেই।

একাকিত্ব।

(নবম ভাদ্রোৎসব।)

প্রাতঃকাল, ১০ই ভাদ্র, ১৮০০ শক ;

২৫শে আগষ্ট, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের দাস একাকী। ব্রহ্মভৃত্য একাকী এবং বহুলোকসমভিব্যাহারী। জনাকীর্ণতামধ্যে ব্রহ্মভৃত্যের প্রাণ নিরবচ্ছিন্ন একাকী। অভেদ্য একাকিত্বের মধ্যে ব্রহ্মভৃত্যের প্রাণ বহুলোকসমভিব্যাহারী। সত্যধর্ম্ম মানুষকে একাকী করে। বৃথা কোলাহলে এত বৎসর কাটিয়া গেল। বৃথা জল্পনাতে কি এত বৎসর কাটিল না, মন, বল দেখি? ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াও আপন জীবনদোষে পাপহ্রদ খনন করিলাম। এখন একাকী হইতে চাই। একাকী কি করিতে চাই? একাকী পুণ্যাগ্নি সেবন করিয়া শুদ্ধ হইতে চাই। প্রেমসিন্ধুর গভীর জলে মগ্ন হইয়া একাকী পৃথিবীর হিংসা পাপ অনল হইতে রক্ষা পাইতে চাই। ঘরে বসিয়া যে ঈশ্বরকে চায়, তাঁহাকে সে লাভ করে। ঘরে বসিয়া যে তাঁহার সাধন ভজন করে, স্বর্গের অতুল ধনরাশি আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। ব্রাহ্ম ভাই, শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্মিকা ভগিনী, তুমি একাকী কেন প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের গুণে মগ্ন হইলে না? যখন সকলে নিদ্রা যায়, তখন তুমি কেন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিশ্রাম কর না? একাকী ঈশ্বরকে দর্শন করিবে; মঙ্গলময়কে একাকী অন্বেষণ করিবে। একাকী ছাদের উপরে বাঘের ছাল পাতিয়া বীণাযন্ত্র ধরিয়া তাঁহার গুণ গাইতে গাইতে সেই ভাবে তাঁহাকে দেখিবে, স্বর্গের পুণ্যাত্মারা যেমন তাঁহাকে দেখেন। ধর্ম্ম যদি

গোপন না হইল, তুমি কেমন করিয়া অনন্তকাল দীনবন্ধুর সঙ্গে বাস করিবে? কেবল হাটের মধ্যে, মাঠের মধ্যে চীৎকার করিয়া কি ঈশ্বরকে লাভ করা যায়? একাকী সাধন না করিলে গুপ্তধন নির্ম্মল পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয় না। যাঁহারা উপাসনাশীল ধ্যান-পরায়ণ সাধক, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য তৃষিত, তাঁহারা একাকিত্বপ্রিয়। তাঁহারা স্বভাবতঃ নির্জ্জনতা অন্বেষণ করেন, নির্জ্জন একাকিত্বের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন। যখন তাঁহারা একাকী বসেন, তখন তাঁহারা মনে করেন যেন গৃহে আসিলেন। ঈশ্বর একাকী, একাকিত্ব-প্রিয় সাধক তাঁহার নিকটে গেলেন, নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নিতে তাঁহার আত্মা তেজস্বী হইল। নির্জ্জন সাধক অসঙ্গ হইয়া ব্রহ্মসহবাসরূপ বস্ত্র লাভ করেন। ব্রাহ্ম ভাই, তুমি কিম্বা আমি কি পরস্পরের নিকটে মনের গূঢ়তম পাপ সকল বলিতে পারি? কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে একাকী গোপনে মনের পাপ স্বীকার করা যায়। যিনি পাপিষ্ঠের গোপনতম অভিসন্ধি জানিয়া তাহা বিনাশ করেন ও সুমতি দেন, সেই পাপহারী হরির নিকটে ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, তুমি গেলে না কেন? ব্রহ্ম-স্থিতিরূপ পবিত্র শিবিরের মধ্যে লুক্কায়িত না হইলে তোমার প্রাণ কিসে পরিষ্কার হইবে? ঈশ্বরের সহবাসের ন্যায় পবিত্র বস্তু ত্রিভুবনে আর কি আছে? ভাই, ভগিনী, তুমি সেই নির্জন ব্রহ্মসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জনাকীর্ণ হাটের মধ্যে গিয়া মূলধন পর্য্যন্ত হারাইলে। অতএব বলি, একাকী হও, অসঙ্গ হও। নির্জন হইয়া বুঝিয়া দেখ, ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ তোমার ভাল লাগে, তাঁহার কোন্ অংশে তোমার চিত্ত শীতল হয়। একাকী ইহা বুঝিতে বুঝিতে ও সম্ভোগ করিতে করিতে কত লোক কত বর্ষ কাটাইয়া শেষে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্ম ভাই, গুপ্তধন উপার্জ্জন কর। কিন্তু কেবল যে একাকী চিরকাল সাধক ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ

করেন, তাহা হয় না। ঈশ্বরের সত্যধর্ম্মের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। যখন কিছু-কাল একাকী সাধন করিবে, তখন ধর্ম্মমাতা বলিবেন, "সঙ্গ লও, সাধুসঙ্গ কর, আমার সন্তানদিগকে ডাকিয়া পুণ্যের অমৃত পান করাও। আমার পুণ্যাত্মা সন্তানদিগের আশ্রয় লও।" তুমি বলিবে, আমি একাকী ঈশ্বরকে লইয়া থাকি; কিন্তু বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে তাহা হইবার যো নাই। একাকী উপাসনা করিতে পার, একাকী অধ্যয়ন করিতে পার; কিন্তু যে ঐশ্বর্য্য, যে শান্তির জন্য তোমার প্রাণ আকুল, তাহা লব্ধ হইবে না, যদি তুমি ব্রাহ্ম পরিবারের একজন বিনীত কনিষ্ঠ না হও। সকলের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তিতে প্রণত না হইলে, বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত হইতে পারিবে না। যদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য দেহ ক্ষয় না কর, যদি এই ঐহিক জীবন-বীজ বিদীর্ণ হইয়া বহু শস্য প্রসব না করে, তবে প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে পারিবে না। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা, তাঁহার এই বিধি, যাহা একাকী লাভ করা যায় না, তাহা দশজনের মধ্যে লাভ করিবে; এবং যাহা দশজনের মধ্যে লাভ না হয়, তাহা একাকী অর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ভক্তবৃন্দের সহবাস ভিন্ন তোমার কল্যাণ নাই। তোমার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গঠন করিতেছেন। ভক্তদিগের আত্মার সমবেত ভক্তিস্রোতে যদি তুমি অঙ্গ ঢালিয়া না দাও, তোমার অপবিত্র শরীর মন কিরূপে পবিত্র হইবে? যেখানে পাঁচজন ভক্তি-অশ্রুতে ভাসিতে-ছেন, সেখানে না গেলে তোমার হৃদয়ের মলিনতা এবং কঠোরতা দূর হইবার নহে। ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে, ভক্তবৃন্দের মধ্যে থাকিলে মন পবিত্র এবং উন্নত হয়, এই জন্য ব্রাহ্মপরিবারের এত গৌরব। এই জন্য সাধু-সঙ্গের এত মাহাত্ম্য। পাঁচজন ভ্রাতা ভগিনীর পদপার্শ্বে বসিয়া ভক্তিলাভ করিতে হইবে। একাকী আর সঙ্গী হওয়া, ভিন্ন বস্তু নহে। মন, এই

দুইটী ভিন্ন করিলেই তুমি মরিলে। ব্রহ্ম যেমন একাকী, ব্রহ্মভৃত্যও তেমনি একাকী। ব্রহ্ম অসঙ্গ এবং একাকী হইয়াও সমস্ত নরনারীদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ও সকলকে পবিত্র সহবাস বিতরণ করেন, সেইরূপ ব্রহ্মভৃত্য একাকী হইয়াও সমুদয় লোকের সঙ্গ করেন। তিনি নির্জ্জনে যে পবিত্রতা প্রেম অর্জ্জন করেন, দশজনকে তাহা বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হয়। একজন ভক্তের উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিলে অন্যান্য ভক্তদিগের ভক্তি বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা বলেন, ভ্রাতার প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম দেখিয়া হৃদয় জুড়াইল। ভক্তের মুখকমল না দেখিলে, ভক্তের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদিগের প্রাণ বিদীর্ণ হয়। ভ্রাতাকে না দেখিলে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ দেখিব কোথায়? স্বর্গের মিষ্ট কথা শুনাইব কাহাকে? ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ধর্ম্মসাধনে সুখ কোথায়? ভ্রাতাকে বক্ষে রাখিব, ভ্রাতাকে মস্তকে স্থান দিব, ভ্রাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিব। একাকী এবং অসঙ্গ হইয়া ভ্রাতাদিগকে ভাল না বাসিলে স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় না। অতএব হে ভাই, হে ভগিনী, মিনতি করিয়া বলি, ব্রাহ্মসমাজের আপদ উপস্থিত হইলে তুমি বুক দিয়া পরিশ্রম করিবে না, এমন কথা মুখে আনিও না। তুমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া কোথায় শান্তি পাইবে? তুমি ভক্তির প্রথম অক্ষর কোথায় শিখিলে? তুমি পবিত্র হইবার উচ্চ আশা কোথায় পাইলে? ব্রাহ্মসমাজ-জননীর নিকট তুমি সত্যধর্ম্ম এবং সার ভক্তি শিক্ষা করিয়াছ, এখন কৃতঘ্ন হইও না। লবণ খাইয়া এত দিন পরে নিমকহারামী করিও না। যেস্থানে বসিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিলে, কত স্বর্গের সুখ ভোগ করিলে, সেখানে ঝড় উঠিলে, ভীরু আত্মা, তুমি পলায়ন কর। যথার্থ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বিপদ দেখিয়া ভীত হন না, তিনি মস্তকের

আবরণ খুলিয়া প্রস্তরকে ডাকিয়া বলেন, এস আমাকে আঘাত কর। যে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের প্রাণ, যেখানে বিনামূল্যে সর্ব্বস্ব পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজের বিপদ উপস্থিত হইলে আমরা কোন্ মুখে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ব্রাহ্মসমাজ-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব ? আমাদের কি মনে নাই যে, আমরা বিশ বৎসর আগে কি ছিলাম, জঘন্য চণ্ডাল ছিলাম, এখন কোথায় আসিয়া কাহার পবিত্র নাম গাইতে শিখিয়াছি ? যাঁহাদের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না, কোন প্রকার রক্তের সম্পর্ক ছিল না, তাঁহারা আমাদিগকে ভাই ভগিনী পিতা মাতার ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ইঁহাদিগকে পাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ জননীর ন্যায় এতকাল আমাদিগকে প্রতিপালন করিলেন, এমন জননীর বিপদ হইলে ব্রাহ্ম, তুমি উদাসীন হইবে ? এই কৃতঘ্নতার ক্ষমা নাই, অতএব এই কৃতঘ্নতা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা কর। ব্রাহ্মসমাজের সকলকে প্রেম দান কর। যাঁহারা ঈর্ষাপরবশ নিন্দুক, যাঁহাদের শত অপরাধ আছে, তাঁহাদিগকেও মনের গভীর প্রেম শ্রদ্ধা দাও। তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অতুল ঐশ্বর্য্য আসিবে। তাহা হইলে স্বর্গরাজ্যের এমন সকল ব্যাপার দেখিবে, যাহা কখনও চক্ষে দেখ নাই, কর্ণেও শ্রবণ কর নাই। নির্লিপ্ত এবং অসঙ্গ হইয়া অকাতরে ব্রাহ্মসমাজের জন্য পরিশ্রম কর ; কিন্তু সাবধান, কোন মনুষ্যের নিকট পুরস্কার চাহিবে না। ব্রাহ্মসমাজের নিকটে আমরা যে প্রকার ঋণী, তাহাতে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া পরিশ্রম করিলেও সেই ঋণ পরিশোধ হইবে না। কোন মনুষ্যের নিকট বেতন অথবা পুরস্কার প্রত্যাশা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। যখন ভ্রাতাদিগের অত্যাচারে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, যখন তাঁহাদের কুকথায় প্রাণ সূচিবিদ্ধ হইবে, তখনও

তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে ; কিন্তু পুরস্কার এবং শান্তির জন্য একাকী দীনবন্ধুর নিকট যাইবে, যিনি ভিন্ন মৃত্যুকালে কেহ সঙ্গী হইবে না, যাঁহার মত আর বন্ধু নাই। যখন সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা পাইব, তখন একাকী গিয়া তাঁহাকে বলিব, "পিতা, শ্রান্ত হইয়াছি, আরাম দাও।" পিতার নিকট একাকী গিয়া সান্ত্বনা পাওয়া যায়, দুঃখের সময় ঈশ্বর আসিয়া ভৃত্যকে সহায়তা দান করেন। অতএব একাকিত্ব অথবা নির্জন ঈশ্বর-সহবাস-প্রিয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা কর। যতদূর সাধ্য সকলের সঙ্গে কৃষকের ন্যায় শ্রম যত্ন করিয়া একাকী ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হও।

পৌরোহিত্য।

সায়ংকাল, রবিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৮০০ শক ;

২৫শে আগষ্ট, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রাহ্ম, তুমি পুরোহিত, ব্রাহ্মিকা, তুমি পুরোহিত। পৌরোহিত্য অবলম্বন কর। কার গৃহের, কোন্ পুরের পুরোহিত? ঈশ্বরের প্রেম-পুরের পুরোহিত। পুরের হিতসাধন করা, পৌরোহিত্য করা তোমার ধর্ম্ম, ইহা যদি ভুল, তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আসিতেন না, যদি পৌরোহিত্যের প্রয়োজন না থাকিত। ধর্ম্মই হইল পুরোহিতের কার্য্য। পুরোহিতের কার্য্য কি? পুরোহিত গৃহে পূজা করেন, দেবা-র্চ্চনার ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মের কার্য্য কি? জগতে পূজা করা, পূজা প্রচার করা, পূজাতে আনন্দিত হওয়া, যেখানে পূজার আহ্বান সেখানে গমন করা। পৃথিবীতে সত্য পূজার অভাব হইয়াছে। কুপূজা বিনাশ করিয়া সুপূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছেন। পৃথিবীতে অনেক প্রকার পূজা-প্রণালী প্রচলিত আছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি শিক্দিগের পূজার ঘটা দেখিলে ব্রাহ্মদিগকে নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতে হয়। একদিনের উৎসবে আমরা ক্লান্ত হই, কিন্তু অমৃতসর গুরুদরবারে গিয়া দেখ, সেখানে শত শত লোক নিত্য উৎসব করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নাই। নানা প্রণালীতে পূজা হইতেছে ; কিন্তু সেই পূজার ভিতরে প্রাণময় ঈশ্বরের উপস্থিতি কোথায়? পূজার প্রাণ কোথায়? প্রাণময় ঈশ্বরের পূজা প্রচার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়তি। পৃথিবীর সৌভাগ্য যে,

ব্রাহ্মসমাজ ইহাঁকে প্রকৃত পূজার পথ দেখাইবেন। সাকার পূজা নয়, নরপূজা নয়, নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মের পূজা করেন কে? তুমি আমি সেই ব্যক্তি নহি। এমন লোক হয়ত এখানে নাই, তিনি হয় ত এখনও ভুবনে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে আরাধনার লহরী উঠে, তিনি ধন্য। ব্রাহ্ম, তুমি পুরোহিত, তোমাকে আমার গৃহে গিয়া পূজা করিতে হইবে। আমার গৃহে কেন? কেবল আমার গৃহে কেন, সকল লোকের গৃহে গিয়া তোমাকে এই স্বর্গীয় ব্রহ্ম-পূজা শিক্ষা দিতে হইবে? পুরোহিত, তুমি নিজে কেমন পূজা শিখিলে? তোমার জাতির ব্রত পূজা প্রচার করা, তোমার জীবনের কার্য্য পূজা শিক্ষা করা এবং পূজা শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু হে শিক্ষক, হে কপট ব্রাহ্ম মন, তোমাকে ধিক্! যে ধর্ম্মের প্রাণ ব্রহ্মপূজা, তুমি এখনও সেই পূজা করিতে শিখিলে না। পূজার অভাবে জগতের লোক সকল মৃতপ্রায়। পূজার সময় জগতে এখন নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি সঙ্গীত নৃত্যাদি হয়, এবং নানাপ্রকার পাপস্রোত বৃদ্ধি হয়। জগতের এই অধোগতি দেখিয়া ঈশ্বর স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ জগৎকে সত্যপূজা শিখাইবেন। সুতরাং ব্রাহ্মেরা যদি অলস এবং অভক্তভাবে আধঘণ্টাকাল ব্রহ্মোপাসনা করিয়াই পূজা হইল এই মনে করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মনাশ হইবে। যে ভক্তিভাবে ব্রহ্মপূজা করে না, সে ব্রাহ্ম হইল কেন? ভক্তিপুষ্পে ব্রহ্মপূজা করিতে না শিখিলে কিরূপে পুরোহিত হইবে? যতদিন না ক্রমাগত চক্ষের জলে ভাসিয়া ব্রহ্মপূজা করিতে শিক্ষা করিবে, ততদিন তুমি পুরের অহিতকারী। পুরের হিতসাধন না করিলে তুমি জীবিকা ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। পূজাতে দক্ষ হইতে হইবে। পুরোহিতের এই প্রথম কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্য, বিবিধ

মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট নিবারণ করা। নির্জীব অনুষ্ঠানাদির দ্বারা পৃথিবীর অমঙ্গল হইতেছে। কপট হোম, তপ, দান ও উপবাসাদি দ্বারা জগতের দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে গৃহের ধর্ম্ম হইবে, সেই গৃহে সকল প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরোহিত, তাঁহাদিগের নিজের গৃহে বিবাদ কলহ প্রহারাদি চলে কি না? পুরোহিতের নিজের গৃহে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে কি না? ঈশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীতে ঘোরতর অশান্তি এবং বিবাদের অনল জ্বলিতেছে। জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম, তীক্ষ্ণ অসি এবং অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা একদল মনুষ্য অন্য দলকে যমালয়ে পাঠাইতেছে। আপনার ভ্রাতার রক্ত পান করিয়া মনুষ্য উন্মত্ত। মনুষ্যজাতি ছলে বলে এবং নানা মতে পরস্পরের সর্ব্বনাশে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের অত্যাচার এবং যুদ্ধ বিগ্রহে সহস্র সহস্র নারী বিধবা এবং সহস্র সহস্র শিশু অনাথ হইতেছে। এ সকল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মধ্যে কপট পুরোহিত স্বার্থসাধনের জন্য মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। ভয়ানক অকল্যাণের জলপ্লাবনে পৃথিবী রসাতল যায়। ঈশ্বর জীবের এ সকল দুঃখে আহত হইয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম, তুমি পৃথিবীতে যাও, তুমি আমার ক্ষমাশীলা কন্যা, তুমি গিয়া অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি এবং ক্ষমা শিক্ষা দাও। তোমার চক্ষু হইতে পবিত্রতার জ্যোৎস্না এবং প্রেম শান্তি নির্গত হউক! পৃথিবীর যে সকল স্থানে অমঙ্গল হয়, সে সমুদয় স্থানে গিয়া তুমি কল্যাণের তালপত্র বীজন কর।" ঈশ্বরের আদেশ গ্রহণ করিয়া মাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আসিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দুই চারিটী সন্তান জন্মিল। তাহাদিগকে বলিলেন,—"সন্তানগণ, পৌরোহিত্য তোমাদিগের জীবনের কার্য্য। সংসারের বিবাদ, অকুশল,

অশান্তি দূর করিয়া প্রেম এবং শান্তি বিস্তার করা তোমাদিগের ধর্ম্ম। কেন না সংসারের এ সকল দুঃখ দূর করে আর কেহ নাই। পৃথিবীতে অনেক চিকিৎসক এবং অনেক পণ্ডিত আছেন, কিন্তু শান্তি সংস্থাপন করেন এমন লোক অতি বিরল। অতএব বৎসগণ, তোমরা গিয়া পৃথিবীতে কুশল শান্তি বিস্তার কর। "শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।" ভাই ব্রাহ্ম, জিজ্ঞাসা করি, জননী ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ তোমরা কতদূর পালন করিয়াছ? এই শান্তিজল কতদূর সিঞ্চন করিয়াছ? কপট ব্রাহ্ম, তোমাকে ধিক্! কোথায় গিয়া তুমি পরের দুঃখ নিবাইবে, না তুমি আপনার পরিবার মধ্যেই অসি চালনা করিলে। শাণিত অস্ত্র সকল আত্মীয়দিগের বক্ষে বিদ্ধ করিলে। তোমার পাপের কি ক্ষমা আছে? শান্তিসংস্থাপকের কার্য্য হইল আত্মীয়দিগের বুকে খড়্গাঘাত করা? ভ্রাতৃঘাতকতার রক্তে তোমার হস্ত কলঙ্কিত। এই পাপ কাটে এমন প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? এই মহামেলায় অনুতপ্ত হও। পিতার নিকট বারম্বার ক্ষমা চাও। আর কখনও তাঁহার পরিবার মধ্যে অশান্তি আনিবে না, পিতার নিকটে চিরজীবনের জন্য এই প্রতিজ্ঞা কর। জগতে দুটি বিষয়ের অভাব ছিল। এক পবিত্র পূজা-প্রণালী, দ্বিতীয় শান্তি। এই দুটি প্রকাশ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্মসমাজ জগৎকে এই দুটি দান করিবেন। আমি পুরোহিত প্রচারক বুঝি না। যিনি আমার গৃহে পূজা করেন, কুশল বিস্তার করেন, তিনি প্রচারক হউন আর নাই হউন, তিনি আমার পুরোহিত। কপট ব্রাহ্ম, তুমি পুরোহিতের মান এবং বৃত্তি চাহিলে; কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মপূজা এবং কুশলবিস্তার করিলে না। সেই জন্য তোমার নিজের গৃহের ভিতরের প্রেমফুল শুষ্ক হইল। সাবধান হও, ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, যতদূর সাধ্য ব্রহ্মপূজায় এবং

পরস্পরের মধ্যে কুশল বিস্তারে প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মপূজার এক শব্দে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। ব্রহ্মপূজার ভয়ানক শক্তি! যে সকল জেতাগণ এখন ভারত অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশেও এই ব্রহ্মপূজার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়াছি। হে ব্রাহ্ম পুরোহিত, তুমি নিরাশ হইও না, তোমা দ্বারা পৃথিবীতে ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পুণ্য, স্নেহ, প্রেম, শান্তি, কুশল প্রচারিত হইবে। হে কপট ব্রাহ্ম, তোমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দ্বারা যদি এ সকল প্রকাশিত হয়, তবে ভালই, তাহা না হইলে তুমি যমালয়ে চলিয়া যাইবে; অন্যান্য পুরোহিত আসিয়া উহা প্রকাশ করিবেন। যথার্থ ব্রহ্মপূজা বিনা জগৎ মৃতপ্রায়। অতএব প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা পূজা-প্রিয় হও, পূজা শিক্ষা দাও; কল্যাণ-প্রিয় হও, কল্যাণ অনুষ্ঠান কর। তোমরা এইরূপে মাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশানুসারে জগতে পুণ্য এবং শান্তি বিস্তার করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বর্গে গিয়া বলিবেন;—"মঙ্গলময়, যে উদ্দেশ্যে তোমার কন্যাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।" তখন ধরা-ধামে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। অকুশল অশান্তির পরিবর্ত্তে চারিদিকে শান্তি এবং কুশল বিরাজ করিবে। তখন সকলের মনে সাধু ইচ্ছা এবং সদ্ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, এবং পৃথিবীতে সেই শান্তিধাম প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহার জন্য আমরা বহুকাল আশার সহিত পরিশ্রম করিতেছি।

স্বর্গের সংগ্রাম।

(মাঘোৎসব)

সায়ংকাল, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সংগ্রামের বাদ্য বাজিল। স্বর্গে সংগ্রামের বাদ্য বাজিল, শ্রবণ কর। স্বর্গীয়েরাই যোদ্ধা। পৃথিবীতে কি যোদ্ধা আছে? পৃথিবীতে বীরত্ব কই? স্বর্গীয়েরাই তেজঃপুঞ্জ। যোদ্ধৃবংশ, নৃত্য কর; ধার্ম্মিকদল, নিদ্রা আলস্য ঝাড়িয়া ফেল। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে চান না, শোকভরে তাঁহার মন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়, ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হয়, তিনি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার সারথি, তাঁহার নেতা তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য সদুপদেশ দেন। গীতাতে যুদ্ধের প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণিত। শান্তি-প্রিয় হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা যুদ্ধে মনকে উত্তেজিত করিতেছে। কে বলিল, স্বর্গে যুদ্ধ নাই, হুঙ্কার নাই? কে বলিল, দেবতারা আরাম করেন? কে বলিল, স্বর্গীয়েরা দ্বন্দ্ব করিবার প্রকৃতি ত্যাগ করিয়াছেন? এই কথা যাহারা বলে, তাহারা মিথ্যা বলে। যুদ্ধধ্বনিতে, যুদ্ধের সিংহরবে স্বর্গ প্রতিধ্বনিত। সেই হুঙ্কার যখন সংসারে অবতীর্ণ হয়, তখন ধার্ম্মিকের দল, মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। তখন পৃথিবীতে ধর্ম্মের সাগর উথলিত হয়, উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। চারিদিকে ব্রহ্মনামের তুরী ভেরী বাজিয়া উঠে। যুদ্ধের হুঙ্কারে সমর ঘোটকসকল যুদ্ধক্ষেত্রের একদিক হইতে অন্যদিকে ধাবিত হয় এবং রণবাদ্যে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কে বলে, স্বর্গীয়েরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া যুদ্ধ করেন না? তাঁহাদিগের দৃষ্টি শান্ত, বাক্য শান্ত, ব্যবহার কোমল;

কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র এমনি অগ্নিময় দৃষ্টান্ত, এমনি শাণিত অস্ত্র, জীবন এমনি তেজঃপুঞ্জ যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া চারিদিকের লোক মাতিয়া উঠে। স্বর্গের যুদ্ধ পৃথিবীতে আরম্ভ হইলে আর কি রক্ষা আছে? যে ব্রাহ্ম যোদ্ধা নয়, সে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাক্। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে চান না। যে ভীরু আপনার ঘরে দ্বার বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় ভোজন করিবে, আর স্ত্রীপুত্রকে চর্ব্বণ করিবে, তাহাদিগের অস্থি মাংস অপবিত্র করিবে, সেই ব্রাহ্মকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ কি করিবে? এই যে চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, অভক্তির মহাপাতক সকল হইতেছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি এ সকল পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না কর, তবে পৃথিবীর কি গতি হইবে? এই যে ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর ভয়ানক ভ্রূকুটি এবং ঘোরতর আক্রমণ, এই যে বিদ্বান্, সভ্য, বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই ধর্ম্মের বিপক্ষ হইল, এ সকল দেখিয়া কি তোমরা রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবে? যাঁহারা এই যুদ্ধে প্রাণদান করিবেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা পুষ্পরথে স্বর্গে চলিয়া যাইবেন। যাঁহারা সত্যের নিশান হাতে লইয়া, ধর্ম্মের নিশান হাতে লইয়া, অনেক জাতিকে জয় করিয়াছেন, অনেক অবিশ্বাসীকে করতলস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য লোক নহেন। স্বর্গের বল ভিন্ন মনুষ্য কি কখনও এ সকল ব্যাপার করিতে পারে? হে ব্রাহ্ম, তোমরাও স্বর্গের বল, পরলোকের বলে বলী হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিবে। পরলোকগতদিগকে যে তোমরা ভাল বাসিয়াছ, তাঁহারা কি তোমাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন? তোমরা যে তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ, প্রাণসখা বলিয়া ভাল বাসিয়াছ, যথা সময়ে তোমরা ইহার ফল পাইবেই পাইবে। তাঁহারা যে নাম কীর্ত্তন করিতেন, তোমরাও সেই নাম গান করিতেছ; তাঁহারা যেমন ধ্যান-মগ্ন হইয়া যোগানন্দরস পান করিতেন, তোমরাও সেইরূপ ধ্যান করিতে আরম্ভ

করিয়াছ; তাঁহারা যেমন বৈরাগ্য-ব্রত, এবং ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ভব-জ্বালা হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত এবং নির্ব্বিকার হইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ; তোমাদের এ সকল চেষ্টা কদাচ নিষ্ফল হইতে পারে না। তোমরা যাঁহাদিগকে এত ভালবাস, তাঁহারা কৃতঘ্ন দুরাত্মা নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমাদের সহায় হইয়া রহিয়াছেন। যখন বাহিরের সকলেই তোমাদের প্রতিকূল, যখন তোমরা ধনহীন হইয়া কত কষ্ট পাও এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবও তোমাদের শত্রু হয়, তখন ঐ পরলোকগত স্বর্গীয়েরা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। যখন ঘোর পরীক্ষার সময় দীনবন্ধু, দীনবন্ধু বলিয়া তোমরা চীৎকার কর, তখন দীনবন্ধু কি তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে পারেন? স্বর্গ কি লৌহ-নির্ম্মিত, স্বর্গ কি পাষণ্ড যে, যাহারা স্বর্গের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি স্বর্গ নির্দ্দয় থাকিবেন? তোমরা কেন মনে করিতেছ, তোমাদের কেহ নাই? ঐ যে স্বর্গের দেবাত্মারা তোমাদিগের বন্ধু, তোমাদিগের পরম সহায়। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তোমরা যত বিন্দু প্রেমাশ্রু এবং ভক্তির অশ্রু নিক্ষেপ করিয়াছ, সে সমুদয় স্বর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে। তাঁহারা স্বর্গে ভ্রাতৃভাবের রাজসভা করিয়া বসিয়া আছেন। সেই রাজসভা হইতে তাঁহারা তোমাদিগকে দেখিলেন, তোমাদের মনের সাধ বুঝিলেন; প্রেমরাজ্য রচনা করিবার জন্য তোমরা জন কত লোক প্রস্তুত, ইহা স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছেন। শত্রুরা আসিয়া বারম্বার ঐ প্রেমরাজ্য ভাঙ্গিতেছে, আর তোমরা উহা গড়িবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ, স্বর্গ ইহা জানিতেছেন। তোমাদের এই তত্ত্ব অধ্যাত্ম তাড়িত যোগে সপ্তস্বর্গ, সহস্র স্বর্গ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পবিত্রাত্মাগণ বলিলেন, সাজ সমরে। পবিত্রাত্মারা পবিত্র নর নারীর মনের ভাব বুঝিলেন। বিশ্বাসের শাস্ত্র হাতে লইয়া,

যুদ্ধ সজ্জা করিয়া স্বর্গ হইতে এক এক জন বীর পুরুষ নামিয়া আসিলেন। কেহ ধৈর্য্য, কেহ ক্ষমা, কেহ প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কেহ অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, কেহ বৈরাগ্যের বিভূতিতে সজ্জিত হইয়া, কেহ ক্ষমার শাস্ত্র বলিতে বলিতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ, তোমাদের উৎসবের অগ্রের রাত্রে আমরা তোমাদের হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতেছি, তোমরা উৎসবের অন্ন আমাদের সঙ্গে বিভাগ করিয়া খাও। আমাদের আনন্দ শান্তি তোমাদের হউক! আমরা তোমাদের দ্বারপাল হইয়া দাঁড়াইলাম। এই দ্বারে অমুক ধর্ম্মবীর, ঐ দ্বারে অমুক ধর্ম্মবীর, তোমাদের প্রহরী হইলেন। যাঁহারা ব্রহ্মতেজে মহাতেজস্বী, সেই আত্মা সকল তোমাদের রক্ষক হইলেন। এক এক জন এক একটি জ্বলন্ত আলোকের ন্যায় শান্তি-খড়্গ হস্তে লইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সকলেরই মুখে সেই নিরাকার পরমপুরুষের মহাজ্যোতি প্রতিভাত, যিনি সেনাপতিদিগের সেনাপতি, যিনি পাপের বিরুদ্ধে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম করিতেছেন। একদিকে ঈশ্বরের সৈন্যগণ, অন্যদিকে অবিশ্বাস, অভক্তি। ঈশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত হয় না, সেখানে প্রেমপাত হয়, এবং শান্তি-নদী বহিয়া যায়। স্বর্গ তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। স্বর্গের মহাত্মাগণ আমাদের সঙ্গে অন্নজল ভাগ করিতে প্রস্তুত। ইহাই স্বর্গরাজ্য, ইহাই ব্রাহ্মপরিবার, ইহাই মনুষ্য-আত্মার সম্মিলন! এই সম্মিলনে মিলিত যাঁহারা, যুদ্ধে জয়ী হন তাঁহারা। এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে বধ করে কাহার সাধ্য? যাহারা তাঁহাদিগকে বধ করিতে আসে তাহারাই পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই দলভুক্ত হইয়া যায়। স্বর্গীয়েরা আমাদের মন্দিরের প্রহরী হইলেন, তবে আমাদের আনন্দের অবধি

নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা উৎসব করিব, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা স্বর্গের অন্নজল ভোগ করিব। জয় ব্রহ্মের জয় হউক! তিনি পাপকে দমন করুন। আমরা তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিয়া জীবনকে ধন্য করি।

একজন আছেন।

(বক্তৃতা)

সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ভাই সকল! আর একজন লোকের দুটী কথা তোমাদিগকে শুনিতে হইবে। আমার ইচ্ছা হয়, রাস্তার লোক যাদের লোকে তুই বলে কথা কয়, যাদের লোকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকে কিছু বলি। যাঁহারা শাল রুমাল গায় দিয়া বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই চক্ষে দেখিব, যে চক্ষে বড় মানুষকে কাঙ্গালের মত দেখায়। যাঁদের মনের ভিতরে দুর্গন্ধ, ভিতরে পাপের নর্দ্দমা, যাঁহারা পরস্ত্রীকে মার মত শুদ্ধ চক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে কাঙ্গাল বলিব না ত কি বলিব? এখন আমি সকলকে কাঙ্গাল দেখি। যাঁহাদের গায়ে ঘেঁস লাগিলে পাপ হয় (ক্ষমা করিতে হইবে, আমিও ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন) তাঁহাদিগকে দুঃখী বলিব না ত কি বলিব? এখন আসল কথা বলি। প্রায় ১৫ বৎসর হইল, একজন বন্ধুর বাড়ীতে যাই, তাঁহার বাড়ী গঙ্গাতীরে। বসিয়া আছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, একটী স্ত্রীলোক কাঁদ্‌ছে, শুনিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটী গঙ্গাতীরের দিকে আসিল। এমনি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে যে, শুনিলে পাষাণও বিগলিত হয়। স্ত্রীটী একটী মরা ছেলে কোলে করিয়া আসিল! যত গঙ্গায় নামিতে লাগিল, তত আরও কাঁদিতে লাগিল, তখনও ছেলে কোলে আছে। ক্রমে কোমর জলে নামিয়া ছেলেটিকে ফেলিয়া দিল, এবং ঢেউ দিতে লাগিল, যত ভেসে

যাইতে লাগিল, সে আরও কাঁদিতে লাগিল। সেই ছেলেকে গঙ্গাজলে দূর করিয়া দিতেছে, আর কাঁদিতেছে। তখন এই মনে আসিল, এই যে ছেলেটি মার কোল থেকে গঙ্গায় ভাসিল, আর কি কাহারও বুক নাই যেখানে এ আশ্রয় পাইবে ? এই ভাবিতে ভাবিতে মন কেমন হইয়া আসিল, চারিদিক ভরাট হইল, আলোকিত হইল ; দেখিলাম, যিনি সকলকে খুব ভাল বাসেন, তিনিই ছেলেটিকে বুকে নিলেন। তার পর মনে হল, সংসার এই রকম। এমন মা, তিনিও যাই ছেলের নিঃশ্বাস বন্ধ হইল, আর ছেলেকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। হা ! সংসার ! তুমি এমনি। আমা-দিগকেও ত এমনি করিয়া একদিন ভাসাইয়া দিবে। আমার দুচারি জন লোক আছে, যাহারা কাঁদিবে, কাঁদিবে আর ভাসাইয়া দিবে। দুই তিন দিন কাঁদিবে, পরে ভুলিয়া যাইবে। একথা মনে হইলে, প্রাণ কেমন করে। এই ভাবিতে ভাবিতে, কে যেন বলিল, তোর মা ভাই বোন ভুলিবে, স্ত্রী ভুলিবে, কিন্তু একজন ভুলিবে না, সে কেবল আমি। তার পর থেকে যখনি গরিব লোকেরা ছেঁড়া মাদুর ঢেকে কাহাকেও লইয়া যায়, ঐ কথা মনে হয়, না হয় আমাকে ভাল বিছানাই দিলে, তবু ত এইরূপ করিয়া লইয়া যাইবে। একজন আছেন, বন্ধুরা বলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, যাঁকে মনে হইলে চক্ষের জল রাখিতে পারি না। কেহ বলে তাঁহাকে ভগবান্, কেহ বলে তাঁহাকে হরি, কেহ বলে তাঁহাকে মা দুর্গা, আমি কিছু বলি না, আমি বলি একজন আছেন। ভয়ানক রাত্রিতে মরিবার ভাবনা ভাবিলে, যেরূপ ভয় গাম্ভীর্য্যে চারিদিক পূর্ণ হয়, সেইরূপ দেখিতে হয় ; কি বলে বলিতে হয় আমি জানি না, ঐ যেন কে, ঐ যেন সেই মূর্ত্তি। যখন অসময়ে সকলে ভুলিবে, ধনী গরিবের যখন একদশা হবে, তখন আর কেহ থাকিবে না, কেবল তিনি থাকিবেন, যিনি বলিয়াছেন,

"কেবল আমি থাকিব।" ভাই দেখ, মরিবার ভয় বড় ভয়। আবার মরণই সব নয়, মরিবার পূর্ব্বে যদি আপনার সন্তান মরে, স্ত্রী মরে, তাহা হইলে দশা হইবে কি? লোকে অপমান করিল, আফিসে মনিব লাথি মারিল, সে কথা কাকে বলি? বিধবা মা আছেন যদি তাঁরে হারাই। এই যে ভক্তিনদীর কথা শুনিলাম, আমার ত ভক্তি নাই, আমি আর এক রকম দেখিয়াছি, তার এপার ওপার নাই। সে নদীর ওপারে কিপ্রকারে যাইব, তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বল। রসো রসো দাঁড়াও! আর একজন বলিয়াছিলেন, তোদের কড়ি নাই। তোরা আয়, ভব নদীর পারে যাবি ত আয়! এমন দুচারি জন লোক আছেন যাঁহারা পারে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মন রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম মার মতন অথবা মাঝির মতন। তাঁরা মরেছেন বল্লে কে? তাঁরা যেখানে আছেন, সেখানে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্ম আছেন। যখন মা আর বাছা বলে না, ছেলে বাবা বলে না, হে ধর্ম্ম, তুমি আমার নিকটে এস, শুনেছি যে, তুমি যে অস্ত্রীক তাকে স্ত্রীর মত যত্ন কর, যার মা নাই, তাহাকে মার স্নেহ দেখাও। যেখানে চৈতন্য আছেন, ঈশা আছেন, নারদ আছেন, সকল ঋষিরা আছেন, সেখানে আমাকে লইয়া যাও। ধর্ম্ম, তুমিই ঈশ্বর, তুমিই ইহকাল, পরকাল। হে ধর্ম্ম, যাহার কেহ নাই তুমি তাহার সর্ব্বস্ব। হে ধর্ম্ম, হে বাপ, হে মা! যাহাদের কেহ নাই, যাহারা কাঙ্গাল, তাহাদিগকে আশ্রয় দাও। সকলে টাকা টাকা বলিয়া খাটিয়া মরিল, তোমায় চিনিল না। তুমি ভবসাগরের কূলে, তুমি ভক্তিসাগরের কূলে, তুমি সকলকে উদ্ধার কর।

মধ্যবর্ত্তী।

(ভাদ্রোৎসবে বক্তৃতা)

রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৮০১ শক ;
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

জীবাত্মা আর ব্রহ্ম এই দুয়ের কি মিলন হয়? এবং এই দুয়ের মিলনের পক্ষে কি মধ্যে কাহাকেও আবশ্যক হয়? ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কি মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন? না কোন মধ্যবর্ত্তী ব্যতীত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করা যায়? মধ্যবর্ত্তী লইয়া পৃথিবীতে মহাকোলাহল উপস্থিত। পৃথিবীতে যে সভ্যতম ধর্ম্মের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষমতা অদ্যাবধি অল্প, সেই ধর্ম্ম মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন স্বীকার করে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মধ্যবর্ত্তী মতের প্রতিবাদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে জানা যায়, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার হস্ত হইতে জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম লাভ করা যায়। এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কার্য্য। কিন্তু তাহা বলিয়া কি মানুষ একবারে পূর্ণব্রহ্মকে জানে? যাঁহাকে জানিবার জন্য কত শত সাধু নানা প্রকার যোগ তপস্যা করিলেন। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" যাঁহার সম্পর্কে প্রাচীন উপনিষৎ এই কথা বলিতেছেন, আমাদের ন্যায় সামান্য লোক এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কিরূপে তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব জানিবে? সমুদয় বিষয়েই সাধন আবশ্যক। যেমন অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখিতে হয়, তেমনি ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখিতে হয়। অন্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন উপযুক্ত পরিশ্রম এবং শক্তি চালনা প্রয়োজন, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত সাধন আবশ্যক।

যদিও ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দৃশ্যমান্ জগৎকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। ঈশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান। একদিকে তিনি প্রতিজনের অন্তরতম, গূঢ়তম স্থানে বাস করিতেছেন, কাহারও সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ব্যবধান নাই, অন্যদিকে তিনি বহুদূরে। তাঁহার এবং জীবাত্মার মধ্যে এই প্রকাণ্ড সংসার মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সম্মুখে এই প্রকাণ্ড পৃথিবী, প্রকাণ্ড চন্দ্র সূর্য্য, প্রকাণ্ড পর্ব্বত সাগর ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর রহিয়াছে। এই বিশ্বের প্রান্তভাগে কে? এই বিশ্ববস্ত্রে কাহার মুখ লুক্কায়িত? এই সৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়াইয়া কে? সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বস্রষ্টা এই সৃষ্টিরূপ বস্ত্রদ্বারা আপনার মুখ ঢাকিয়াছেন। তিনি এই আশা করিয়া আবরণ মধ্যে রহিয়াছেন যে, তাঁহার সন্তান এই আবরণ তুলিয়া জননীকে দেখিবে। মিসর দেশে এক দেবতা চির অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকিত। মিসর দেশের ধর্ম্মে অনেক গূঢ় অর্থ ছিল। সৃষ্টিপতি, সংসারের স্বামী সৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন। এই যে সূর্য্যের আলোক আসিতেছে, ইহা কি একেবারে আসিতেছে? না! ইহা প্রকাণ্ড বায়ু রাশির ভিতর দিয়া আসিতেছে। যদি এই বায়ুরাশি না থাকিত, তবে কে জানে সূর্য্যের উত্তাপে হয়ত সকলে মরিয়াই যাইত। তেমনি ঈশ্বরের জ্যোতি সৃষ্টির মধ্য দিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তীর লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা মধ্যবর্ত্তীর নিকট প্রার্থনা করে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যের প্রার্থনা বন্দনা গ্রহণ করে না। ঊষা, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত বন্দনীয় নহে। বরং ইহারা আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। নির্ম্মল পূর্ণ চন্দ্র দেখিলে কে না ঈশ্বরকে স্মরণ করে? চন্দ্র ত বলে না, হে ব্রাহ্ম, তুমি আমাকে পূজা কর। চন্দ্র কাহার আনন্দিত হাস্য প্রকাশ করে? চন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে

প্রেমচন্দ্রকে দেখা যায়। পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে, মন সেই এক পুরাতন পুরুষ সত্য-হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হয়। গভীর অতলস্পর্শ বিশাল সমুদ্র দেখিলে সেই অনন্তকে মনে হয়। এই সকল মধ্যবর্ত্তী কেহই পূজা চাহে না। এই পৃথিবী ঈশ্বর এবং আমাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া উৎকৃষ্ট আচার্য্যের কার্য্য করিতেছে। আমাদিগের পুরাতন আর্য্য পিতৃবংশ এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতেন। ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্যবধান বিনাশ করিবার জন্য এই জগৎ মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে। পূর্ব্বতন যোগী, ঋষি, মুনিগণ নদীতটে অথবা পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিয়া, যোগ ধ্যান এবং তপস্যাদি করিতেন। কেবল যে মিথ্যা কবিত্বের জন্য তাঁহারা প্রকৃতিকে এত ভালবাসিতেন তাহা নহে, কিন্তু এ সকল প্রকৃত ব্যাপার পুরাতন ঈশ্বরের সাক্ষী। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া প্রকৃত ঈশ্বরকে কে জানিতে পারে? প্রকৃতি স্বচ্ছ মধ্যবর্ত্তী। জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান নাই। কিন্তু প্রকৃতি মূক, প্রকৃতি কথা বলিয়া ঈশ্বরের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সাক্ষ্য দিতে পারে না। জড় স্বভাব নিস্তব্ধ। কিন্তু মানবজাতির মধ্যে এক প্রকাণ্ড পুরোহিত-বংশ ঈশ্বরের স্পষ্টতর সাক্ষী। সেই বংশের আচার্য্য-দিগের অসাধারণ ধৈর্য্য, বীর্য্য, পবিত্রতা, শান্তি স্তরে স্তরে পড়িয়া আছে। তাঁহাদের জীবন প্রথম শতাব্দী হইতে এ পর্য্যন্ত, আত্মার গম্ভীর স্বরে আত্মশুদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতেছে। সে সকল মহাত্মারা নানা দেশ হইতে নানা শাস্ত্র লইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এখনও নারদের বীণা, দাউদের গাথা, মুসার শব্দ, ব্যাস, পরাশরের উপদেশ, আমাদিগের ধর্ম্মভাব উদ্বোধন করিতেছে। তাঁহারা মৃত অথচ মৃত হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মে সত্য সকল অবিনশ্বর। সেই অগ্রজদিগের পদচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বলেন না, আমাকে

পূজা দাও; তাঁহারা সকলে ঈশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে একেবারে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। কেবল প্রকৃতি এবং পরলোকগত মহাত্মারাই যে, ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহা নহে, জাতীয় নানা জীবিত ধর্ম্মাত্মা এবং শুদ্ধচেতাগণও আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটতর করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় ইহঁারাও পূজা চাহেন না, ইহঁারা পূজা চাওয়া পাপ মনে করেন। লক্ষ্য তাঁহারা নহেন, গম্য স্থান তাঁহারা নহেন। ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে রেখা মাত্র ব্যবধান নাই। ব্রাহ্ম ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটে বসিয়া ব্রহ্মপূজা করিতেছেন। জীবিত মৃত জ্যেষ্ঠ আচার্য্য সকল চারিদিকে, মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিশ্বপতি প্রত্যক্ষভাবে সকলকে শান্তি পুণ্য বিধান করিতেছেন।

প্রার্থনা।

(মাঘোৎসব)

সায়ংকাল, বুধবার, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক ;
১৪ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে জ্যোতির্ম্ময়, নূতন বিধির সংবাদ আসিল। স্বর্গের বায়ু পাপভারাক্রান্ত ধরাতলে নামিল। জয় দয়াময়, তোমারই জয়, জয় উৎসবময়! জয় আনন্দময় ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের জয়! আমরা সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি আশীর্ব্বাদ কর। রক্তের সঙ্গে মিলিত হও, শব্দকে অগ্নিময় কর, বিশ্বাসকে সতেজ কর। পাপাত্মা হইয়াও তোমার কৃপাতে উৎসব ভোগকরি। অনেক আমাদের পাপ, তোমার চক্ষুর অগ্নিতে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তোমার শব্দ গর্জ্জিত হইতেছে, তোমার বিক্রম ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। যুগে যুগে তোমার নামে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, এখনও সে সকল ব্যাপার হইতেছে। তোমার স্পর্শ, তোমার প্রত্যাদেশ, তোমার শুভাগমনে আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তোমার নিঃশ্বাস-বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের প্রচারকদিগের, সঙ্গীত প্রচারকের এবং আচার্য্যের আত্মাতে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হও এবং আমার ন্যায় পাপীদিগের কল্যাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আসিয়াছ, তোমার আজ্ঞা হইয়াছে যে, আমরা উৎসব করি। জয় উৎসবের রাজা!

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

বৃহস্পতিবার, ২রা মাঘ, ১৮০১ শক;

১৫ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্ম যেমন এক, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি এক। পরমাণুবাদ প্রভৃতি দ্বারা বিজ্ঞান নানা ভ্রম সমুপস্থিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, ভাবোৎপাদন, এবং বিশ্বাস এই তিন মনুষ্যে প্রধান। বিশ্বাস সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমরা সর্ব্বত্র শক্তি অনুভব করি, এই শক্তির বিদ্যমানতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, যত শক্তি আছে তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি সর্ব্ব প্রধান। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তি আমরা অবলোকন করিয়া থাকি, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যার মূল।

শক্তিচক্র।

(ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বক্তৃতা)

শনিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০২ শক ;

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বসৃষ্টি একখানি দুইচক্রযুক্ত রথস্বরূপ। এই চক্রদ্বয়কে যদি চিন্তাপটে চিত্রিত করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টির গতি ও গূঢ়তত্ত্ব অনুভূত হয়। প্রথম চক্রের মধ্যে সমুদয় প্রকার নৈসর্গিক জড়শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, তাপ, তাড়িত, রসায়নশক্তি, জীবনীশক্তি, এই সমস্তকে সমষ্টি করিয়া উক্ত রথ চক্রটি রচিত হইয়াছে ; অর্থাৎ জড় জগতের তাবৎ ঘটনা, কার্য্য কারণ নিয়ম শৃঙ্খলা, জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি বিকৃতি, হ্রাস বৃদ্ধির ভিতরে যে সকল শক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই গুলিকে একত্র করিয়া একটি প্রকাণ্ড চক্ররূপে বর্ণনা করা হইতেছে। এই শক্তিচক্রকে কি পৃথিবী অতিক্রম করিতে পারে ? এই শক্তির সাহায্য না লইয়া কি কোন পদার্থের সৃষ্টি, কোন জীবের জীবন সম্ভব হয় ? সংসারে এমন কোন বস্তু কি দেখা যায়, যাহার মধ্যে এই সকল শক্তির কোন না কোনটী নিয়ত কার্য্য করিতেছে না ? বিশ্বসৃষ্টি বিচিত্র শক্তিময়। শক্তিচক্রকে অবলম্বন করিয়া সংসার ক্রমাগত কাল-ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। এই শক্তি কি বিস্ময়কর ! সমুদয় পদার্থের আরম্ভ এবং নাশ আছে। শক্তির আদি অন্ত কোথায় ? কত কত জাতি সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিল, অভিনয় শেষ করিয়া কিছু কালের মধ্যেই বুদ্বুদের ন্যায় অদৃষ্ট সাগরে মিশাইয়া গেল। কত পর্ব্বত সমভূমি হইল, কত সাগর শুষ্ক হইল, কত কত দ্বীপ সাগর মধ্যে মগ্ন

হইল, কত কত মরুভূমি নগর হইল, নগর উজাড় হইল, ভূমি বিদীর্ণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইল, ভীষণাকার জীবজাতি ধ্বংস হইল, তাহাদিগের প্রকাণ্ড কঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হইল, কত প্রকার নূতন জীবজন্তু সৃষ্ট হইল; কিন্তু সেই পরমাশ্চর্য্য শক্তিচক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। সকলই অস্থায়ী, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সমুদয়ই জন্ম মৃত্যুর অধীন, কেবল এই শক্তিচক্র নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অজাত, অক্ষয়। ইহার উপর যুগের অধিকার নাই, শতাব্দীর অধিকার নাই, ঘটনার অধিকার নাই; সকলের উপর ইহার অধিকার! শোভা, সৌন্দর্য্য, সুমিলন, সামঞ্জস্য, সঙ্গীত, সুমিষ্টতা, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, লতা, কুসুম, বিহঙ্গ, মেঘ, বায়ু, ঋতু-পর্য্যায়, সুখ, দুঃখ, বৈধব্য, বিবাহ, সমুদয়ই এই শক্তিচক্রে ঘুরিতেছে; হইতেছে, যাইতেছে, শক্তির শাসন স্বীকার করিতেছে।

এই শক্তি কি, কাহার, কিসের মধ্যে স্থিতি করে? আধার না থাকিলে কি শক্তি থাকিতে পারে? জড় সৃষ্টিকে শাসন ও চালনা করিতেছে যে শক্তি, সুতরাং যাহা সৃষ্টির অতীত, তাহার আধার কে? এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় চক্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, ভাব, চরিত্র, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি যে এক জাতীয় নৈসর্গিক শক্তি, যদ্দ্বারা মহাব্যাপার সকল সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই সকলেরই নাম মানসিক শক্তি এবং ইহার সমষ্টি লইয়াই দ্বিতীয় চক্র রচিত হইয়াছে। জ্ঞান শক্তির নিকট সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হয়। সিংহ শার্দ্দূল হস্তী প্রভৃতি প্রবল জীব জ্ঞান-শক্তির দাস। এই শক্তির প্রভাবে আকাশ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাটিত হইয়া মানবসমাজের সেবা করে, এই বুদ্ধি শক্তি অগ্নি হইতে ধূমকে পৃথক্ করিয়া মনুষ্যের গতি এবং উপার্জ্জন বৃদ্ধি করে। ইহা

সাগরকে কর্ষণ করে, গ্রহতারাদিগকে গণনা করে, পৃথিবীতে স্বীয় রাজ্য সংস্থাপন করে। জড় শক্তি ইহার হস্তে যন্ত্রমাত্র, সেবকমাত্র। জড় শক্তি ইহার অধীনতা স্বীকার করে। শক্তিই বা কি আশ্চর্য্য! ইহাতে সমস্ত জীব জগৎ একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। জড়ের পক্ষে যোগাকর্ষণ যাহা, জীবের পক্ষে প্রেমাকর্ষণ তাহা। ইহার শক্তিতেই সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধে দাম্পত্য, পিতৃভক্তি, সন্তান-বাৎসল্য, বন্ধুতা, পরোপকার প্রভৃতি সমুৎপন্ন ও সংরচিত হয়। স্নেহের শক্তি জড়ের বাধাকে অগ্রাহ্য করে; দেশকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করে। হৃদয়ের পরাক্রম অজেয়। ইচ্ছার এবং চরিত্রের পরাক্রমও সেইরূপ। যে ক্ষমতা এবং বীরত্ব রাজাদিগের হস্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, যে শাসনশক্তি যোদ্ধাদিগের নাই, সেই বীরত্ব ও সেই প্রতাপ সুচরিত্র ব্যক্তির হস্তে অবস্থিতি করে। অতএব এই দ্বিতীয় শক্তিচক্রের প্রভাব জড়শক্তি অপেক্ষা অধিক বই আর ন্যূন নহে। কবিগণ কবিতা সমাপ্ত করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানক্ষেত্রকে আবিষ্কার করিয়া সংসার হইতে প্রস্থান করিলেন, পরোপকারী ধার্ম্মিকগণ সুনীতি এবং সুচরিত্রতা প্রদর্শন করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আত্মনিহিত শক্তি জগতে রহিয়া গেল।

জ্ঞানীদিগের জন্ম হয় ও মৃত্যু হয়, মহাত্মাদিগের আবির্ভাব হয় ও তিরোভাব হয়, মানবীয় মহত্ত্বের হ্রাস হয় ও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সংসারে জ্ঞান, প্রেম, ভাব ও বিবেকশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি, নীতিশক্তি, বিধিব্যবস্থা, বিদ্যা, হিতৈষণা ধর্ম্ম, ইহারা নিত্য, অক্ষয় ও সর্ব্বকালব্যাপী। এই শক্তিসকল চক্রাকারে ক্রমাগত ঘুরিতেছে। জড়ময়ী শক্তিচক্র ও চিন্ময়ী শক্তিচক্র, এই চক্রদ্বয়ের উপরে বিশ্বসংসার আরোহণ করিয়া

কাল ও আকাশ সাগরকে পরিক্রমণ করিতেছে। যদি জড়ের অতীত জড়শক্তি হইল, তবে মনুষ্যের অতীত কি মানসিক শক্তি নহে? সকল লোকেই স্বীকার করিবে যে, মানুষের দেহ মনের বহির্ভূত কোন একটী প্রবল ভয়ঙ্কর শক্তি মানবজীবনকে চালিত করিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে অদৃষ্টশক্তি বলে, কেহ বা ইহাকে দৈবশক্তি বলে, কেহ বা নৈসর্গিক শক্তি বলে। ইহার নিকট মানুষের দেহ মন উভয়েই পরাস্ত। এই শক্তির উপর প্রতিজনের নির্ভর করিতে হয়, সকলের সুখ দুঃখ ইহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। তবে এই মনোনীত মানসিক শক্তি কি? ইহা কোন্ আধারে কাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে? যে দুইটি শক্তিচক্রের কথা উল্লেখ করা গেল, ইহারা কি বাস্তবিক পৃথক্? শক্তি কাহাকে বলে? যাহার প্রভাবে কোন কার্য্য হয় তাহাকে শক্তি বলা যায়। শক্তি এক প্রকার, তাহার প্রকাশ সহস্র প্রকার। এক অগ্নির দাহিকাশক্তি অসংখ্য প্রকারে সংসারে কার্য্য করিতেছে। ইহাতে শরীর উষ্ণ থাকে, রক্ত পরিষ্কার হয়, পরিপাককার্য্য চলে, সূর্য্য উত্তাপ দেয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে। এক বুদ্ধিশক্তি দ্বারা জগতে অগণ্য প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। শক্তি বহুপ্রকার নহে, এক প্রকার, বহু প্রকার উপকরণ সংযোগে ইহা বহুরূপ ধারণ করে। সমুদয় পদার্থবিদ্যা জড়শক্তিকে একীভূত করিতেছে; এবং যখন মনুষ্যের মন এই একীভূত জড়শক্তির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে চেষ্টা করে, তখন দেখে জড়ের মধ্যে জ্ঞান, প্রাণশূন্য প্রকৃতির মধ্যে শোভা, সৌন্দর্য্য, সম্মিলন, প্রেম, বিধি, নিয়ম, শৃঙ্খলা ও মঙ্গলভাব। মন নিজের লক্ষণ সমস্ত জড়সৃষ্টির মধ্যে দেখিয়া স্তব্ধ হয়। জড়ীয় নৈসর্গিক শক্তি এক প্রকাণ্ড, চিন্ময়ী শক্তিতে পরিণত হয়। বহির্জগতের কৌশল কৌশলী মানবচিত্তের নিকট স্বীয় পরিচয় দেয়। সৃষ্টির

বিশাল বিচিত্র প্রেম, মানবের কোমল হৃদয়ের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। বাহিরের শোভা, ভিতরের শোভা এক হইয়া যায়। সৃষ্টির নিয়ম বিবেক-স্থিত ধর্ম্মনিয়মে পরিণত হয়। মনুষ্য নিজের প্রকৃতির ভিতর যে অদ্ভুত শক্তির হস্তাক্ষর দেখে, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ললাটে সেই শক্তিরই হস্তাক্ষর দেখে, মনুষ্যাত্মা তাবৎ জড়প্রকৃতিকে ভগ্নী সম্বন্ধে সম্বোধন করে; পর্ব্বত, নদী, উদ্যান, আকাশকে আত্মীয়রূপে চিনিতে পারে ও ইহাদের সকলের সঙ্গে কথোপকথন করে, সকলের পদতলে বসিয়া জ্ঞান ও প্রীতিতে ধর্ম্ম-শিক্ষা করে। এক অপার শক্তি প্রসারিত হইয়া, জড় চৈতন্য সকলকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন এবং সকলের ধাত্রী ও মাতৃস্বরূপে পূজিত হয়েন। সমুদয় সৃষ্টি এই অসীম, অপার, নিরাকার, চিন্ময়ী শক্তির ক্রোড়ে আরো-হণ করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করিতেছে। শক্তিচক্র আর কিছুই নহে, কেবল ঈশ্বরের ক্রোড়চক্র।

শব্দ-মাহাত্ম্য।

(মাঘোৎসব)

রবিবার ১০ই মাঘ, ১৮০৩ শক ;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

জর্ম্মনী দেশে রাইন নদীতীরে লোর্লিনামে এক বিচিত্র স্থান আছে, এই স্থান পর্ব্বতময় নদীকূল। সেই সকল পর্ব্বতের এক বিশেষ গুণ এই, কেহ যদি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে এতদূর পর্য্যন্ত যায়, যেন প্রতিধ্বনিরূপ সাগরে মিশিয়া পড়ে। এই ব্যাপার দেখিলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। শব্দ এবং প্রতিশব্দ, ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। হে ব্রাহ্ম, এ বিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছ? আওয়াজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, মনে কি ইহা লাগিয়াছে? সর্ব্বদা পৃথিবী নানাবিধ শব্দে পরিপূর্ণ; কয়জন লোক স্থির হইয়া শব্দতত্ত্ব আলোচনা করে? আওয়াজের বিষয় বলা এবং ভাবা কার অধিকার? সাহিত্যের, না বিজ্ঞানের? না ধর্ম্মের? আমি বিবেচনা করি, শব্দের গভীর তত্ত্ব বিজ্ঞানের অতীত; ধর্ম্মের অধিকৃত। শব্দকে সঙ্কোচ করা, শব্দ দ্বারা দিক্ বিদিক্ কম্পিত করা, শব্দে শাস্ত্র সংগঠন করা, বিদ্যা উৎপন্ন করা, এ সমুদয় ধর্ম্মের ব্যবসায়। শব্দ কি, শব্দ কত বড় হইতে পারে, কত ছোট হইতে পারে, এ সকল অতি অদ্ভুত আলোচনা। শব্দকে বৃদ্ধি করিতে করিতে, এমন ভয়ঙ্কর করা যায় যে, মনুষ্যের কর্ণ তাহা সহিতে পারে না। এক বজ্রের শব্দ শুনিলে লোকে কর্ণে হস্তার্পণ করে। কে না মনে ভাবিতে পারে, এই বজ্রের শব্দ শত গুণ হইতে পারে। এক বজ্রের শব্দ শত বজ্রের শব্দ

হইতে পারে। সেই ভয়ানক শব্দ সহিতে পারে, এমন শ্রবণপুট কাহার আছে? এই শব্দকে যদি সঙ্কোচ কর, যদি ছোট হইতে এত ছোট হইয়া যায় যে, নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ না হয়, তাহা হইলে মানুষের শ্রবণ সূক্ষ্ম-তম শব্দের সঙ্গে আর নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ করিতে পারে না। শব্দের অর্থ কি? যদি বল 'ক' তাহার মানে কি? কিছুই না। যদি 'ক'এ আকার দাও কি বুঝায়? কিছুই না। যদি আর একটি অক্ষর পাত কর, কি হয়? কিছুই না। কিন্তু শব্দ হইবামাত্র, একটী শব্দ বলিবামাত্র মনে একটী ভাবের উদয় হয়। শব্দের অর্থ ভাব, অর্থাৎ একটী শব্দ বলিবামাত্র স্বাভাবিক নিয়মে একটী ভাবের উদয় হয়। যদি বলি 'আত্মা কি পরমাত্মা', তাহা হইলে ভাবযোগে হৃদয়ের মধ্যে একটী বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। যদি বল উহা হইতে পারে, কেন না আত্মা, পরমাত্মা, প্রভৃতি শব্দের মানে আছে। তাহা হইলে বীণার আওয়াজ মনে কর। নদীর বক্ষে যখন বায়ু বহে, সেই বায়ুদ্বারা বাঁশির শব্দ যখন কর্ণকুহরে আসিয়া স্পর্শ করে, তখন কি অদ্ভুত ভাবের সমাগম হয়। যখন কোন আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করে, কাহারও হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিত হয়, কাহারও হৃদয়ে আহ্লাদের সমাগম হয়, কাহারও হৃদয়ে বা অপর কোন ভাব হয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শব্দের কোন অর্থ নাই, অথচ শ্রুত হইবামাত্র হৃদয়ে বিচিত্র ভাব উৎপাদন করে, শুনিবামাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। এই জন্যই বীণাবংশীর আদর, এই জন্যই সঙ্গীতের উৎপত্তি, এই জন্যই বেদ পাঠ। ইহারই জন্য বিবিধপ্রকার শব্দ-শাস্ত্র আসিয়াছে। যদি মূলে অবতীর্ণ হও, দেখিবে আদি শব্দ কি ছিল। প্রথম শব্দ কে উচ্চারণ করিল? প্রথমে যে আওয়াজ হইল, সে কি আওয়াজ? বেদে বলে, আদি শব্দ ওঁকার। এই যে ওঙ্কাররূপ বিচিত্র চিহ্ন, ইহার ভিতর সমুদয় ধর্ম্ম-

শাস্ত্র, সমুদয় তত্ত্ব নিহিত। কথিত আছে, ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহাদের শুভ্রকেশ স্বর্বর্ণে মণ্ডিত হইয়া গেল ; মুখ হইতে স্বর্ণরাশি বহির্গত হইতে লাগিল। যেমন আমাদের দেশে শব্দের মাহাত্ম্য এইরূপ কত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য দেশে, খ্রীষ্টানদিগের দেশে, গ্রীস দেশে,আফ্রিকার মিসর দেশেও শব্দের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। শব্দের চিন্তাতে মহা মহা পণ্ডিতগণ ধার্ম্মিকগণ মগ্ন ছিলেন। আমাদেরও উচিত হইয়াছে এ বিষয়টী কি, উপলব্ধি করিব। যদি পারি, আমরা শব্দের উপর আমাদের ধর্ম্মকে স্থাপন করিব। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম ঈশ্বরের শব্দ। কোরাণ কি? শব্দ। গুরুনানকও অনাহত শব্দের কথা লিখিয়া যান। বাস্তবিক শব্দ বিনা ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। যতক্ষণ না শব্দ ঈশ্বরের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়, যতক্ষণ না সেই বিস্তৃত পরমাত্মা, সেই আকাশব্যাপী ব্রহ্ম, সেই সর্ব্বঘটে বিরাজমান লাবণ্যময়ী শক্তি, সঙ্কুচিত হইয়া, গাঢ় হইয়া শব্দায়মান হয়, ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ হয় না, ধর্ম্মের গভীরতা বোধ হয় না। সেই জন্য ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী লোক সর্ব্বদা শব্দের অনুসরণ করেন। শিখ বলে, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের নাম শব্দ। ভজন নয়, শাস্ত্র নয়, সংগীত নয়, শব্দ। শব্দ কেন নাম হইল? সেই সকল ছন্দে বন্দে, সেই সকল শব্দে, সেই সকল ভাবে, ঈশ্বরের মহিমা এমনই প্রকাশিত যে, শ্রবণমাত্রই শ্রোতার ধর্ম্মবোধ, ব্রহ্মবোধ হয়। অতএব যাহা কিছু ধর্ম্ম ও সত্য, যাহা ঈশ্বরের গুণ ও প্রকৃতি, সমুদয়ই শব্দায়মান হয়। কেন হয়? না শুনিলে ত বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়? কর্ণে শ্রবণে। বিশ্বাসী সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, শব্দ শ্রবণে বিশ্বাস হয়। অতএব হে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ! শ্রবণের উপর যে ঘৃণা করে না, যে শ্রুতিধর, যে শব্দরূপ বর্ণকে ধরিয়া রাখে,

তাহারই ধর্ম্মে অধিকার হয়। অন্য শুনিয়াছ, যেমন বক্তার আবশ্যক, তেমনি শ্রোতারও আবশ্যক ; আমি বলি, শ্রোতার বরং অধিক আবশ্যক। আকাশ হইতে জল পড়িয়া যদি অরণ্যে বা মরুভূমিতে যায়, তাহা হইলে কি ফল জন্মে ? অতএব এই যে শব্দরূপ শ্রাবণ মাসের জলধারা, যাহা শাস্ত্রে, আচার্য্যের কথাতে, পরিব্রাজকের জিহ্বাতে, ইহাকে ধারণ করে কে ? শ্রোতার শ্রবণরূপ সরোবরে যখন এই জল পড়ে, তখনই ধর্ম্মের উদ্যানে ফল হয়, ফুল হয়, ঐশ্বর্য্য হয়। বক্তৃতা করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু শ্রবণ করিয়া কথার ভাবরস পান করা সকলের হয় না। মুনিদিগের মান অধিক, চিরকালই আছে। মুনি ত কথা কহেন না ? ধর্ম্ম তাঁহার কোথায় ? তিনি ক্রমাগত বসিয়া শব্দসিন্ধু পান করেন, শব্দ রোমন্থন করেন, চর্ব্বণ করেন। মৃগ কি গো যেমন আহার করিয়া, চর্ব্বণ করিয়া রক্তমাংসাদি লাভ করে, ধর্ম্মের মেষ যিনি, তিনি নানা শাস্ত্র, নানা আচার্য্য হইতে ফুল, ফল, পল্লব সংগ্রহ করিয়া মুনি হইয়া রোমন্থন করেন। দেখিয়াছ ত, মৃগ কি গো যখন চর্ব্বণ করে, তখন অন্য দিকে তাকায় না ; স্থির হইয়া চর্ব্বণ করে। যিনি আহূত শ্রোতা, মনোনীত শ্রোতা, "কেন না জানিও শ্রোতাও প্রেরিত আছে" তিনি শব্দ লইয়া সেইরূপ মত্ত হন। বীণা বংশী বাজিতেছে, তুরী ভেরী শব্দ নিনাদিত হইতেছে, পক্ষিকণ্ঠ হইতে আওয়াজ হইতেছে, তিনি এই সমস্ত লইয়া চর্ব্বণ করিয়া রক্তমাংস স্বাস্থ্যে পরিণত করেন। আমিও একজন সকলের মত শ্রোতা। শুনিবার শাস্ত্রে আমার অধিক সম্মান। যখন শুনিতে হইবে, হৃদয়কে সরোবর করিয়া শব্দের জল ইহাতে ধরিতে হইবে। শব্দ আসিবে কোথা হইতে ? ঈশ্বরের কি মুখ আছে ? নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের কি মুখ কল্পনা করিতে পারি ? যদি মুখ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ হয় কিরূপে ? 'ওরে

রসনা! হরিনাম বল্,’ এইরূপে রসনার উপর সম্বোধন সতত শুনি। কেননা এই যে রসনা, ইহা রসকে আস্বাদন করে। ইহা হইতে যখন পুণ্যরস উদ্ভূত হয়, তখনই ইহা রসপ্রসূ রসনা। সকল রসের মূল কোথায়? মিষ্ট রস বল, সাহিত্যরস বল, নীতিরস বল, ধর্ম্মরস বল, সমুদয় রসের মূল কোথায়? শাস্ত্রে বলে, “রসো বৈ সঃ”—ঈশ্বর যিনি, তিনি রসস্বরূপ, তৃপ্তি-স্বরূপ। যেমন তিনি সত্য-স্বরূপ, তেমনই তিনি রসস্বরূপ। হাস্যরস, কবিত্ব-রস, বিজ্ঞান-রস, ধর্ম্ম-রস, সমুদয় রসের আস্বাদন মিলিত হইয়া তাঁহার নামকে সুমিষ্ট করে। দয়াল নাম মধুর নাম। মধু হইল কোথা হইতে? গোলাপ-রস, পদ্ম-রস প্রভৃতি সমুদয় রস মধুকে রচনা করে। আমরা যদি পাঁচ সহস্র বৎসর গোলাপ চর্ব্বণ করি, মধুবর্ষণ হয় না, কিন্তু মক্ষিকা দশটী ফুল হইতে কত মধু সঞ্চয় করে। নানা প্রকার ফুলের কথা আজ শুনিয়াছি। শান্তি-চম্পক, ভক্তি-পদ্ম আছে, নানা প্রকার ভাবের দ্বারা উপাসকের হৃদয় পূর্ণ হয়। সমুদয় ভাব ঈশ্বর হইতে একত্রিত হইয়া সাধু-হৃদয়ে চিত্রিত হয়। শান্তি-পীযূষ, কবিত্বের মধু, ভক্তের গভীর সুখ সমুদয় একত্রিত হইয়া রস-স্বরূপ ঈশ্বরে সঞ্চিত আছে। রস আস্বাদিত হয় কিরূপে? বলিয়াছি, রসনা দ্বারা। তবে রসনা কি হইল? হইল যন্ত্র। পুণ্যের বাজনা তাহাতে বাজে, পুণ্যের লহরী তাহা হইতে উচ্চারিত হয়। যে ব্যক্তি রসনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সময়ে চাবি দিয়া খুলিতে ও সময়ে বন্ধ করিতে পারেন, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করাইতে পারেন ও বাঁশীর ন্যায় বিবিধ ভাবের সুর বাহির করিতে পারেন, তাঁহাকেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। যে শব্দ বিনা শাস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, সেই শব্দ বিনির্গত হয় কোথা হইতে? যিনি ভক্ত, ঈশ্বরের ভৃত্য, রসনা সাধনে সিদ্ধ, তাঁহারই মুখ

নিরাকার ব্রহ্মের শব্দ-প্রকাশের যন্ত্র। কোন কোন মহাত্মা এমনই বলেন যে, বেদ বেদান্ত পরাজিত হইয়া যায়। কোন কোন মহাত্মার এমনই উচ্চারণ যে, তাঁহার নাম হইয়াছে চতুর্ম্মুখ। এই জন্যই বলে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। এক মুখে অধিক বলা যায় ভাবিতে না পারিয়া, লোকে অধিক মুখের আরোপ করে। মুখবান্ নরনারীই দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছেন। এক ভাব সাধক-মুখে উচ্চারিত হয়, সংগীতে সেইভাব গীত হয়, বাদ্যযন্ত্রে সেই ভাব বাজে। মূল কোথায়? সাধকের মুখবিনিঃসৃত একটী শব্দে। সাধক যাঁহারা, ঈশ্বরের দাস যাঁহারা, তাঁহাদের মুখ যন্ত্রস্বরূপ। ইহার আওয়াজে কোটী বাদ্যযন্ত্র হারিয়া যায়। একটী শব্দ ঈশা উচ্চারণ করিলেন, চার সহস্র লোক একত্রিত হইয়া তাহাই গান করিতেছে, ইহা কর্ণে শুনিয়াছি। এই যে প্রকাণ্ড বজ্রতুল্য চীৎকার, যাহা এক মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক লোর্লী নামক স্থানের শব্দের ন্যায়। এমনই নিকটে আসিবে, এমনই দূরে যাইবে যে, ভয় পাইতে হয়। সাধক-কণ্ঠের ধ্বনি বিদেশে চলিয়া গেল, ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিল। প্রথম মানুষ যিনি, তিনি হয়ত বলিলেন, পিতাকে প্রেম কর, ভ্রাতাকে ভালবাস। এ শব্দ কোথা হইতে তিনি বলিলেন? অন্তরের এক শব্দ হইতে। ভিতরের সেই যে এক শব্দ, তার নাম কি? তার নাম বিবেক, তার নাম প্রত্যাদেশ, তার নাম আদেশ। তার নাম কি? তার নাম, মনুষ্যের আত্মাতে ঈশ্বরের স্থিতি। সেই স্থিতি হইতে যে ধ্বনি হইল, তারই প্রতিধ্বনি বরাবর হইতে চলিল। একজন উপদেষ্টার প্রতিধ্বনি দশ জনে করে; একজন আচার্য্যের প্রতিধ্বনি পাঁচ শত লোকে করে। এক ভগবদ্ভক্তের প্রতিধ্বনির এই রবিবারে চল্লিশ সহস্র প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। এই মুহূর্ত্তেই উঠিতেছে। উপাসনাও প্রতিধ্বনি, সকলই

প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ। প্রথম শতাব্দী অন্য শতাব্দীকে প্রতিধ্বনি দিল। কি দিল যুগ যুগকে? ঈশার শব্দের প্রতিধ্বনি, মুশার শব্দের প্রতিধ্বনি। আদি ইহার কি? ঈশ্বরের শব্দ। লোর্লি পর্ব্বতের ন্যায় দূর হইতে নিকটে, নিকট হইতে আবার দূরে প্রতিধ্বনি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে যদি কেহ একটী প্রস্তর ফেলে, প্রথম একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়, তার পর একটী বড়:আয়তন তরঙ্গ হয়, তার পর আর একটী হয়। শেষে হয় কি? শেষে কোটী কোটী ক্রোশ ব্যাপী প্রশান্ত সাগরকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। তেমনি ভক্তরূপ ক্ষুদ্র প্রস্তরাভিঘাতে পরমাত্মা-সাগরে যে তরঙ্গ হয়, তাহা প্রথম বেদীর চার দিকে বদ্ধ থাকে, ক্রমে উড়িষ্যায় যায়, পঞ্জাবদেশে যায়, গুজরাটে যায়, ইংলণ্ডে যায়। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই যে শব্দ, ইহা ব্রহ্মের প্রকাশ। ধন্যবাদ করি তাঁহাদিগকে, যাঁহারা এই শব্দকে রক্তমাংসের আকার দিতে পারেন। তাঁহাদিগের ভিতরে অনাহত শব্দ আহত শব্দ হয়। বীণাপাণি আর কে? সেই, যার মুখ হইতে ব্রহ্ম অভিভাব, ব্রহ্ম আজ্ঞা বিনির্গত হইয়া এমনই শব্দ করে যে, সমুদয় বাদ্যযন্ত্র হার মানে। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! এই শব্দের প্রতি অমনোযোগ করিও না। শ্রোতার এই গৌরব যে, প্রেরিত শ্রোতা সুশব্দ কুশব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। প্রেরিত সিদ্ধ বক্তা যেমন কুশব্দ বলেন না, কেবল অন্তরে বাজে যে শব্দ তাই বলেন, প্রেরিত শ্রোতা তেমনই সুশব্দই শ্রবণ করেন। আমাদিগের মন্দির হইতে তাই বাজুক, আমরা শ্রবণপুটে তাহাই সঞ্চয় করি। আমরা মুনি হই, ধারক হই, শব্দ-ব্রহ্মে হৃদয় পূর্ণ করি, শব্দ আহার করি। বৃক্ষ লতা আমাদিগের নিকট গান করুক; অচেতন, সচেতন সকলে মিলিয়া অশব্দ ব্রহ্মের ভাব শব্দায়মান করুক। ঈশ্বর আমাদিগের উপর এই সৌভাগ্য বিধান করুন।

অতীত কালের সন্তান।

রবিবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০৩ শক ;
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দুমাত্রেই পূর্ব্বদিককে লক্ষ্য করিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া সমুদয় স্নান জপাদি করিবারই বিধি। পূর্ব্বদিকের এত সম্মান কেন? পূর্ব্ব এই কথার মানে কি? পূর্ব্ব মানে, যাহা হইয়া গিয়াছে; যাহা কোন সময় ছিল, এখন নাই; গতকাল, অতীত সময়। আমরা কে? আমরা অতীত কালের সন্তান। কথিত আছে, যখন শাক্যমুনি সিদ্ধ হইয়া পুনরায় কপিলবস্তু নগরে ফিরিয়া আসিলেন, পিতা শুদ্ধোদনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সশিষ্যে যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন রাজার একগুণ শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রাজা একে পুত্রশোকে কাতর, একমাত্র পুত্র সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে, ভাবিয়া দুঃখিত, পুত্রবধূ বিধবার ন্যায়, তাহার মাতা কাঙ্গালিনীর ন্যায়, তার পর সেই পুত্র পুনরাগত হইয়া, মুণ্ডিতমস্তকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে দেখিয়া, রাজার শোকের আর অবধি রহিল না। একে পুত্র হারাইবার ক্লেশ, তার পর সেই পুত্রকে ভিক্ষুক দেখিবার ক্লেশ। তিনি বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া বলিলেন, "হে পুত্র, মনঃপীড়া দাও কেন? তুমি রাজার সন্তান, বৈরাগী হইয়াছ, ইহাই কি যথেষ্ট নয়? নিজ রাজ্য মধ্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাতে, আমার মনে ক্লেশ দেওয়া ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের অপমান করা কি হইতেছে না? পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিলোপ কর কেন?" প্রশান্তমতি বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, 'আমি

পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিলোপ করি নাই, পালন করিতেছি।' 'কিসে? তুমি রাজা, রাজধর্ম্ম পালন করিতেছ? পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ?' শাক্য বলিলেন, 'আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা নহেন। যেখানে যত ফকির আছেন, ভিক্ষুক আছেন, যাঁহারা দণ্ডধারণ করিয়া অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েন, আমি তাঁহাদের বংশজাত। তুমি রাজধর্ম্ম পালন কর, আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পালন করি।' শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের কথার অর্থ কি? কেবল শাক্যমুনি নহেন, যখন যিনি কোন ধর্ম্মবিধি পালন করেন, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে যত যোগী, মুনি, ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সন্তান। যে মনে করে, আমার ধর্ম্ম, অপরের ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সে ধর্ম্ম বোঝে না; ঈশ্বর বোঝে না। সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম বোঝে, যে মনে করে আমার ধর্ম্ম সেইরূপ, পিতা পুত্রের নিকট রত্ন রাখিয়া যান যেরূপ। যোগ সাধন করিয়া, তপস্যা করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের যোগী ঋষিরা যে ধন রাখিয়া গেলেন, আমরা সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের বিত্তের অধিকারী হইয়া আমাদিগের ধর্ম্মপালন করিতেছি। যে মনে করে আপনাকে পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন, গত কালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সে নির্ব্বোধ, সে ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ। মানবের বর্ত্তমান অবস্থা কি হইতে হইল? জ্ঞানীরা বলেন, যে মানব-বংশ পূর্ব্বে ছিল, তাহা হইতে; এমন কি, পশুবংশ লইয়া মানবপ্রকৃতি গঠিত হইল। আমরা বলি, যোগ ছিল, ভক্তি ছিল, তপস্যা ছিল; সেই সমস্ত একীভূত হইয়া, ঘন হইয়া, পিতামাতা হইয়া, আমাদিগকে গর্ভে ধরিল। অতীত কাল আমাদিগকে গর্ভে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, পরে যখন আমরা ধর্ম্মবিধি পাইলাম, জন্মিলাম, পূর্ব্বকার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলাম। যেমন সন্তানের

আকার স্বাস্থ্য পিতামাতার ন্যায় হয়, তেমনি আমাদিগের যোগ ধ্যান প্রভৃতি সমস্ত ভাব পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। বালকের প্রকৃতি কিরূপ হয়? পিতামাতার প্রকৃতিকে একত্র করিলে যা হয় তাই। আমাদিগের হস্তের নাড়ী ধরিয়া দেখিতে হইবে, পূর্ব্বকালের রক্ত চলিতেছে কি না? বক্ষে যন্ত্র ধরিয়া দেখিতে হইবে, পূর্ব্বকার যে ধ্যান ছিল, যে সব চিন্তা ছিল, ভিতরে তাহার শব্দ হইতেছে কি না? যদি না হয়, বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মের গর্ব্ব করিলেও তোমার ধর্ম্ম কাল্পনিক। আর ইহা যদি হয়, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতিতে শাস্ত্র লিখিত দেখিব, তোমার উপাসনার ভিতর বাল্মীকি, বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইব, তোমার উপদেশের ভিতর শাক্যমুনির শব্দ শুনিব। যে সকল মহাত্মা যে সকল বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছেন, তোমার কর্ম্মে তাহার গন্ধ পাইলে বলিব, তোমার ধর্ম্ম পুরাতন শক্তি সামর্থ্য লইয়া, পিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিয়াছে। তুমি সেই পুরাতন মহাত্মাদিগের বংশে জন্মিয়াছ। যে ভাবিবে তার ধর্ম্ম আর চৈতন্যের ভক্তির ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, সে কখন চৈতন্যের ভক্তি পাইবে না। যে ঈশার ভাবকে স্বতন্ত্র ভাবিবে, সে বাইবেল ও ঈশার প্রকৃতির গভীর অর্থ পাইবেনা। যে ভাবিবে শাক্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, সে নির্ব্বাণের গভীর ভাব বুঝিবে না। এমন হইতে পারে, তাঁহাদের কোন কোন মতের সহিত কি ভাবের সহিত ভিন্নতা আছে; কিন্তু তাঁদের প্রকৃতির সার ভাব যাহা, তাহার যে সত্যতা, সমুদয়, ভূত কালের সন্তান যে আমরা, আমাদিগের ভিতর প্রবাহিত হইতেছে। লোকে যে ঈশার বিষয় পাঠ করে, উপকার হয় না কেন? শাক্যের সাধন ও চৈতন্যের ভক্তির কথা শোনে, চরিত্রে সেই সমস্ত ভাব নামে না কেন? সে মনে করে, শাক্যের ধর্ম্ম পড়িবার বিষয়; ঈশার ধর্ম্ম শুনিবার

বিষয়। আমি যে এ যুগে ঐ সব ভাব পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, সে এ কথা ভাবে না। দায়িত্ব মানে না। ব্রাহ্ম মনে করে না, ভক্তির জন্য সে দায়ী; গভীরতম আত্মদমন করিবার জন্য দায়ী। তার অন্তঃকরণে এ ভাব লাগেনা যে, সে জগৎকে দেখাইবার জন্য দায়ী। ঈশ্বরের সন্তান হওয়া কাহাকে বলে? পিতৃ-ঋণ যে তাহার গলায়। ঈশ্বরের নিকট ঋণ করিয়া শাক্য চলিয়া গিয়াছেন, ঈশা চৈতন্য চলিয়া গিয়াছেন। ঋণ নয়ত আর কি? চৈতন্যের ভক্তি দয়াময়ের ভাণ্ডার হইতে না হইলে কি হইতে পারে? সেই যে ঈশার পবিত্রতা, পরহিত-পরায়ণতা, অন্যের দুঃখে কাতরতা, প্রাণদান, ভাব, বিশ্বাস দয়াময়ের ভাণ্ডার হইতে না হইলে, কোথায় পাওয়া যায়? অহিংসা প্রভৃতির যে উপদেশ শাক্য প্রচার করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের দ্বার ব্যতীত তাহা আর কে কোথায় পায়? আমরা সেই পিতৃ-ঋণ ভোগ করিতেছি, সেই ঋণ লইয়া ঈশ্বরের পূজা করিতেছি। যে বিশ্বাস ঈশা দেখিয়াছিলেন, তাহাই ভোগ করিতেছি। ঋণ যে শোধ দিতে হইবে মনে করিনা। চৈতন্য যে ভক্তির ধর্ম্ম, অসমাপ্ত ধর্ম্ম রাখিয়া গেলেন, তাহা যে আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে, ইহা আমাদিগের মনে হয় না। শাক্যের সন্তান আমরা, তাঁহার নির্ব্বাণ যে আমাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে। অতীত কালের সন্তান আমরা, যাবতীয় অসমাপ্ত ভাব ও অসমাপ্ত বিধান, সমস্ত আমাদের ধর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। অতএব দেখ, আপনাদিগকে অতীত কালের সন্তান বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশা মুসার সন্তান বলিয়া মানিলে, পূর্ব্ব পুরুষদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। কেহ যদি সমস্ত পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্ম পালন করে, ভবিষ্যৎ কাল আসিয়া তাহার সেবা করিবে। বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালের অসমাপ্ত

কার্য্যেকে সমাপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সহস্র লোক ভবিষ্যতে তাহাকে ধন্যবাদ করিবে। তার জীবনরূপ ক্ষুদ্র প্রদীপ নিবিয়া গেলে পরবংশীয় লোকে তাহার কার্য্যভার লইয়া তাহাকে পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া মানিবে। ইহা দ্বারা হয় কি ? না, সমুদয় মানববংশ এক বংশ হয়, এক পরিবার হয়। জাতিভেদ থাকে না, ভূত বর্ত্তমানে বিরোধ থাকে না। কেবলই সমন্বয় হয়, শান্তি হয়, আর অতুল সম্পত্তি মনুষ্য পায়। মহাত্মাদিগের সম্পত্তি কি সাধারণ ? পিতৃ-দত্ত ধন লইতে গেলে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহার দায়িত্ব লইতে হয়। দয়াময় পিতা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভাবিতে পারি, অসমাপ্ত কার্য্যকে সমাপ্ত কার্য্য, অসমাপ্ত ভাবকে সমাপ্ত ভাব, অসমাপ্ত বিধিকে সমাপ্ত বিধি করিতেই আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন ইহা ভাবা যায়, তখন বর্ত্তমান জীবনকে সর্ষপ কণার ন্যায় বোধ হয়। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় হয়। পূর্ব্বকাল মনে হইলে পরকাল মনে হয়। অবশেষে ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, অনন্তকালের ভাব অনন্ত ঈশ্বরের নিকট সমস্ত বিলীন হয়। এইরূপে আমরা ভূতকালের সঙ্গে যোগ লাভ করি, ভবিষ্যৎ জীবনের সংবাদ পাই, সকলের সঙ্গে একাত্ম হইয়া অখণ্ড ঈশ্বরের মঙ্গলময় পদাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হই।

প্রেমের ধর্ম্ম।

রবিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৮০৩ শক ;
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মাচার্য্য উত্তপ্ত কেন ? ধর্ম্মোপদেষ্টার মুখে নিন্দাসূচক বাক্য কেন ? ধর্ম্মাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিবেন, প্রিয় বলিবেন, মিষ্ট বলিবেন, রুষ্ট হইবেন না, এইত জানি। প্রত্যাশা করি, সাধুকার্য্য করিব ; আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগ্রসর হইবার সাহায্য করিবেন। যখন অন্যায় কার্য্য করিব, প্রিয় বচনে ফিরাইবেন। তাহা দেখি না কেন ? মাঝে মাঝে ধর্ম্মাচার্য্য এমনই তীক্ষ্ণ বাক্যে হৃদয় বিদ্ধ করেন, অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করেন, যে ব্যথিত হই। জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মাচার্য্য এত রুষ্ট কেন ? অপ্রসন্ন কেন ? ধার্ম্মিকেরা মিষ্ট বলিলে লোকে বিস্মিত হয় না, রুষ্ট বলিলেই বিস্মিত হয় ; ইহার মানে কি, লোকে বুঝিতে পারে না। যিনি পর্ব্বত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দীনাত্মারা ধন্য", তিনিই আবার কাল সর্পের বংশ বলিয়া নিদারুণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিলেন। মোহম্মদ কোরেশের দৌরাত্ম্য, স্বদেশীয়দিগের বিদ্রোহ কত দীন হইয়া ও ধীর হইয়া সহ্য করিলেন, সেই মোহম্মদ চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া কাফেরকে অভিসম্পাত করিলেন। যে শাক্য নির্ব্বাণ-সাগরে মগ্ন, নির্ব্বাত প্রদীপতুল্য, তিনিই আবার মাঝে মাঝে কুতর্ক দমন করিবার জন্য এমন সকল বাক্য ব্যবহার করিলেন যে, বজ্র পড়িলে যেমন বৃক্ষের উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ভেদ হয়, তেমনি কুতার্কিকের কুতর্ক ভেদ হইয়া গেল। ইহাতে ফল হয় কি ? অনেক হিন্দু, অনেক মুসলমান, অনেক খ্রীষ্টান এমনই দারুণ বাক্য ব্যবহারে পটু হইলেন যে, তাহা শুনিলে মন শীতল

না হইয়া মন উত্তপ্ত হয়। সাবধানে হৃদয়ঙ্গম কর, প্রেমের সঙ্গে আর আঘাতের সঙ্গে কোথায় যোগ ও কোথায় বিয়োগ। আমরা মনে করি, প্রেম মানে মিলিত হওয়া, মেষশিশুর ন্যায় হওয়া, মাটী অপেক্ষা নীচু হওয়া, কর্দ্দমের ন্যায় দলিত হওয়া। প্রেম একপক্ষে পুষ্প অপেক্ষাও কোমল ও চন্দ্র অপেক্ষাও শীতল ; অপর পক্ষে পৃথিবীতে যত ভয়ানক দৌরাত্ম্য ও বিপ্লব হইয়াছে, প্রেমের দ্বারাই হইয়াছে। স্বদেশ-হিতৈষণা যদি প্রবল হয়, স্বদেশের জন্য কে না রক্ত দেয় ? কেহ স্বাধীনতা হরণ করিলে শত সহস্র লোকে সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দেয়, এবং লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাহা অপেক্ষাও যদি নীচে টানিয়া আনি, যেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা, সন্তানের প্রতি মাতার ভালবাসা, সেখানে যদি আনি, কি দেখিতে পাই ? নারী যে, সে ব্যাঘ্রীর ন্যায়, সিংহীর ন্যায় শিশুকে রক্ষা করে। যে সকল জীব কোমল-স্বভাব, সন্তান-রক্ষার সময় তাহারাও তীব্র ভাব ধারণ করে। এক ভাব যেমন কোমলতা, অপর ভাব তেমনি ভীষণতা। যথার্থ প্রেম যাঁর জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি দুইয়েরই সমন্বয় করিতে শিখিয়াছেন। যেমন মার এমনই স্নেহ শিশুর উপর যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না ; সেই স্নেহই সময়ে শিশুর উপর নিষ্ঠুর হইতে বাধ্য করে। প্রেমের ধর্ম্ম এই। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হন, জগতের সতীর স্থান যাঁহারা অধিকার করেন, ভালবাসার সুরা যাঁহাদিগের ধমনী হইতে ধমনীতে, শিরা হইতে রক্তে, রক্ত হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যাঁহারা সেই সুরার দ্বারা অধিকৃত, তাঁহাদের মেজাজের ঠিক নাই। চন্দ্রের ন্যায়, শিশুর ন্যায়, নারীর ন্যায় এই শান্ত কোমল, আবার এমনই সিংহের ন্যায় লম্ফ, এমনই ভয়ানক গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, লোকে দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাঁহাদের এমন দশা হয় কেন ? লোকে সকল

সহিতে পারে, কিন্তু যার জন্য প্রেম দিয়াছে, সেই পদার্থের উপর আঘাত করিলে কেহ সহিতে পারে না। নারীকে বস্ত্র না দাও, অন্ন না দাও, সহিবেন ; সন্তানের উপর আঘাত করিলে আর সহিবেন না। স্বামী সমস্ত বরদাস্ত করিতে পারেন, পত্নীর উপর অত্যাচার করিলে আর সহিবেন না। ধর্ম্মাত্মা যিনি, তাঁকে মার, বিরক্ত কর, তাঁর কুৎসা কর, তিনি সমস্তই সহ্য করিবেন ; কিন্তু প্রিয়তম পরমেশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের উপর কেহ নাস্তিকতার, কি রিপুর, কি সন্দেহের আঘাত যদি করে, কোন ক্রমেই সহিবেন না। তাঁর নিকটে এমনি মান-যন্ত্র আছে যে, ঈশ্বরের দিকে এক কুঁচ তুল্য অত্যাচার করিলে তাঁর শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়, তিনি কঠোর ভাষা বলেন ও কঠোর কার্য্য করেন। নর-নিন্দা আর হরি-নিন্দার প্রভেদ লোকেত বুঝিতে পারে না, তাই আশ্চর্য্য হয়। মারিলাম, কাটিতে গেলাম ; যে সকলই সহিল, একটী কথাও কহিল না, সেই আবার সিংহনাদ করে, মারিতে আসে, কাটিতে আসে কেন? তাঁর উপর যত অস্ত্র ফেলা হয়, তিনি কিছুতেই উত্তেজিত হন না, কিন্তু তাঁর সীমা অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি তৃণ নিক্ষেপ করিলেই বজ্রের ন্যায় তাঁর হৃদয়ে বাজে। যিনি আপনার প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রকৃতিতে ফেলিয়াছেন, যিনি আপনাকে ফেলিয়াছেন তাঁহাতে, তাঁকে মারিলে লাগিবে কেন? যাঁহার 'আমি' বলিবার ঠাঁই নাই, তাঁর 'আমি'কে লাগিবে কেন? তাঁর সকল প্রেম যেখানে রাখা, তাঁর শরীর মন যেখানে, ইহ পরকালের আশা যেখানে সমর্পিত, সেখানে দৌরাত্ম্য করিলে আর সে মানুষ থাকেন না। তিনি কি ব্যবহার করিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল দেখিয়া ধর্ম্মাচার্য্যকে ভয় কর। তাঁকে ঘৃণা কর, তাঁহার মরণ কামনা কর, এমন কি মারিবার চেষ্টা কর, তিনি 'কার অন্বেষণ

কর' বলিয়া ধরা দিবেন। যাঁহাকে শত্রুরা ঢাল লইয়া, তরবারি লইয়া গিয়া সহজে ধরে, ঈশ্বরের বিপক্ষে একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনিই এমনি হুঙ্কার করেন যে, কার সাধ্য ধরিতে পারে? যখন ধর্ম্মাচার্য্য সিংহ-শাবকের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করেন, লোকের তখন তাক লাগিয়া যায়। এই যে প্রেম, ইহা কখনও নরম, কখনও গরম; কখনও শিশুর ন্যায়, কখনও হস্তীর ন্যায়; কখনও ক্রন্দন, কখনও হাস্য; কখনও হুঙ্কার লম্ফ, কখনও শান্ত স্থির। কখন যে কি মূর্ত্তি ধরে, কি করে, অথবা কি বাক্য উচ্চারণ করে, মানুষ তাহা বুঝে না। আর একটী কথা এই, যাঁহাদের শরীরে শরীরে এখনও প্রেম সুরা প্রবেশ করে নাই, আমিত্বরূপ মহিষকে অষ্টমীর দিবসে যাঁহারা আজও বলিদান দেন নাই, জুলুম জবরদস্তিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে পরিমাণে প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, ও পরের জন্য প্রাণ-দান, সেই পরিমাণে রোষ প্রকাশের অধিকার। তুমি যদি ধর্ম্মাত্মার জীবনের রোষ মাত্র অনুসরণ কর, তাহাতে লোকে ভুলিবে না; তোমারও কিছু গৌরব নাই। প্রথমে প্রেম আনিয়া হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রেমিক কর, ক্ষমা ও নিজের প্রকরিত (?) ত্যাগ ও সংযম সম্পূর্ণরূপে অধিকার কর, প্রেমেতে মাটী হও, কোমল হও, তার পর অধিকার দেওয়া যাইবে, যার উপরে যে ভাষা হউক, ব্যবহার করিও। প্রেমের সঙ্গে আঘাত ভাল; প্রেমের অভাবে স্তুতিও মন্দ। প্রেম আগে হউক, পরে প্রেমের অনুরোধে কখনও শান্তি, কখনও রোষ, কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও কিছু—এই সমস্ত মহাভাব পূর্ণ হইয়া আপনারা ধন্য হইব; পৃথিবীকেও কৃতার্থ করিব।

ধর্ম্মসমাজ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক;
১৪ই মে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

যদি ব্রহ্মের দর্শন পাই, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি চিন্ময় নিরাকার হইয়া কিরূপে জড়ময় জগৎ রচনা করিলেন। সৌন্দর্য্যময়ের সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবে একবার চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য কিরূপে পুষ্পের পত্রে চিত্র করিলেন ও বালকের হাস্যে নিহিত করিলেন। তিনি যে কত গুণধারী, তা আর কি বলিব? চিন্ময় ব্রহ্ম গুণরাশি এমনি করিয়া ভৌতিক জগতে ঢালিয়া দিলেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব কি এই যে, চিন্ময় বস্তুকে বাহিরে গঠন দিতে পারা? যোগ, তপস্যা, প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান, এই সমস্ত ভাবকে একত্র করিয়া বাহিরের উপকরণে মিশ্রিত করিলে যে নিরাকার হইতে সাকার হয়, তাহাই কি তবে ব্রহ্মতত্ত্ব? ধর্ম্মতত্ত্ব কি এই, বল; যদি বলিতে পার, তবে বল। ইহাই যদি হয়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের যদি এই লীলা হয়, তাঁর ভাবের গভীরতা হইতে যদি তিনি বাহ্য সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তবে ইহাও সত্য যে, নিরাকার ধর্ম্মের ভিতর হইতে বাহিরে এক অপূর্ব্ব গৃহ রচিত হইতে পারে। ধর্ম্ম নিরাকার সামগ্রী; প্রেমে, শান্তিতে ও সত্যেতে ধর্ম্ম বিরচিত। সকলই ভাবময়, চিন্ময়, আত্মিক, জ্যোতির্ম্ময়, এই ধর্ম্মের ভিতরে। এই ধর্ম্ম যখন মানুষের প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন, নরদেহে নরাত্মায় যখন প্রবেশ করেন, তখন করেন কি? চিন্ময়মূর্ত্তি, আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য্য, আপনার নিরাকার ভাব উপকরণ, একত্র করিয়া মানুষকে

মানুষের সঙ্গে সমবেত করিয়া এক বিচিত্র জগৎ প্রসব করেন। সে সৃষ্টির নাম কি? বাহিরের উপকরণে যে সৃষ্টি হয়, তাহার নাম জড়সৃষ্টি। চন্দ্র সূর্য্য লইয়া যে সৌরজগৎ রচিত হয়, তাহার নাম জড়সৃষ্টি; কিন্তু মানুষের ভিতর নিরাকার ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া বাহিরে যে আকার গ্রহণ করেন, তার নাম কি? তার নাম ধর্ম্মসমাজ। মণ্ডলী বল, আর পরিবারই বল, আধ্যাত্মিক মিলন বল, আর গির্জ্জাই বল, ইংরাজীতে বল, আর পাঞ্জাবীতেই বল, যাহাতে বলিতে হয়, তাহাতেই বল; মূলকথা এই, ধর্ম্মের মূল বদ্ধ হয় সমাজে। সমাজের ভিতরে ধর্ম্মের শক্তিতে এক মানুষের প্রকৃতি অপর মানুষকে টানে; একজনের পার্শ্বে পাঁচজন আসিয়া সমাগত হয়; হইয়া অপূর্ব্ব আকার যাহা নিরাকার প্রসব করেন, তাহাই হয়। সমাজের ভিতরে এই যে টান, ইহা কিসের টান? ঈশার শিষ্যকে যদি বল, হে পিটার! হে জন! হে পল! কি শক্তিতে ঐ অল্পবয়স্ক সূত্রধরের চারিদিকে একত্রিত হইয়াছ? উত্তর নাই। কেমন একটা টান আছে যে, পিতা মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়, এমন কি মৃত হইয়াছে যে জ্ঞাতি, তাহাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া মেষপাল যেমন মনের গতিতে একদিকে ধাবিত হইতে থাকে, তেমনি সকলে ঈশার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। হে নিত্যানন্দ! হে গদাধর! হে হরিদাস! কি বলিয়া গৌরের সঙ্গে বেড়াও? ভক্তির অর্থ কি? তাহা কি বলিতে পার? না। এমনি এক প্রকার টান জন্মিয়াছে যে, এক জালে যেমন সমস্বভাব মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। দশ জনে এক জনের চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রকৃতি-নিহিত ধর্ম্ম যখন বাহিরে আকার গ্রহণ করেন, ভিতরে নিহিত প্রত্যাদেশ-শক্তি যখন দশজনকে আনিয়া নদীতীরে, পর্ব্বতে পর্য্যন্ত লইয়া বেড়ায়, তখন লোকে যে বলে, উপদেবতা স্কন্ধে বসিলে কি যে হয়, কোথায় যে লইয়া যায়, কিছুরই ঠিকানা নাই,

সেই কথাই যথার্থ হইয়া থাকে। ঠিক যেন উপদেবতা স্কন্ধে বসে; আর বলিতে পার না, এমন কোন শক্তি মানুষকে লইয়া ঘোরায়। দেখ, নিরাকার শক্তি মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাধ যেমন পক্ষীকে ধরে, কাঁচপোকা যেমন অন্য কীটকে ধরে, তেমনি মানবাত্মাকে ধরিয়া থাকেন। কীটের ক্ষমতা থাকে না যে পলাইয়া যায়। চিন্ময়ী নিরাকার শক্তি এই রূপে কতকগুলি নরদেহ নর-আত্মা লইয়া মণ্ডলী রচনা করেন। যে দেশে এই মহাশক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইখানেই দল হইয়াছিল। কুল-বধূরা পর্য্যন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্গের রচনার অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন। ঘরের স্ত্রী ও বাজারের কুলটা পর্য্যন্ত বিচিত্র দৈবশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পবিত্র পরিবার রচনা করিল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, গৌরাঙ্গের চারিদিকে এত লোক যে ছুটাছুটি করে, সে কি তাঁর মুখ-লাবণ্য দেখিয়া? পাণ্ডিত্য দেখিয়া কি নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে? উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া কি তাঁহাতে মোহিত হইয়াছে? শরীরের সঙ্গে যোগ নয়, উঁহার মন টানিয়াছে, ভিতরে কি আছে, তারই এত আকর্ষণ। মনে করি, চলিয়া যাই, গিয়া গৃহকার্য্য করি, কিন্তু কোন ক্রমেই পারি না। মন বন্দী হইয়াছে। এই যে পরমাশ্চর্য্য শক্তি, যদ্দ্বারা নরনারী একত্র হয়, ইহা লইয়াই ধর্ম্মবিধান। এই যে আমাদিগের ধর্ম্মবিধান, ইহার আর কিছু বলিতে পারি, আর না পারি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কোন এক শক্তি আসিয়া আমাদের দশজনকে আক্রমণ করিয়া একত্র করিয়াছে। আমাদের যে মণ্ডলী, এই যে সমাজ, ইহার ভিত্তি সংস্থাপন হইয়াছে, অন্য কিছু বলিতে পারি আর না পারি, একথা নিঃসংশয় বলিতে পারি। আমাকে বলিতে পার যে, তোমার শক্তি আছে, অনায়াসে অন্যত্র গিয়া পন্থা দেখিতে পার, এখান হইতে সংসারে চলিয়া

গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পার, কিন্তু বাস্তবিক তাহা পারি না। শুদ্ধ যে পারি না তাহা নহে, ইচ্ছা হইলেও পারি না। কি এক উপ-দেবতা স্কন্ধে আসিয়া বসিয়াছে যে, আমি যাইতে চাহিলেও যাইতে দেয় না। আমি যদি বলি, ছাড়, আমায় ছাড়ে না। আমরা কিছু বালক নই, নিতান্ত যুবকও নই, ভাল মন্দ পৃথিবীর জানি, অভিমান আছে, লজ্জা আছে, কেহ আঘাত করিলে আঘাত পাই, এ সকল সত্ত্বেও এই যে কি একটা শক্তি আমাদিগকে ধরিয়াছে যে, কিছুতেই ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। ইহার জাল কিছুতেই কাটিয়া যাইতে পারি না। এখন বিবেচনা করিব, এই যে আসক্তি, ইহা শরীরের, না মনের? দেহ, না মন আকৃষ্ট হইয়াছে? হৃদয় আমাদিগের ধরা পড়িয়াছে। মন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পরের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিমানবশতঃ আমরা স্বীকার করি আর না করি, এই মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আমাদিগের পিতা, কেহ পিতৃব্য, কেহ মাতা, কেহ কনিষ্ঠ। এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে নানা সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে। মন যখন ভাল থাকে, তখন পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না, জ্যেষ্ঠ বলিয়া কাহারও বা চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। দেবশক্তি অবতীর্ণ হইয়া, এই সকল সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মসমাজে পরিণত হইয়াছেন। জাতিভেদ ছাড়িয়া এই যে এখানে আসিলাম, ইহা কি আপনার ইচ্ছাতে? কেহ ছিল নগরে, কেহ ছিল গ্রামে, কেহ ছিল পাপে। সেই শক্তি সকলকে এখানে আনিয়া এক করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর পিতা মাতা আমাদিগকে অস্বীকার করিলেন, আত্মীয় কুটুম্ব নদীর জলে মায়ামমতা ভাসাইয়া দিলেন, ডাকিলে কেহ উত্তর দেন না, দেখিলেও কেহ পরিচয় লন না; কিন্তু এই যে এখান-কার পাঁচ জন দশ জন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইতেছেন, কেহ

কাহাকেও জ্যেষ্ঠ বলিতেছেন, কেহ কাহাকেও অভিভাবক প্রতিপালক বলিতেছেন, এই দলেরই ভিতরে কোন সতী সাবিত্রীকে কেহ মাতারূপে স্বীকার করিতেছেন, নিঃসন্তান যিনি, তিনি ইহারই মধ্যে কাহাকেও সন্তানের ন্যায় পালন করিতেছেন—এই যে মণ্ডলী, ইহা আর কিছুই নয় ; ইহা নিরাকার ধর্ম্মের বাহ্য আকার। হে ব্রাহ্মগণ! হে আহূতগণ! এমন করিয়া আকৃষ্ট হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, এখন পর বলিয়া দুঃখের সাগরে ভাসাইলে কি চলে? এত সম্বন্ধ পাতাইয়া এখন 'দূর হ' বলা, আঘাত করা, সর্ব্বনাশ চিন্তা করা, কি পতনে সুখী হওয়া, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা কি শোভা পায়? এই যে মণ্ডলী, ইহা মনের মণ্ডলী, দশটি আত্মা একত্র হইয়া পরলোক-ধাম রচনা করিতেছে। প্রাণ যখন বাহু পসারিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়, মুখ তখন কটু বলে কেন? এই প্রশ্ন স্বয়ং ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি, যে নীচু ছিল, তাহাকে উচ্চ করিলেন। প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে যার জন্য শ্রদ্ধাভক্তির উপহার আসিতে লাগিল, সে যদি নিরাকার ধর্ম্মের অবয়বকে গঠন না করিয়া ভঙ্গ করে, তাহা হইলে কি হয়? দেখিও, শক্তির প্রতি দারুণ অত্যাচার যেন না হয়। নিরাকার ঈশ্বরের প্রমাণ কি? আকারযুক্ত মণ্ডলী। নিরাকার স্বর্গের নিদর্শন কি? ধর্ম্মপরিবারের সম্বন্ধ। মহাব্যাপার হয়, যখন পৃথিবীতে এইরূপ মণ্ডলী রচনা হয়। ইহা হইতেই সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়, নীতি রক্ষিত হয়, স্ত্রীজাতির উন্নতি হয়। ইহা একবার বিকৃত হইলে প্রচারে ফল হয় না, স্ত্রীজাতির দুর্গতি হয়, অর্থাগমও বন্ধ হইয়া পড়ে। এই মণ্ডলীরূপ দেহে যদি ব্যারাম হয়, মুখ যদি না বলে, যার পরিশ্রম করিবার সে যদি না করে, পৃথিবীর লোক আসে না, বরং চলিয়াই যায়। যদি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তবে হে

আহূতগণ, মণ্ডলীকে পবিত্র কর, প্রেমেতে পূর্ণ কর; ধর্ম্মমণ্ডলীতে যাহাতে শান্তি ও পবিত্রতা প্রবিষ্ট হয়, কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হও।

অলৌকিকতা।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪ শক;

৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

অল্পদিন হইতে এই মন্দিরে এবং আমাদিগের এই প্রিয় ধর্ম্মবিধান সম্বন্ধে এমন অনেক কথা হইয়াছে, যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে, আমরা ক্রমাগত বিস্ময়কর, প্রকৃতির অতীত নানা কথা কহিতেছি; স্বভাবের উপর যাহা, ভৌতিক নিয়মের অতীত যাহা, যাহা বিস্ময়জনক এবং যাহা লইয়া অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় নানা অলৌকিক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই সকলেই হস্তক্ষেপ করিতেছি; কেহ যদি এরূপ মনে করেন, আমরা তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাই না। প্রথমেই স্বীকার করা ভাল। অর্দ্ধ সত্য, অর্দ্ধ অসত্য বলাতে লাভ কি? অতএব শোন, এখন হইতে, এখন হইতেই বা কেন, বহুদিন হইতে অলৌকিক ব্যাপার, সাধারণের অতীত ব্যাপার ও পরমাশ্চর্য্য ঘটনা সকল সংঘটন করিতে, ব্রহ্মমন্দিরের ধর্ম্ম হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি সূর্য্যকে আকাশে গতিহীন করিতে চাও? মৃত, প্রোথিত শবকে তোমরা কি পুনর্জীবন দিতে চাও? তাহা আমরা চাই না। অথচ বিস্ময়কর মত ও অলৌকিক সত্য ব্যতীত ধর্ম্ম যে থাকিতে পারেন না, আমাদিগের নিশ্চয় পরিষ্কার বিশ্বাস ইহাই। যাহা প্রকৃতির অতীত, অস্বাভাবিক যাহা, তাহা আমরা মানি না; ঈশ্বরকে আমরা স্বভাব-সম্পন্ন বলিয়া থাকি; তিনি আপনার ভাবে আপনি পূর্ণ। স্বভাবের ঈশ্বর স্বভাবের পতি। ধর্ম্মের প্রকৃতি কোন নৈতিক প্রকৃতিকে চূর্ণ করিয়া,

অগ্রাহ্য করিয়া, নষ্ট করিয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন, কি করিতে পারেন, এ কথা আমরা মানি না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানি যে, ধর্ম্ম যতক্ষণ না সাধারণ লোকের বোধের অতীত হয়, ততক্ষণ ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। যে ধর্ম্ম অলৌকিক ব্যাপার সংঘটন করিতে পারেন না, মৌন ঈশ্বরকে কথা কহাইতে পারেন না, অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখাইয়া করতলন্যস্ত আমলকবৎ করিতে অসমর্থ, সে ধর্ম্ম বিদায় লইলেই ভাল। আমাদের মত এই যে, ধর্ম্মবিশ্বাস অলৌকিক কার্য্য সকল সংঘটিত করে; মৌন ঈশ্বরকে কথা কহায় ও অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখায়। ইহা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সাধন করে, করিয়াছে ও করিতেছে। প্রতিদিনই করিতেছে; তাই ধর্ম্ম মানি। সাধারণের অতীত বা বিস্ময়কর ব্যাপার যে স্বীকার করি, তাহা কোন্ বিষয়ে? অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে যে, মুসা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন, ঈশ্বর সেখানে জ্বলিতে লাগিলেন; কি কোন ধর্ম্মাচার্য্য মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বলিলেন, উঠ; তাহাতে সে উঠিয়া গেল। তাহারা এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার সকলের কথা বলিবে; আমরা তাহা বলিব না। স্বভাবের অতীত ব্যাপারের কথা আমাদিগের নিকট শুনিবে না। বজ্রের ভিতর, কি মেঘের ভিতর হইতে আসিয়া ঈশ্বর পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইলেন, কিম্বা আকাশের উপর কোন জ্যোতিষ্ক আছে, কোন ধূমকেতু কি ইন্দ্রকেতু আছে, সেখান হইতে কোন পক্ষধারী দিব্যকান্তি অপ্সরা করে ভেরী ধারণ করিয়া চীৎকার করিলেন, এ সকল আমরা মানি না, মানিবও না। অলৌকিক যে মানি, ইহার অর্থ কি? আমরা লৌকিককে অলৌকিক করি, ভৌতিককে আমরা পঞ্চভূতের অতীত করি; স্বভাবকে তুলিয়া, আকাশবিহারী যেখানে যায়, সেখানে লইয়া যাই। ইন্দ্রলোক হইতে আমরা ধর্ম্মকে পৃথিবীতে আনি না, পৃথিবীর ধর্ম্মকে ইন্দ্রলোকে

তুলি; আমাদের কার্য্য এই। কবর হইতে মৃতকে উঠাইয়া আমরা অলৌকিক ব্যাপার করি না; কিন্তু পৃথিবীর পাপাত্মা যাহারা, যাহাদের উপরে কিছু আশা ভরসা ছিল না, দোষের কবরে শবের ন্যায় যাহারা ছিল, তাহাদিগকে বলি, ওঠ, আর উঠিয়া অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করে। যে ছিল ভীরু, সে সাহসের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করে; যে ছিল সুরাসক্ত, বেশ্যাসক্ত, তার তনু ভাগবতী তনু, যে ছিল নরকে তাহাকে স্বর্গে উত্তোলন করাই, আমাদিগের পরমাশ্চর্য্য বিধানের গভীর তত্ত্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা এই যে, তাঁহারা বলিতেন, উপরকে নীচে আনিব, স্বর্গকে পৃথিবী করিব; আমরা বলি, নিম্নভূমিকে, উচ্চভূমি করিব, স্বভাবকে স্বর্গ করিব; সাধারণকে অসাধারণ করিব। আকাশের অপ্সরা মানব হইবে, ইহা আমরা মানি না; কিন্তু মন্দমতি নারী, দুরাচারিণী স্ত্রীলোক যারা, তাদের লইয়া যদি একবার ভক্তিপুণ্যের আস্বাদন দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই পবিত্রলোকে উড্ডীয়মানা হইয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে যে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিবে, তাহা আমরা মানি। তাহারা যে মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিবে, তদপেক্ষা পরমাশ্চর্য্য আর নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে যাহা স্বাভাবিক, রোজ যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁর পরমাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ও মহিমা অনুভব করি। অন্য কথা বলি কেন, সামান্য ভাবে একটী মতের কথাই উল্লেখ করি। এই যে আদেশের মত, ইহা লইয়া হয়কে নয় করা, নয়কে হয় করা, আলোককে অন্ধকার করা, কতই হইল। স্থির বিশ্বাসী কি তাহাতে নড়িবে? ঈশ্বরের বাতিকে কি আসনের নীচে লুকাইবে? সেত বলে না, যে কেবল বজ্রের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। সে জানে, প্রতি ঘটনার মধ্যে

ঈশ্বর অভ্রান্ত-স্বরে সুনির্ম্মল সত্য সকল স্থাপন করিতেছেন। ঐ যে মনের ভিতরকার আশ্চর্য্য শব্দ, তাহাকে কি আপনার সামান্য ভাব মনে কর? তা নয়, তা নয়। ঈশ্বর কথা কহিয়া থাকেন, তাঁরই ঐ শব্দ, ঐ শব্দের অনুসরণ কর; হৃদয়ের সাধারণ বিবেকের শব্দ অনুসরণ করিতে করিতে, হৃদয় রোজ রোজ পরিষ্কার হইতে হইতে এমনই হইবে যে, যে কোন ঘটনা ঘটিবে, তারই মধ্যে অনায়াসে ঈশ্বরের আদেশ বুঝিতে পারিবে। যারা এ কথা পরীক্ষা করিয়া বুঝিল না, তারা বলিল, এ ব্যক্তিরা আকাশে ঈশ্বর-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার শব্দ শোনে। এইরূপে তাহারা অন্যায় উক্তি করে। এই যে মানুষের প্রকৃতি, ইহারও মধ্যে প্রকৃতির ঈশ্বর বর্ত্তমান। যার চক্ষু অবিশ্বাসী, সে তাহা দেখিল না, কিন্তু বিশ্বাসী তাহা দেখিলেন। এই যে সকল সামান্য প্রচারক, কাল যারা জাল দিয়া মৎস্য ধরিত, সেই ধীবরেরা, মাল্লারা কি ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে? তার ভিতরে বিশ্বাসী কি দেখিলেন, আর বলিলেন যে, মৎস্য ধরা রাখ। তিনি জানেন যে, বাহিরের ধীবরের ভিতরে আর এক ধীবর আছেন। তিনি বলিলেন, আর তাহারা ছাড়িয়া চলিল। মাল্লা, ধীবর, সূত্রধর প্রভৃতি সামান্য লোকদিগের হইল কি? যেন এক এক জন দেবতা হইল, স্বভাব হইয়া গেল স্বর্গ, মানুষ হইয়া গেল দেবতা। এর চেয়ে অলৌকিক আর কি হইতে পারে? পৃথিবী পার্থিব ভাবকে জয় করিয়া দেবলোক হইল। আমরা কি অলৌকিকত্ব মানি, শবকে জীবন দানের জন্য? কি অগ্নিতে দেহ পোড়ে না দেখিয়া? না, কখনই না। সত্যের আলোক যখন জ্বলিয়া উঠিল, যেখানে গেল, সেই খানেই যেন সহস্র সহস্র লোক আশ্চর্য্য ভাবাপন্ন হইল, মৃত মানুষ যেন জাগিয়া উঠিল। মুসা, শ্রীচৈতন্য, শাক্য প্রভৃতি ভাবের ভিতরে যেন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ

হইলেন ; এই আমাদের অলৌকিক। যাহাদের জীবনে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে, জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে যে, লৌকিকতার ভিতরেই ঈশ্বর অলৌকিক ঘটান। এই নিমিত্তই বিধানকে বলা হয়, স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ। নির্জ্জীব ধর্ম্ম সকল শক্তি প্রাপ্ত হইল, নিরাকার ঈশ্বর বিবেককে অবলম্বন করিয়া, অবতীর্ণ হইয়া, জীবকে উদ্ধার করিলেন। লৌকিক এবং অলৌকিক, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক স্বর্গীয় বিধানের এই তত্ত্ব।

যুগধর্ম্ম-ভাগবত।

(মাঘোৎসব)

সায়ংকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০৭ শক ;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

হে সাধকবংশ, হে অমৃতের পুত্রগণ, যুগধর্ম্ম-ভাগবত শ্রবণ কর। কিন্তু আমি সেই মধুর ভারতী কোথায় পাইব, যাহা উচ্চারণ না করিলে এই সকল দেব লীলা বর্ণনা হয় না? সেই যিনি স্বয়ং সকল বিদ্যার সার, নিরাকারা সরস্বতী, মহাবাগ্‌দেবী,—তাঁহারই দিকে নয়ন উত্তোলন করি। তিনি এই কর্কশকণ্ঠে অবতীর্ণ হউন, তাঁহার কথা লোকদিগকে বলিয়া ধন্য হই। হে সাধক-মণ্ডলী, যদিও ছাপান্ন বৎসর হইল, এই মহা-ধর্ম্মের সূচনা হইয়াছে, তথাপি ইহার সঙ্গে আমাদিগের যোগ ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দশ বার বৎসর ধর্ম্ম শৈশবের অস্ফুট অবস্থায় ছিল। তখন মনের ভাব মনেই লীন হইত, বাহিরে বা কার্য্যে প্রকাশ পাইত না। আঠার বৎসরের অধিক হইবেনা, এই ভাগবতের প্রথম অধ্যায় লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন জীবন-পথের এই গত আঠার বৎস-রের ঘটনা সকল আলোচনা করি, বোধ হয়, যেন অশীতি বৎসরের কি শত বৎসরের অধিক হইয়াছে। বোধ হয়, যেন আমরা কোন প্রাচীন কালে বর্ত্তমান ছিলাম, এবং কত বংশ আসিল ও চলিয়া গেল, কত ইতিহাস লিখিত হইল ও অদৃশ্য হইয়া পড়িল, এই সমস্ত চক্ষে দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে কত ঘটনা ঋতুর ন্যায় বা ঝড়ের ন্যায়

আসিয়া চলিয়া গেল। মহাকীর্ত্তিশালী ভগবান্, তিনি এক বৎসরে দশ বৎসরের কার্য্য করেন। দশ বৎসরের ভিতরে এত লীলা. এত মহাকীর্ত্তি সংস্থাপন করেন যে, নদীর তরঙ্গ যেমন গণনাতীত, তাঁহার লীলা সকলও তেমনই গণনাতীত। হে বন্ধুগণ, সেই সকল লীলার কাহিনী আমি বা অপর কেহ যে বর্ণনা করিতে পারিবে, ইহা সম্ভব নয়; তত্রাপি যখন মনঃ-পটে এই মহাচিত্র দর্শন করি, যখন হৃদয়-রঙ্গভূমিতে বিধাতার বিবিধ অভিনয়ের নানা দৃশ্য স্মরণ করি, তখনই তাহা লোকের নিকট বলিতে ইচ্ছা করে। যেন কত কি বলিবার আছে, মনে হয়। যখন ইংরাজী ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে এই মহাশ্লোক রচিত ও উচ্চারিত হইল, "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্", তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই মহাভাগবত সৃষ্ট হইল। অবগত আছ, ভক্তি বিনা ভাগবত কি? ভাগবত ভক্তি-শাস্ত্র বিনা আর কিছুই নয়। ভগবৎ-লীলাতেই ভাগবত হয়। যুগধর্ম্ম-ভাগবতের প্রথম অধ্যায় ভক্তির কালিতে, ভক্তির কলমে, ভক্তির ছন্দোবন্দে রচিত। যখন পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ মাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্ষ হইতে অবস্থার তাড়নায় ছিন্ন হইল, তখন আমাদের হৃদয়ে রস কোথায়? সেই সময়ে বিশুষ্ক নীতির ভিতরে অমৃতের আস্বাদ কে করিত? নীরস জ্ঞানের ভিতর মধুরতা কে পাইত? তখনকার উপাসনা চীৎকার ছিল, প্রার্থনা মনোবেদনা-ব্যঞ্জক ছিল; ক্রন্দনের মিষ্টতা ছিল না, কেবল সন্তাপ ছিল। একে ত পিতৃতুল্য ব্রাহ্মদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হওয়া হইল, তাহার উপরে আবার যাদৃশ ভাব থাকা উচিত ছিল, তাহা নয়নগোচর হইত না। যখন মঙ্গলময়ের ধ্যান-গুণচিন্তনে নিযুক্ত হওয়া হইত, চক্ষে জ্যোতি পড়িত না, কেবল অন্ধকারের ছায়াই পড়িত।

সেই নিদারুণ অবস্থাতেই কিছু দিন চলিয়া গেল। কিন্তু অলঙ্ঘ্য নিয়মের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে সে অবস্থার অবসান হইল। যখন ভারি রৌদ্র হয়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের প্রখর উত্তাপ প্রান্তরকে শতভাগে ভগ্নকরে, আকাশ তাম্রবৎ ও পৃথিবী লৌহবৎ বোধ হয়, বায়ু কালের নিঃশ্বাসবৎ শরীরকে জ্বালাইতে থাকে, তখন কি মনে হয়, শ্রাবণের গভীর ধারা তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে? কিংবা যখন বর্ষার মুষলধারে জল পড়ে, পৃথিবী জলমগ্ন হয়, নদী বন্যায় ভাসিয়া যায়, গ্রাম জন-শূন্য হয়, সংসার ধান্য-শূন্য হয়, মৃত্যুর চীৎকার উঠিতে থাকে, তখন কি মনে হয়, বসন্তের শশী আবার আকাশে উঠিবে? দক্ষিণ মরুত শান্তির ব্যজন হস্তে লইয়া শ্রান্তকে শীতল করিবে? মনে হয় না; অথচ যে নিয়মে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, সেই নিয়মেই শরৎ, হেমন্ত. শীত ও বসন্ত। যে নিয়মে প্রাণ শুষ্ক ও উপাসনা নীরস হইয়াছিল, অবস্থা শ্মশানের আকার ধরিয়াছিল, সেই নিয়মেই তৎসমুদয় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কলুটোলার সেই যে ত্রিতল গৃহ, তাহা বোধ হয়, অনেকেরই মনে আছে। সেই দুইটী প্রকোষ্ঠ, একটীর পর আর একটি ক্ষুদ্র ঘর, যাহার স্মৃতি জলেও ধৌত হয় না এবং আগুনেও পুড়িয়া যায় না। সেইখানে শুষ্ক উপাসনার স্বরের ভিতরে অপূর্ব্ব সংগীত শুনা গেল। কোন্ দিব্য মুহূর্ত্তে বলিতে পারি না, কিন্তু কঠিন অবস্থার ভিতরে স্বর্গ হইতে নারদের বীণা বাজিয়া উঠিল। মানুষের কণ্ঠে দেবতার ভাষা আসিল, স্বর্গের বর্ণ তাহার মুখশ্রীতে পতিত হইল। ব্রহ্মসমাজে যখন প্রথমে ভক্তি সঞ্চার হয়, তখনকার কথা অতি অপূর্ব্ব কথা। যেমন কোন মহাপুরুষ যখন শিশু ছিলেন, সেই শৈশবের কথা আমাদিগের জানিতে ইচ্ছাকরে, তেমনই ভক্তির স্বর্ণময় মন্দিরের দিকে

যখন তাকাইয়া দেখি, তখন ভক্তির আদি কথা জানিতে বাসনা হয়। কিন্তু তাহা দেখিতে দেখিতে যেন অলক্ষ্য স্থানের ভিতর মিশাইয়া যায়। কবে কোন্ সময়ে যে ঠিক্ ভক্তির সঞ্চার হইল, তাহা কে বলিবে ? তখন যে বাদ্য বাজিয়াছিল, কোকিলের শব্দ সে শব্দের কাছে কর্কশ, তখন যে দিব্যশ্রী নয়ন গোচর হইয়াছিল, প্রভাতের সৌন্দর্য্য তাহার কাছে মলিন। তখন আকাশ হইতে সূত্রের মত কিছু নামিল, স্বর্গ সংসারকে স্পর্শ করিল, ক্রমে ক্রমে ভক্তি সঞ্চারিত হইল। প্রথমে যখন এই খোল ক্রয় করা হয়, সংগোপনে বাজান হয়; প্রথমে সংকীর্ত্তনের এই গান হয়, "পাপে মলিন মোরা চল চল যাই রে, পিতার চরণে ধরে কাঁদিয়ে লুটাই রে।" তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের সে সকল মনে নাই। তোমরা নববৃন্দাবনের নবীন ভক্তিরস পান করিয়াছ, কিন্তু আমরা যখন প্রথমে পাপে মলিন হইয়া পিতার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া লুটাইয়াছিলাম, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ? ভক্তমণ্ডলী, তোমরা আজ সেই নাম-রহিত অনন্তকে কত নাম-যোগে সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছ, আমরা তখন 'জগদীশ্বর', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি ইষ্টকের মত শুষ্ক নাম গলায় বাঁধিয়া ভবসাগরে নামিয়াছিলাম। খোলের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে "পতিত-পাবন-ভকত জীবন বল্‌রে তোরা" রচিত হইল, নূতন নামের পর নূতন নাম আসিয়া পড়িল। হে খোল, তুমি অশ্রদ্ধার পাত্র ছিলে, শ্রদ্ধার পত্র হইলে, আদরের দ্রব্য হইলে। এই খোলের প্রবর্ত্তক প্রথমে খোলানুরাগী ছিলেন না; ব্রহ্মের ইঙ্গিতে তিনিই খোল আনয়ন করিয়া দম্ দম্ শব্দে আকাশকে বিকম্পিত করিলেন। এই করতালের ঝন্‌ঝনায় আমাদিগের কর্ণে তালি লাগিত, এখন করতাল বিনা চলে না। যাহা হউক, সেই ভক্তির শব্দের

মধ্যে ভাই ত্রৈলোক্য নাথের কোকিলকণ্ঠ-পরাজিত কণ্ঠ হইতে যে সুমিষ্ট ভাবের গান বাহির হইল, ভাই দীননাথের হস্তে খোল হইতে শব্দ উৎপন্ন করিয়া করিয়া যে মধুর সংগীত প্রসব করিল, তাহা আর কি বলিব? সেই একদিন, আর এই একদিন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-ভাগবতের প্রথম অধ্যায় লেখা হইল। তখন সংকীর্ত্তন ও খোলের শব্দ সকল স্থানে হইত না, আর সে দিনে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আট খানা খোল বাজাইয়া "অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি"—এই গান গাওয়া হইল। হা হরি, তোমাকে আবার লোকে তাড়াইবে? যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেইখানেই তুমি স্থির হইয়া অধিকার বিস্তার কর। তার পরে প্রথম ব্রহ্মোৎসবের কথা। এই যে ভক্তি, যার কথা বলিতেছি, এই যে পুষ্পমালা ও দীপের আড়ম্বর—এ সকল তখন ছিল না। ব্রহ্মমন্দির, কোথায় ছিলে? উপাসকগণ, তোমরাই বা কোথায় ছিলে? যে সময় নবীন পূজা আরম্ভ হইল, যথার্থ বলিতেছি, তখন যেন এক অভিনব জগতের দ্বার খুলিয়া গেল, উপাসনার আকার পর্য্যন্ত বদলাইয়া গেল। ঈশা যখন হার্ম্মন পর্ব্বতে যোগ-নয়ন উত্তোলন করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন দেখিতে দেখিতে তাঁর বস্ত্র সকল রজতবর্ণ ধারণ করিল, শ্মশ্রু ও বদন রূপার মতন ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তির প্রথম চিত্র যখন আসিল, জগদীশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি নাম-পূর্ণ আরাধনা প্রার্থনা নূতন অবয়ব ধারণ করিল, সমুদয় তখন নূতন হইয়া গেল। এক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্লোকের খনি খুঁড়িয়া কত স্বর্ণ মণি মুক্তা বাহির করা হইল। সেই সকল মণি মুক্তা এখন তোমরা ভোগ করিয়া জানিতেছ। এই সামান্য পুরাতন শ্লোক পঠিত হইল, আর এক একটি বর্ণের মধ্যে হইতে অমৃত ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভক্তির লাঠি লাগিয়া

"সত্যং জ্ঞানং" শ্লোক বিদীর্ণ হইল। কত যে আরাম, কত যে আশীর্ব্বাদ, কত ধ্যান যোগ সমাধি বাহির হইয়া আসিল, যে কেহ এই আরাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। আজ হিমালয় হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত, লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এই আরাধনার তরঙ্গ উঠিতেছে, এই আরাধনা-যোগে বৈকুণ্ঠ নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

ব্রহ্মোৎসবের পর কিছুদিন গত হইতে না হইতে মুঙ্গেরের ভক্তির অপরূপ কাহিনী। বাইবেল মধ্যে নিউ টেষ্টমেণ্টের সুমিষ্ট স্থান যেমন, মহাভারত মধ্যে গীতার মধুর স্থান যেমন, পুষ্পের ভিতর গোলাপ যেমন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মুঙ্গেরের ভক্তির ব্যাপার তেমনই। মুঙ্গের আর বাহিরের স্থান নাই; প্রিয় তীর্থ হইয়া অন্তঃকরণে রহিয়া গিয়াছে। সেই সকল উৎসব ও ভক্তির উন্মুক্ত স্রোত কার না মনে পড়ে? দেখিতে দেখিতে ভক্তি শতধা হইল। এই ভক্তি কখনও শান্ত, কখনও মধুর, কখনও করুণ-রসের উচ্ছ্বাস হইয়া প্রেমাশ্রু আনয়ন করিয়াছে। এই ভক্তি কখনও উৎসাহ এবং মত্ততার আকারে আসিয়া ভক্তদিগকে এমনই বীর করিয়া তুলিয়াছে যে, তাঁহাদিগের ভীমশব্দে এই মহানগরী বিকম্পিত হইয়াছে। এই ভক্তির উৎসাহ ঊর্দ্ধে নিশান আকার ধরিয়া উড্ডীন হইয়াছে। এমন সকল প্রার্থনা এই ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে বাহির হইয়াছে যে, তাহাতে হৃদয় মোহিত হইয়া যায়। এই ভক্তিই আবার প্রচারিত হইয়া দেশ মাতাইয়াছে। হে ভক্তমণ্ডলী, তোমরাই বলিতে পার, ভক্তির নানা ভাবতরঙ্গ আমাদিগকে কিরূপে ভাসাইয়াছিল। কে জানিত, বৈষ্ণবদিগের প্রবর্ত্তিত এই খোল ঊনবিংশতি শতাব্দীতে আমাদিগকে মাতাইয়া এমনিই করিয়া তুলিবে? কথা বাড়িয়া যাইতেছে। তারপর যখন ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, প্রথম নগরকীর্ত্তন রাজধানীর রাজপথে বাহির হইল,

কত ভেরী, কত তুরী, কত বাদ্য বাজিতে লাগিল; আর সেই সংকীর্ত্তনের গানের কি মহান্ ভাব! "এত দিনে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম, হল দুঃখ অবসান" এই সংকীর্ত্তনের শব্দে যথার্থই সে দিন কলিকাতায় এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর আবার যে সময় ব্রহ্মমন্দিরের ছাদ হইল, ব্রহ্মমন্দিরে আমরা প্রবেশ করিলাম, আমাদিগের আত্মা-পক্ষী ব্রহ্মপক্ষীর পক্ষপুটচ্ছায়াতে আরাম প্রাপ্ত হইল। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ সাল; চারি বৎসর কাল চলিয়া গেল। আমাদের নেতা পৃথিবীর অন্য ভূভাগে মহাকীর্ত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ফিরিয়া আসিয়া সকর্ম্মক ভক্তির ব্যাপার দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভক্তি দুই প্রকার; অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক। হরিনাম গানে প্রমত্ত নারদের আর অন্য কাজ নাই; বনে উপবনে ফিরিয়া কেবলই গান করিতেছেন, "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।" যাঁরা ভক্তিজলে নিমগ্ন হইয়া কাজ ভুলিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা হইয়াছে; বিধান-ভাগবতের ভক্তি সেরূপ নয়। নববিধানের ভক্তি সকর্ম্মক; অকর্ম্মক নয়। আমা-দের নেতা প্রত্যাগত হইয়া যখন বন্ধুবান্ধবের ভিতরে মিশিলেন, সেই ৭০ সালের শেষ ও ৭১ সালের প্রথম হইতে, যে কি কার্য্যের কোলাহল উঠিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পুরীতে স্নানযাত্রার সময় যেমন ভিড়, তেমনই কার্য্যের ভিড় হইল। এদিকে স্ত্রীবিদ্যালয়, ওদিকে বালক-দিগের বিদ্যালয়, এ দিকে কেহ কেহ অস্ত্র সকল লইয়া শারীরিক কার্য্যে ব্যস্ত, ওদিকে বিবাহবিধির আইন লইয়া কত কাণ্ডকারখানা, এদিকে দেশসংস্কার সভা, ওদিকে জনসাধারণের মধ্যে সহজে জ্ঞানবিস্তারের পন্থা আবিষ্কার, এইরূপে ভয়ানক কার্য্যের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, এরাই না সেদিন পাদুকাবিহীন হইয়া খোল বাজাইয়া পথে পথে

ভ্রমণ করিতেছিল? তখন আমাদিগের কেহ কেহ নিজের হাতে বাটালি প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন; কেহ সংবাদপত্র লিখিয়া রাত কাটাইতেছেন. কেহ নগরের পথে পথে সেই সংবাদপত্র বিলি করিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ বা স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঠিক যেন ব্রাহ্মসমাজের মানে তখন এক প্রকাণ্ড কার্য্যালয় হইয়া দাঁড়াইল। ভক্তি অন্তঃশীলা হইয়া প্রকাণ্ড কার্য্যাড়ম্বর বিস্তার করিল। তাহা দেখিয়া ইংরাজেরাও বাহবা দিল। বাঙ্গালীরাও বলিল, একি ব্যাপার! লাট সাহেবের পর লাটসাহেব পর্য্যন্ত আমাদিগের সংবাদ লইতে লাগিলেন। লাটসাহেব কন্যা পরিবার লইয়া দেখা করিতে আসিলেন। লোকে মনে করিল, ব্রাহ্মসমাজ বুঝি কার্য্যের মধ্যে ডুবিবে। চারি বৎসর চলিয়া গেল, কার্য্যের প্রকাণ্ড প্রবল স্রোত ১৮৭৫ সালে ফলবান্ হইয়া কত মান্য, কত কীর্ত্তি প্রসব করিল। হঠাৎ বৈরাগ্যের আকাশে কাল মেঘ উঠিল, যোগের প্রকাণ্ড অবয়ব দৃষ্টিগোচর হইল। আজ আকাশ হইতে যে যোগ ভক্তি আসিয়া গঙ্গা যমুনার ন্যায় এখানে মিশিতেছে, ইহা সেই সময়ের সাধন ও উপাসনার ফল। হে ভাগবত-শ্রোতা, ভাবিয়া দেখ, যখন বৈরাগ্যের প্রথম উদয় হইল, তখন কিরূপ আহারে নিয়ম, শয়নে নিয়ম, কথাবার্ত্তায় নিয়ম। তার উপরে আবার যোগের নিয়ম। ঠিক যেন হিমালয় হইতে নিয়মের এক নদীস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তার পরে যোগ ঘনীভূত হইয়া আসিল। সেই যোগবল বনমালীকে কি প্রকাশ করে নাই? প্রিয় আচার্য্য সমভিব্যাহারে পুষ্পলতার সঙ্গে মিশিয়া কি আমরা সেই ভুবনেশ্বরকে দেখি নাই? জলে বরুণকে, হোমাগ্নি ও সূর্য্যে তপনের তপনকে, নারীতে মহা মাতাকে, গোলাপের মধুর হাস্যে সেই প্রিয় গোপালকে কি সেই যোগ

প্রকাশ করে নাই? তেত্রিশ কোটী দেবতার কথা কি বল? তিন শত তেত্রিশ কোটী অনন্তের প্রকাশে পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছিল। হে একতারা, ভদ্রসন্তানের হাতে তুমি কিরূপে শোভিত হইলে? বেহালা, সেতার, তানপুরা ছাড়িয়া ব্রহ্মযোগী একতারা লইলেন কেন? যখন একতারা বাজাইতে লাগিলে, বল দেখি, তখন ভবের সমস্ত সম্বন্ধ ভুলিয়া গেলে কি না? যেখানে "আমি আছি, আমি আছি" শব্দে আর সব স্তব্ধ, সেই নিভৃত সুন্দর প্রদেশে কি চলিয়া গেলে না? আমাদিগের সেই ধ্যান, যোগে; যোগ, সমাধিতে; সমাধি ঈশ্বরেতে আমাদিগকে লীন করিল। বহির্ম্মুখ যোগ ক্রমে অন্তর্মুখ হইয়া চিদানন্দ-সিন্ধুতে মগ্ন হইল। কীট মানবকে পৃথিবী হইতে তুলিয়া স্বর্গবাসী করিল। মনে হয়, এই সাধনকালের উপাসনা কি চমৎকার হইয়াছিল। ক্রিয়াবিশিষ্ট যোগ, সাধন ব্রতকে ও আমাদিগের এই যুগধর্ম্মকে কি অপার বিচিত্র ভাগবতে পরিণত করিয়াছে। সেই খানেই কি যোগ শেষ হইল? তার পরে যোগ বলিল, আমি পাপহারী ঈশ্বরের সঙ্গে পতিত মানবকে একত্র করিয়া কীর্ত্তি করিলাম, এখন মর্ত্ত্যেতে আরও অনেক কীর্ত্তি করিব। আমি সকল সাধনের সমন্বয় করিব। কেহ হইলে যোগী, কেহ হইলে জ্ঞানী, কেহ হইলে ভক্ত, কেহ হইলে কর্ম্মী। তখন যোগীর যোগ, জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, ও কর্ম্মীর কর্ম্ম সব একীভূত হইয়া নব ভাগবতের রচনা আরম্ভ হইল। সমস্ত একত্রিত হইয়া একটা নূতন ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। ইহাতেই কি সমাপ্ত? অবশেষে শাস্ত্র সকলের মধ্যেও সমন্বয় হইল। কেহ বাইবেল গ্রাহ্য করিত না, কেহ কোরাণকে আদর করিত না। হে যুগধর্ম্ম, বেদ, বেদান্ত, বৌদ্ধ, সকল শাস্ত্রের তুমিই সমন্বয় করিলে। কোরাণ, বাইবেল আর পরিত্যক্ত রহিল না।

মহাযোগ বলিতে লাগিল, "আন, সকল শাস্ত্রকে আন ; যোগের সিংহাসনে সাজাও ; মধ্যে মধ্যে নববিধানের নিশান পোঁত, তাহারই ছায়া পড়ুক ; সকল শাস্ত্র, সকল সত্য নৈবেদ্য-স্বরূপ হইয়া অনন্তের চরণে উৎসর্গীকৃত হউক।" এইরূপে শাস্ত্র-সমন্বয় হইলে, যোগী প্রেরিত ঋষিরা বলিলেন, আমরা যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলাম, আমাদিগের কি আদর নাই ? অমনি পূর্ব্ব পিতামহদিগকে আহ্বান করা হইল, তাঁহাদিগকে প্রণাম করা হইল। যখন সেই ভক্তি, কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও যোগ সাধনের পর সকল সাধনের, সকল শাস্ত্রের, সকল সাধুর সমন্বয় হইল, তখন ভক্ত-মণ্ডলী দেখিলেন, এ যে এক নূতন ধর্ম্ম হইল। পূর্ব্বে পৌত্তলিকতাপূর্ণ দেশে আমাদিগের এই ধর্ম্মের অভিনয় ছিল, কিন্তু তার পর আবার একি হইল! এ যে সকল ঋষি, যোগী আসিয়া যুগধর্ম্মের আকাশ ঘেরিয়া ফেলিলেন। এই সময়েই নববিধান ঘোষিত হইল। ক্রমে নানা ভাব প্রার্থনা উপাসনাতে আসিয়া প্রচারিত ও সংস্থাপিত হইল। ভাবিতে গেলে, বলিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই ধর্ম্মের উপন্যাস বলাও যা, আর একজনের জীবন-উপন্যাস বলাও তা। কার চরিত্রের বলের মধ্য দিয়া যুগধর্ম্ম দেখা দিল ? কার চরিত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের মধ্যদিয়া এই যুগধর্ম্মের নানা প্রকার সামগ্রী আসিয়াছে ? কার কণ্ঠরবে সকল ঋষির কণ্ঠ একত্রিত হইয়াছে ? কার নয়ন-ধারাতে সহস্র চক্ষুর অশ্রু নিপতিত হইয়াছে ? কার ভীমরবে ক্ষীণ বীর্য্য বাঙ্গালী সন্তানেরা ভীমরব করিয়াছিল ? সে রব কোথায় ? অর্গান আছে, গান আছে, গায়ক আছে, এক শব্দের নিস্তব্ধতায় সব নিস্তব্ধ। সেই দীপমালার আলোক আছে, সবই আছে, কিন্তু একজনের অভাবে সব নিদ্রিত। আহা, যে ধর্ম্মরাজ্যে এত যোগ, এত ব্রত, এত কর্ম্ম, এত উৎসব, তাহা কি অকালে বিনষ্ট

হইবে? সকলই অগ্নির মত আজও জ্বলিতেছে, কালের বৃষ্টিতে তাহা কি নির্ব্বাণ হইতে পারে? সেই মহেশ্বর যিনি বাম হস্তে ভূতকালের জটা ধরিয়া আছেন, ও দক্ষিণ হস্তে ভবিষ্যতের কেশাকর্ষণ করিতেছেন, তিনিই একমাত্র সহায় ও রক্ষক। যদুকুল বিনষ্ট হইবার কথা আমরা শুনিয়াছি; পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়া যদুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের যে এই কুল, ইহা মানবের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নয়; অনন্ত ঈশ্বর ইহার আদি অন্তে রহিয়াছেন। এই ছাপ্পান্ন বৎসর যে যুগধর্ম্ম ভাগবত লিখিত হইতেছে, শত সহস্র কোটী বৎসর তাহা আরও লিখিত হইতে থাকিবে। নিহত হব, এ ভয় রাখি না; তবে ভয় হয়, তিক্ত পরীক্ষাতে বুঝিবা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে। আজ সেইজন্য আপনাদের অসদ্ভাব দমন করি। অনন্তের কৃপাজল মণ্ডলীর মস্তকে বর্ষিত হউক; সকল কুভাব নিবিয়া যাক্; অদ্যকার সম্মিলন ভবিষ্যতের নিগূঢ়তর স্থায়িতর সম্মিলনে পরিণত হউক।

চরিত্র।

(ভাদ্রোৎসব)

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই ভাদ্র ১৮১৮ শক ;
২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

শান্তিদাতা পরমাত্মা এই মণ্ডলীর আত্মাতে অবতীর্ণ হউন। মঙ্গলময়ের অশেষ আশীর্ব্বাদে এই উপাসকমণ্ডলীর আত্মা পরিশুদ্ধ হউক। এই ভগ্ন মণ্ডলীতে কৃপাময়ের শুভ অভিপ্রায় অবতরণ করিয়া, এই খণ্ড বিখণ্ড হৃদয়গুলিকে অখণ্ড একাত্মাতে পরিণত করুক। সকলের প্রাণের আগ্রহ খুলিয়া যাউক। সকল হৃদয়ের ব্যাকুলতা ব্রহ্মকৃপার হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাউক।

আমার এই ক্ষীণকণ্ঠ উপস্থিত উপাসকদিগের হৃদয়যন্ত্রে সুমধুর সঙ্গীত উৎপাদন করিতে পারিবে কি না জানি না। তবে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, এখন এই মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা তাঁহার গভীর আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করুক, এখন এই হৃদয় হইতে যে ভাব প্রকাশিত হইবে, তাহা তাঁহারি উজ্জ্বল আলোক-সমন্বিত হউক।

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের অনেক সময় লইব না। সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব।

লোকের সম্মুখে যে ধর্ম্মকথা বলা যায়, তাহাতেই কি মনের সমস্ত ভাব নিঃশেষিত হইয়া যায়? না, লোকাতীত এমন অনেক কথা থাকে, যাহা অন্তরাত্মার নিকট নির্জ্জনে প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না? অন্তরাত্মার নিকট যে সকল কথা বলা হয়, তাহাও কি তাঁহারই নিকট ফুরায়? না,

তাহার প্রভাব ও তেজে লোকসমক্ষে যে জীবন কাটান যায়, তাহাকে আলোকিত করে? এই গভীর ধর্ম্ম কি গুহায় নিহিত? তাহা কি বাহিরে প্রকাশ পায় না? ইহা কি ধর্ম্মবিধান-স্বীকারেই পরিসমাপ্ত? বাহিরে ইহার প্রমাণ ও প্রকাশ কি অব্যাহত নহে?

আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই, ধর্ম্মের দুইটি ভাগ; একটি লৌকিক, অন্যটি আধ্যাত্মিক। এই লৌকিক ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম ধর্ম্ম মধ্যে এত পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে যে, এই উভয়কে সম্মিলিত করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। বাহিরের অবস্থাতে ইহার সম্মিলন ও ঐক্য সম্ভবাতীত মনে হইলেও, ইহার সামঞ্জস্য কি হইবে না? অবশ্যই হইবে। যদি না হয়, মনে করিতে হইবে, সংসারে ভগবান্ বাস করেন না। কেবল আমাদের উদ্‌যোগ ও চীৎকারেই কি ধর্ম্ম পরিসমাপ্ত? পৃথিবীর কত স্থানে এইরূপ অসার ধর্ম্মের আড়ম্বর ও কোলাহল উঠিল; এই ভারতেরও কত স্থানে কত বাহ্য আড়ম্বরের চূড়ান্ত হইল। কালের বাতাসে এই সমস্তই ছাইয়ের মত উড়িয়া গিয়াছে; আত্মাকে স্পর্শ করিয়া, আত্মাকে অধিকার করিয়া অধ্যাত্মসম্পদরূপে পরিণত হয় নাই।

ইতিহাসের যেমন দুইটী অংশ—এক অংশ ধর্ম্ম, আর এক অংশ জাগতিক ব্যাপার, জীবনেরও তেমনি দুইটি বিভাগ—একটি ধর্ম্মজীবন, অপরটি সাংসারিক জীবন। এই তত্ত্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি গ্রামে, পল্লীতে পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে। সকলের অন্তরের ধারণা এই, এ দুই চিরকাল দুই রকম থাকিবে; ধর্ম্মে ও সংসারে মানুষ এক হইবে না; অন্তর ও বাহিরের গতি কখনও এক দিকে হইবে না, আত্মার গভীরতার বিকাশ লৌকিক ব্যবহারে পরিলক্ষিত হইবে না। আমরা এই দুইয়ের

ব্যবধান ও পার্থক্য ভাঙ্গিয়া এক করিতে চাই। আমাদের মনের ইচ্ছা —ভগবানের প্রেরণা, অন্তরের আবেগ—তাঁহাকে পাইবার আগ্রহ, জীবনের সমস্ত কার্য্য—সেই পরম নিয়ন্তার প্রভাব, বাহিরের চেষ্টা উদ্‌যোগ—অন্তরের গভীর ভাব প্রকাশ মাত্র। অতএব মানবের অন্তর ও বাহিরে ব্রহ্মজ্যোতি ব্রহ্মবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। অধ্যাত্মরাজ্যের কথা ছাড়িয়া দাও, এই বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইহার কোন্ তারকাতে তাঁহার জ্যোতি নাই, ইহার কোন্ সৈকতে, কোন্ বনস্পতিতে, কোন্ শস্যক্ষেত্রে পরমেশ্বরের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে না? জগন্ময় এই একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আনন্দ ও শান্তি। এই জড় চৈতন্যময়ের প্রকাশের প্রদীপ্ত আলো। যদি ইহা দেখিতে না পাও, তুমি জড়ে জড়িত হইবে; কিন্তু যদি তাবৎ সৃষ্টির ভিতরে, জীবনের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে চৈতন্যময় মহান্ আত্মাকে দর্শন কর, তবে তোমার নিকট জড় ও চৈতন্যে প্রভেদ কি রহিল! অতএব বাহির অন্তরকে এক কর। বাহিরে ভগবানের আত্মপ্রকাশরূপ সৌন্দর্য্য, বিধাতার বিচিত্র ইচ্ছাময় হস্তের লেখনী দ্বারা, তোমার অন্তরে চিত্রিত আছে, দর্শন কর; অন্তরে ভগবানের প্রসাদরূপ ধর্ম্মভাবের সমস্ত গভীরতা বাহিরে প্রকাশ হইতে দাও। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মহাজ্যোতিতে সমস্ত পরিপূর্ণ হউক।

বেশি বলিব না। আর একটী কথা এই যে, ধর্ম্মের অন্তর্মুখীন গভীরতা ও বহির্মুখীন অনুষ্ঠান কিরূপে মিলিত হয়, কিরূপে সমস্ত বাহ্যদৃশ্য, সমস্ত জীবনের কার্য্য অন্তরের ঐশ্বর্য্যে পরিণত হয়, কিরূপে আন্তরিক ধর্ম্মের গভীরতা জীবনের প্রভাব ও দীপ্তিরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়, ইহার মূল কি? সকলে বলিবেন ব্রহ্মকৃপা। যদি ব্রহ্মকৃপা সমাগত হইল, আর যদি আত্মা ব্রহ্মইচ্ছার অধীন হইল, তবে আমি আকাশের উপরেই ভ্রমণ করি, আর

গভীর পাতালেই নিপতিত হই, একাকী বিজনে বসতি করি, অথবা এই নববিধানমণ্ডলী-মধ্যগত হই, সর্ব্বত্র সেই মহাদেবদর্শনে আনন্দিত থাকি। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ, অন্তরের ধর্ম্ম ও বাহিরের ধর্ম্ম ব্রহ্মকৃপাতে এক হয়।

কিন্তু বায়ু যথেচ্ছ গমন করে, তুমি তাহার শব্দ ও স্পর্শ মাত্র অনুভব কর, কোথা হইতে বায়ু আসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, কিছুই জান না। তেমনি এই ব্রহ্মকৃপা কোথা হইতে কখন আসে, কিরূপে কার্য্য করে, আবার কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়, তুমি তাহার কি জান? শ্রান্ত পথিক যেমন গৃহে গমনের প্রতীক্ষা করে, তৃষিত চাতক যেমন জলের জন্য ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া থাকে, আমরাও ব্রহ্মকৃপার জন্য তেমনি সতৃষ্ণ হইয়া তাকাইয়া থাকি। অন্তরের ব্যাকুলতা সহকারে প্রতীক্ষা করি। কিসে তিনি প্রকাশিত হইবেন, কিসে তিনি অবতরণ করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবেন, আমরা জানি না। কেবল এইমাত্র জানি, তাঁহার পদচিহ্ন না দেখিলে, তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে না পারিলে, সাধন ও ধর্ম্মমণ্ডলী অসার।

মানিলাম, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"—ব্রহ্ম কৃপা ভিন্ন কিছু হইবার নহে; তথাপি তোমার আমার কি কিছু কর্ত্তব্য নাই? ঊষর ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সমুচিত পরিশ্রম সহকারে কৃষক যদি তাহাতে হল চালনা করে এবং তাহার এই চেষ্টা ও শ্রমের সঙ্গে যদি আকাশেয় বারিধারা সংযুক্ত হয়, তবে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তেমনি তোমার শুষ্ক আত্মা কিছুই উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত না হইলেও, যদি তুমি চেষ্টা কর, সাধনা দ্বারা কর্ষণ কর, এবং ব্রহ্মকৃপা তাহাতে মিলিত হন, তবে আত্মা প্রচুর শস্যশালী হইতে পারে।

এই চেষ্টার অর্থ কি? সহজে বলিব? চরিত্র। চরিত্র বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়ই। কেবল চরিত্রে—ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয় চরিত্রে। ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছার জয় প্রকাশের ভূমি চরিত্র। সৎকার্য্যের দৃষ্টান্ত সাধু আদর্শরূপে পরিণত হইয়া যান কেবল বিশুদ্ধ চরিত্র দ্বারা। যদি চরিত্রকে ভুলিয়া যাও, উপরে আকাশ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, নিম্নের গভীর পাতাল তোমাকে গ্রাস করিবে। ভিতরে কথা বলিবার একজন মুনি দিবানিশি বসিয়া আছেন, তিনি যদি তোমার চরিত্রে মলিনতা দেখাইয়া দেন, তুমি কোটী বার ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়া কি করিবে? ধর্ম্মমণ্ডলীর সঙ্গলাভে কি ফল হইবে? যদি এক হস্তে ব্রহ্মকৃপা এবং অপর হস্তে চরিত্রের আলো ধারণ কর, তবে এমন কোন্ দৈত্য আছে তোমাকে সংহার করিবে? এমন কোন্ স্বর্গ আছে, যাহা তোমার অর্জ্জিত হয় নাই?

আবার যদি চরিত্রের বল থাকে, তুমি তাহাতেই অন্ধ হইয়া ব্রহ্মকৃপা না দেখ, সমস্ত দিন রোদন করিলেও তোমার কিছু লাভ হইবে না, শান্তি ও আলোক পাইবে না; অশান্তি অন্ধকারে ডুবিবে। ক্রমে আত্ম-ইচ্ছার চঞ্চল বায়ু তোমার চরিত্রের আলো, নিশা শেষের আলোকের মত নির্ব্বাণ করিবে; সংসারের মোহে তুমি আচ্ছন্ন হইবে। পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কৃপাবান্ হইয়াছেন, আরও কৃপাবান্ হউন। আমাদের চরিত্র তাঁহার কৃপালাভে চিরবিশুদ্ধ হউক। তাঁহার কৃপাবলে আমরা বিশুদ্ধ-চরিত্র হইয়া অন্তর বাহিরে জীবনময় জগন্ময় তাঁহারি প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হই।

কৃপণ যেমন ধনের জন্য, বন্ধ্যা যেমন সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়—হে কৃপাময় পরমেশ্বর, আমরা চরিত্র জন্য তোমার কৃপার্থী হইয়া তেমনি ব্যাকুল হই। প্রভু, তোমার কৃপা চরিত্রে কখনও আসে নাই, এমন নহে।

এই পাপান্ধকার-পূর্ণ অন্তরে শুদ্ধতার আগুন কখনও প্রজ্বলিত হয় নাই এমনও নহে। কিন্তু প্রভু, সর্ব্বক্ষণ তোমার কৃপা ভিন্ন কে পবিত্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারে? তাই আজ, হে কৃপাময়, তোমার নিকট এই ভিক্ষা করি, তুমি আমাদের চরিত্রকে বিশুদ্ধ কর, অভিপ্রায়কে পবিত্র কর, হৃদয়কে সদ্ভাবে পরিপূর্ণ কর, হস্তকে সৎকার্য্যে নিযুক্ত কর। জড়ের সহিত অজড়কে মিলিত কর; অন্তর ও বাহির তোমার প্রভাবে একাকার হউক। আমরা যাহাতে তোমার অশেষকৃপা আত্মস্থ করিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারি, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। হে শান্তি-দাতা, তোমার চরণাশ্রয় দিয়া আমার পুরাতন ভ্রাতৃগণ ও এই সমবেত উপাসক-মণ্ডলীকে রক্ষা কর, এই তোমার নিকট ভিক্ষা করি।

শান্তিকুটীর।

নিত্য নূতন আগ্রহ।

(মাঘোৎসব)

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১১ই মাঘ, ১৮১৯ শক ;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, হে প্রিয়তম ভাইগণ, হে স্নেহের ভগিনীগণ, আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে তোমরা কোথায় ছিলে? এমন বৃদ্ধ এখানে কেহ আছেন কি না, যিনি আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন! তোমরা এখানে ছিলে না। কোথা হইতে কোন্ অদৃশ্য অজানিত শক্তিবলে তোমরা এখানে আসিলে, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে, হে বিশ্বাসিবংশ, তোমরা উৎপন্ন হইলে, বলিতে পার কি? অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে কোন্ প্রবাহিত ধারার শক্তিতে, কোন্ বিস্ময়কর কৌশলে এই বড় প্রকাণ্ডকায় মানুষ হইলে, তাহা কিছুই জান না। কাহা হইতে কোন্ সংগুপ্ত প্রণালীদ্বারা অস্তিত্ব লাভ করিলে, কিছুই ত বলিতে পার না। উৎপত্তির আদি অন্ত কেহ জানে না। ভ্রূণতত্ত্ব পর্য্যালোচনা কর; উহার আদি অন্ত কিছুই বুঝিতে পারিবে না। কবে কোন্ অভিপ্রায় সত্তারূপ ধারণ করে, দেহের অবয়ব সংগঠিত হয়, কবে তাহাতে প্রাণ, আত্মা সংযোজিত হয়, ইহার ইতিহাস কেহ অবগত নহে। চল্লিশ বৎসর কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমরা কোথায় ছিলে, কোন্ সমাজ-ভুক্ত ছিলে, কোন্ বাসনা অন্তরে পোষণ করিতে, কি আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া দিন কাটাইতে, জীবনের কি উদ্দেশ্য, কি

আগ্রহ, কি প্রার্থনা ছিল? হে ব্রহ্ম-পরায়ণা ব্রাহ্মিকাগণ, আজ তোমরা কোন্ পুণ্যতীর্থে আসিয়াছ? এইক্ষণে তোমরা কোন্ জাতি, তোমাদের অন্তরের বাসনা কামনা কি? কোন্ আহ্লাদ আমোদ ভাল বাস? বল, কোন্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আজ এখানে আসিয়াছ? হে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকাগণ, পরিণতির ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে কোন অজ্ঞাত শক্তিবলে অদৃশ্য কোন বস্তু মাতৃ-কোলে ভূমিষ্ঠ হয়, এবং সেই বস্তু সেই অজানিত শক্তির প্রভাবেই রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে। ক্রমে ইহার মধ্যে আত্মার বিবিধ কামনা প্রকাশ পায়। ইহাতে বিশ্বাস ও প্রার্থনা আসে। ক্রমে ক্রমে প্রেম, ভক্তিতে উন্নত হইয়া ইহা শ্রীমান্ কেশব চন্দ্রের মূর্ত্তি ধারণ করে। এই যে মনুষ্য-তত্ত্ব, ইহা সামান্য নহে। ইহাই অমরত্বের তত্ত্ব, ইহাই পরলোকের শাস্ত্র।

এই মানব-জীবনের ইতিহাসে, উন্নতি অবনতির পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা অনেক দেখিতে পাইবে। শতবার পরিবর্ত্তন দেখিবে, কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূল উন্নতি। এই কিছু দিন পূর্ব্বে শীতের প্রভাবে সমস্ত তরু লতা পত্র-পুষ্প-বিহীন হইয়া, প্রকৃতি-রাজ্যকে কেমন হতকান্তি করিয়াছিল, ইহাতে কত নির্জীব ভাব দেখা যাইত। আবার কোন্ শক্তিতে শীতের প্রভাব কমিয়া গেল, আবার কোন্ কৌশলে বসন্ত সমাগত হইল, সেই শুষ্ক প্রায় আম্রশাখাতে নূতন মনোহর মুকুল দেখা দিল। গাছে লতায় নূতন পাতা, নূতন ফুল; আনন্দে ভ্রমরগণ ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া মধু আহরণ করিতেছে, আনন্দ-পূর্ণ কণ্ঠে বিহঙ্গগণ আবার নূতন সঙ্গীত গাহিতেছে। বসন্তের শোভা ও সমৃদ্ধিপূর্ণ প্রকৃতির উৎসবে কাহার না মন মুগ্ধ হয়? প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য্য শীতে প্রচ্ছন্ন ছিল। শীত চলিয়া গেল, আবার তাহা প্রাকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। মানব-

জীবন ও এই নিয়মের অধীন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ কত শক্তি পাইয়াছিলেন; এখনও কত শক্তি পাইতেছেন; আমরা কয়েকটী বৃদ্ধ এই শ্বেত শ্মশ্রু লইয়া এই সাক্ষ্যদান করিতে পারি, যাহা পাওয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাইবার অবশিষ্ট আছে। তোমাদের পাইবার অন্ত নাই। এই ব্রহ্মলাভের পথ জীবনে আরম্ভ, মৃত্যুতে প্রচ্ছন্ন হয়। হে ব্রাহ্মগণ, যেরূপ উপাসনা করিয়া এই ব্রহ্ম-সহবাস লাভ করিয়াছ, যেরূপে তাঁহাকে ডাকিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছ, যেরূপে তাঁহাতে মগ্ন হইয়া জীবনে ধন্য হইয়াছে, আর কি সেই ভাবে তাঁহাকে ডাকিবে না? আর কি ভক্তির হস্ত প্রসারণ মরিয়া সেই ভাবে সেই চরণ জড়াইয়া ধরিবে না? আর কি সেই প্রেম-অশ্রুতে তাঁহার পবিত্র চরণ ধুইয়া দিবে না?

এই আটষট্টি বৎসরে তোমরা কত ভোজন করিলে, কত প্রেম, ভক্তি, যোগ, সেবা সাধন করিয়া আত্মস্থ করিলে, কত উপাসনা, প্রার্থনা, কত উৎসব করিলে; কিন্তু যদি বলিতে হয়, এখনও এই বলি, আজও সাধনের ক, খ, শিক্ষা হয় নাই। প্রেম, ভক্তি, যোগ, সমাধি, ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মেতে আত্মবিক্রয় এই সমস্ত ভোজন করিবার জন্য পাত পাতিয়া বসিয়াছি মাত্র। আরও কত প্রসাদ পাইব, কত ভোজন করিব, কত উন্নতি লাভ করিব, তাহার অন্ত নাই। দুই দিন আহার কর নাই বলিয়া বলিতে পার না যে, তোমার জন্য আর আহার্য্য আসিবে না; একদিন ব্রহ্ম-সহবাস পাও নাই বলিয়া, এমন মনে করিতে পার না যে, আর ব্রহ্ম তোমাকে কোন দিন দেখা দিবেন না। তেমনি পাঁচ সাত বৎসর বাহিরে কোন উন্নতি যদি নাও দেখিতে পাইয়া থাকি, তবুও বলিতে পারি না যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে, কেশবচন্দ্রও অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও

বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এ যে অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম, ইহা কিছু কাল নিষ্প্রভ ছিল বলিয়া, বলিতে পারি না, ইহার উন্নতির পথ চির অবরুদ্ধ হইয়াছে।

এই যে উন্নতির ধর্ম্ম, যাহা আরণ্যকগণ বৈদিকগণকে এবং বৈদিকগণ পৌরাণিকগণকে দিয়া গিয়াছেন, এবং যে উন্নতি বংশপরম্পরা আমাদের জীবন-ললাট পরিশোভিত করিয়াছে, তাহা কি চলিয়া যাইবে? কোন্ সমুদ্র আছে যাহাতে জোয়ার ভাঁটা নাই, কোন্ চন্দ্র আছে যাহাতে অমাবস্যা নাই? এমন যে তেজোময় সূর্য্য, তাহাকেও ত এই গতকল্য রাহুগ্রাসে পড়িতে হইল; তবে এই জীবনে কেন জোয়ার ভাঁটা থাকিবে না, উন্নতি অবনতি থাকিবে না? এই জগতের স্বভাবের শোভাতে ঋতু সকলের কত পরিবর্ত্তন! পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে কিছুই বিনষ্ট হয় না। একবার অদৃশ্য হয়, আবার প্রকাশিত হয়। হে ব্রাহ্মগণ, এই মণ্ডলী দুই দিনের ঝড়ে এবং শত্রুর আক্রমণে আড়ষ্ট বলিয়া তোমরা কি নিরাশ হইবে? ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি দেখিবে না? যাঁহার শক্তি সমস্ত অসারকে সার করে, যাঁহার শক্তি সমস্ত মৃতকে ডাকিয়া জীবন দান করে, যিনি তোমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে কি ভুলিবে? এক রাত্রির ঝড়ে ও আঁধারে কি জীবন-তরি ভীষণ কালসাগরে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইবে? হে বন্ধুগণ, ইহকালে এই সামান্য পরিবর্ত্তনে, এই সামান্য বিষয়ে যাহারা স্থির থাকিতে পারে না, পরলোকে তাহাদের বিশ্বাস কি? এই যে অনন্ত উন্নতির শাস্ত্র, ইহা ইহপরকালে পূর্ণ হয়। আবার বলি, হে ব্রাহ্মগণ, হে সাধকগণ, হে প্রচারকগণ, ভাবিয়া দেখ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই নববিধান কোথায় ছিল? আর এই পঁচিশ বৎসরে ইহাতে কত নূতন ব্যাপার! এই নববিধানের আগমনে সমস্ত পুরাতন ধর্ম্ম নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বসন্তের

আগমনে যেমন সমস্ত পুরাতন বৃক্ষ লতা নূতন বেশে সজ্জিত হয়, সমস্ত পুরাতন পাখী নূতন স্বরে সঙ্গীত করে, তেমনি নববিধানের প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর বিবিধ ধর্ম্ম নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদের জীবনের কত পুরাতন ভাব নূতন হইল। নূতন পথে নূতন প্রণালীতে আমরা ভগবানের কৃপা ও সহবাস সম্ভোগ করিয়া সুখী হইলাম। প্রত্যেক রজনীতে নূতন চন্দ্র, প্রত্যেক ঋতুর নূতন শোভা, প্রত্যেক দিবসের নূতন ভাব। তেমনি প্রতিদিনের উপাসনা নূতন হউক। প্রতিদিনের সাধন নূতন হউক। পৃথিবীতে কিছুই পুরাতন নাই, সকলই নূতন, তোমাদের জীবনও নিত্য নূতন হউক। হে সাধকগণ, নিত্য নূতন আগ্রহে উন্নতির পথে আরোহণ কর। যখন পরলোকের উন্নতির কথা মনে করি, তখন আমি চিন্ময় হইয়া, সেই অপার অনন্তে বিলীন হই। যখনি ব্রহ্ম-সহবাস লাভ করি, তখনি আমার সমস্ত অসারত্ব ভুলিয়া যাই। যে ধর্ম্ম এমন আশা ও আনন্দের সংবাদ বহন করে, তাহাতে কি তোমরা নিরাশ হইবে ? এই দুই দিনের অমিল দেখিয়া কেন মনে করিতেছ, আর ধর্ম্ম নাই ? আজ এই ব্যাপারে, এই মহা সম্মিলনের দিনে ইচ্ছা হইতেছে, স্বর্গের আচার্য্য অগ্রজ কেশবচন্দ্রকে ডাকিয়া আমাদের মাঝখানে বসাই। তিনি এই উৎসব-বেদীতে, এই বৃক্ষতলে বসিয়া, এই সকল ব্যাকুল ভাই ভগিনীগণকে লইয়া মা আনন্দময়ীর নাম করুন। সেই ভক্তি-বিগলিত-প্রাণ আর একবার মা বলিয়া ডাকুক। এই আকুল প্রাণ কখনও তাঁহাকে ভোলে না। যখন তোমরা কেহ থাক না, তখনও সেই প্রফুল্ল বদন-শতদল এই হৃদয়-কমলে প্রস্ফুটিত থাকে। তাঁহাকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে কে ? যদি তোমাদের কাহাকেও না দেখি, তথাপি তাঁহাকে প্রাণে দেখিয়া সকল সাধ মিটিবে। তোমরা আজ এত লোক

কেন আসিলে? আমার ডাকে এস নাই, আমি অনেকবার ডাকিয়াছি, তোমাদিগকে পাই নাই। ইহা আমার কার্য্য নহে। সেই অমর-কীর্ত্তি-শালী যিনি, ইহা তাঁহারই কার্য্য। অতএব তাঁহাতে সকলে আবার মিলিত হও। অনেক বলিলাম, আর কত বলিব? হে বন্ধুগণ, চিরকাল এই উন্নতির পথে অগ্রসর হও। ধর্ম্মে, বিশ্বাসে ও চরিত্রে উজ্জ্বল হও। অনন্তকাল এই অনন্তের আহ্বান অন্তরে শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে নিবৃত্তি লাভ কর।

হে পুণ্যময় পরমেশ্বর, কি জানি আজ কোন্ আকাশ হইতে তুমি নামিয়া আসিয়া এই অসম্ভব সম্ভব করিলে। তোমার আহ্বানে, তোমার নামে এই যূথভ্রষ্ট মেষদল আজ মিলিত হইল। যদি একবার এমন করিয়া ডাকিতে পার, তবে চিরকাল কেন এমন করিয়া ডাক না? দিনে, নিশীথে কেন ডাক না? কেন একবার এমন করিয়া ডাক না, যাহাতে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ ঘুচিয়া যায়? হে করুণাময়, যদি বংশী বাজাইলে, তবে এমন করিয়া বাজাও, যাহাতে এই সকলে যেমন তোমার অঞ্চল ধরিয়া আজ একত্র হইলেন, তেমনি অনন্তকাল তোমার অঞ্চলের ছায়াতে পড়িয়া থাকেন। তোমার অনেক অঙ্গীকার এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। তুমি যে বলিয়াছিলে, দশ পরিবার এক করিবে; তুমি যে বলিয়াছ, এই দুর্গত দেশকে উদ্ধার করিবে; তুমি যে বলিয়াছ, আমাদিগকে এই জীবনে স্বর্গ-বাস দিবে। আজ সকলে আসিয়াছেন। যাঁহারা কখনও কাঁদেন না, তাঁহারা কাঁদিলেন; যাঁহারা কখন প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন; এমন সুযোগ আর পাইবে না। এই অবসরে তোমার সকল অঙ্গীকার পূর্ণ কর। হে ক্ষেত্রপতি, এই ভবরাজ্যে আর একবার সেই বীজ বপন কর, যাহা তোমার কৃপাতে অঙ্কুরিত, তোমার প্রসাদ-বারি-

সিঞ্চনে বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। এই ক্ষীণকণ্ঠ আর বলিতে পারে না। অব্যক্ত ভাবের জন্য এই হৃদয় চিরদিন তোমার নিকট অঞ্জলি-বদ্ধ রহিল। এই প্রার্থনা, আজ যাহা করাইলে, তাহা চিরকাল বর্ত্তমান ও অচ্ছেদ্য রাখ। আজ যে আগুন জ্বালাইলে, তাহা আর নিবিতে দিও না। এই তোমার সমবেত সৈন্যদল চিরকাল অদম্য উৎসাহ ও শক্তিতে তোমার পশ্চাদ্গামী হউক। এই সমস্ত হৃদয় আজ তোমার অসীম অনন্ত শক্তিতে যেমন এক হইয়াছে, চিরকাল তেমনি এক থাকিয়া তোমার জয় ঘোষণা করুক। মঙ্গলময়, তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই প্রার্থনা করিয়া, আজ সকল ভাই ভগিনী তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া, বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

Volum

ume 3

উপদেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

—*—

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

নববিধান ট্রষ্ট

কলিকাতা।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ—১৮৪২ শক।

মূল্য ।০ আনা।

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. P. NATH,
AT THE MANGALGANJ MISSION PRESS.
3, RAMANATH MAZUMDAR'S STREET.

1921.

সূচীপত্র।

উপদেশ।

ঋণশোধ। *

সোমবার, ১২ই মাঘ, ১৮১৯ শক ;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ভগিনীগণ ও সন্তানগণ, আবার আমাদের এই কুটীরে আদরের সহিত, স্নেহের সহিত তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি। এক বৎসর কাল স্নেহময়ী পরম জননী আমাদিগকে জীবিত রাখিয়া অনেক শান্তি সমাদর বর্ষণ করিলেন, এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই। এই বার মাসের মধ্যে কত রোগ আসিল, আবার তাঁহার কৃপাতে আরোগ্য লাভ করিলাম, কত সুস্থতার আনন্দ, কত ধর্ম্মের শান্তি, কত প্রেম ভক্তির মাধুর্য্য তাঁহার পদচ্ছায়াতে বাস করিয়া সম্ভোগ করিয়াছি। এই জন্য এই আত্মা তাঁহাকে শতবার ধন্যবাদ করিতেছে। সকলে মিলিয়া বল, হে সন্তানবৎসলা জননি, ধন্য তুমি ধন্য। হে আদি, হে অন্ত, হে রক্ষাকারী জ্ঞানধর্ম্মদাতা পিতা, ধন্য তুমি ধন্য। এখন হে ব্রহ্মকন্যাগণ, দুই একটী ঐতিহাসিক কথা জিজ্ঞাসা করি। যখন এই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন হে ব্রহ্মবাদিনী ব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা কোথায় ছিলে? তোমাদের মধ্যে হয়ত তখন অনেকেই ছিলে ; কিন্তু

* শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা উৎসবে বিবৃত।

তোমরা কি তাঁহাকে ডাকিতে, তোমরা কি এই এখন যাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হইতেছ, তাঁহার উপাসনা করিতে? আজ প্রেম-অশ্রু দ্বারা যাঁহার চরণ ধৌত করিতেছ, তাঁহাকে কি তোমরা চিনিতে পারিয়াছিলে? কিছুই না। তোমরা ইঁহাকে জানিতে না, তোমরা ইঁহাকে ডাকিতে না, কেবল অন্ধকার অবরোধে বসিয়া থাকিতে, সমস্ত দিবসের জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু তোমাদের জন্য কেন আলো হইল, কেনই বা আবার অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল, তোমরা তাহা কিছুই বুঝিতে না, মানবজীবন ধারণ করার উদ্দেশ্য কি, মানবজীবনের মূল্য কত, তাহা তোমরা অবগত ছিলে না। জীবনে জীবনসখাকে খুঁজিয়া পাও নাই। হৃদয়ে বিকশিত প্রেমকুসুম কাহার চরণে অর্পণ করিতে হইবে, তোমরা জানিতে পার নাই। সুতরাং এখন ভাবিয়া দেখ, ব্রাহ্মসমাজ তোমাদের কত উপকার করিয়াছে! তোমরা কেবল লেখা পড়াতে সুক্ষম তাহা নহে, তোমরা কেবল অন্ধকার অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়াছ তাহা নহে; তোমরা জ্ঞান উপার্জ্জনে সত্যধর্ম্মের আলোকে কত উন্নত হইয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ এবং এই উন্নত জীবনে উন্নতির সোপান ব্রাহ্মসমাজকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নিকট ঋণ স্বীকার কর।

যদি তোমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া না হইত, যদি তোমাদিগকে এই নবধর্ম্মের আলোকে আসিতে অধিকার দেওয়া না হইত, তবে সেই পুরাতন কুসংস্কার ও ঘোরতর অজ্ঞানতার মধ্যে পড়িয়া আজ তোমাদের কি দশা হইত? তোমরা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছিলে, আজ তোমাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে; ঈশ্বরের পবিত্র মুক্ত বায়ু তোমরা সেবন করিতেছ। আজ এই উপাসনা করিয়া, প্রাণের সাধে এই সঙ্গীত করিয়া তোমরাও কৃতার্থ, আমরাও কৃতার্থ। যদি সেই ঘোর পৌত্তলি-

কতার দুর্গে তোমাদের বাসস্থান হইত, তবে এই জীবন্ত, জাগ্রত প্রেমময় পরমেশ্বরের উপাসনারস কোথায় পাইতে ? আজ বিপদে দুঃখে হরিকে ডাকিতেছ, সম্পদে সম্পদদাতার চরণে মস্তক রাখিয়া কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিতেছ। যদি ব্রহ্মকৃপা তোমাদিগকে এই ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া না আনিত, তবে তোমরা এই সৌভাগ্য কোথায় পাইতে ? কেবল ইহাই নহে। আরও দেখ, এইক্ষণে তোমরা এক নূতন সমাজের সভ্য হইয়াছ। এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে কত জ্ঞানশিক্ষা করিয়া সভ্যতা লাভ করিলে। তোমাদের মধ্যে যাহারা কুমারী ছিলে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, উপাসনাপ্রিয় পতি লাভ করিয়াছ, তোমরা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা সকলে মিলিয়া এক নূতন সমাজ গঠন করিয়াছ, ইংরেজ বাঙ্গালী সকলে তোমাদিগকে দেখিয়া বলে, এদেশের আর অকল্যাণ হইবে না।

ধর্ম্মে ও পুণ্যে ভূষিতা নারীগণ, এই নববিধান তোমাদের কপালে সিন্দূর ও চন্দনে কত সৌভাগ্য লিখিয়া দিলেন, একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ। নববিধানের আলোক তোমাদের মস্তকে পড়িয়া তোমাদের সম্মান ও শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছে। মা জগজ্জননীর ছায়ারূপে তোমরা গৃহে গৃহে বাস করিয়া গৃহকে ধর্ম্ম ও পুণ্যের আবাসভূমি করিতে আদিষ্ট হইয়াছ। যদি এত লাভ করিলে, এত সৌভাগ্যবতী হইলে, তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। যে সমাজ হইতে তোমরা এত পাইলে, তাহার জন্য তোমরা কি করিলে ? যাহার প্রসাদে সমস্ত কুসংস্কার পাপ হইতে মুক্ত হইলে, তাহাকে তোমরা দিলে কি ? যাহা হইতে অনেক পাওয়া যায়, তাহাকে অন্ততঃ কিছু দিতে হয়। ঋণ শোধ দেওয়ার বিধি সর্ব্বত্র আছে। ঋণের উপর ঋণ বাড়ান কখনও উচিত নহে। অতএব তোমরা কি দিবে, কি দিয়া এই গুরুতর ঋণভার লঘু করিবে? এই

ব্রাহ্মসমাজ তোমাদের নিকট একটী বড় দাবী করিতেছেন। সেই দাবী আজ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। তোমাদের ধন চাই না, ধন দিয়া তোমরা দুঃস্থ ব্রাহ্মদিগের সেবা কর এমন কথাও বলি না। তোমরাও যে ধন চাও, বস্ত্র চাও, বিলাস চাও, ইহাও মনে করি না। তোমরা বীরাঙ্গণা হইয়া দেশ উদ্ধার কর ইহাও ইচ্ছা করি না। আজ কোন ধর্ম্মপরায়ণা নারী ভক্তিবিগলিত হইয়া সঙ্গীত করিলে কৃতার্থ হইন ; কিন্তু বক্তৃতা কর ইহা চাই না। তোমরা আমাদের উপর খুব অধিকার বিস্তার কর, ইহাও প্রার্থনীয় নহে। একটী বড় দাওয়া তোমাদের উপর আছে। তাহা এই, স্ত্রীলোক ভিন্ন সংসার হয় না, স্ত্রীলোক ভিন্ন সেবা হয় না। তোমরা আমাদের গৃহে স্নেহ, প্রেম ও সমাদরের জীবন্ত মূর্ত্তি। তোমাদের দ্বারা সদ্ভাব, সদাচার, পবিত্রতার সুশিক্ষা গৃহে বিরাজ করে। অগস্তিনের মাতা মণিকা অগস্তিনকে ধর্ম্মপথে আনিয়া কীর্ত্তিমতী হইলেন। দ্রৌপদীর সেবাপ্রধান জীবন স্মরণ কর, সীতা সাবিত্রীর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন কর, অহল্যাবাইয়ের অসম্ভব ধর্ম্মকীর্ত্তি বারাণসীতে দেখিয়া এস।

এই সকল দেখিয়া জীবনে অপরিমিত ধর্ম্মপিপাসা লইয়া তোমরা আমাদের ধর্ম্মজীবনের সহায় হও। এই তোমাদের নিকট একমাত্র দাওয়া। গৃহই আমাদের শান্তির স্থান। আমরা পুরুষ মানুষ, সমস্ত দিন বাহিরে পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হই। কত লোকের সঙ্গে কত প্রকার ব্যবহার করিয়া জ্বালাতন হই। গৃহে আসিয়া তোমাদের নিকট সান্ত্বনা লাভ করি। বাহিরে যেমন জ্বালাতন হই, গৃহে আসিয়া তেমনি যদি তোমাদের মুখখানা ভার দেখি, কঠোর তিক্ত বাক্যে যদি আমাদের প্রাণকে বিদ্ধ কর, তবে যে কি অবস্থা হয় বলিতে পারি না। ইচ্ছা হয়,

এ জীবন তখনই বিসর্জ্জন দিয়া সকল জ্বালা নিবারণ করি। ইহা সম্ভব নহে যে, বাহিরের দশ জনের সঙ্গে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ এক হইবে। দুঃখে সুখে সকল অবস্থাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি অন্যত্র পাওয়া দুর্ল্লভ। এই জন্য বিধাতা তোমাদের এক একজনকে আমাদের এক একজনের জীবন-সঙ্গিনী করিয়া সমস্ত বিষয়ে মিলন ও এক ধর্ম্ম ও এক আকাঙ্ক্ষার ভূমি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিতে পরিবারের উৎপত্তি। এই ভূমিতে মাতা ভগিনীর সৃষ্টি। এই ভূমিই আনন্দনিকেতন। ইহা সুখ ও শান্তির প্রসূতি। সংসার এবং অরণ্যের পার্থক্য এই ভূমিতে বসিয়া বিচার করা যায়। অতএব তোমাদিগকে বলি, তোমরা মিষ্ঠতার সরোবর হও, তোমরা প্রেমের চন্দ্রমা হও, তোমরা পুণ্যের মূর্ত্তি হও, তোমরা ধর্ম্মের আকর হও। অধিক উপাসনায় প্রয়োজন কি? তোমরা সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সংযতমনা হও, তবেইত হইল। আহা! পরমেশ্বর, কবে তোমার কন্যাগণের জীবন মিষ্ঠতাতে পরিপূর্ণ হইবে?

আর একটী কথা, অনেক দুশ্চরিত্র মানুষ ঘোর পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, কাহার চেষ্টায়? তাহাদের মাতা, ভগিনী ও পত্নীর ধর্ম্ম, পুণ্য ও আত্মসমর্পণরূপ একান্ত যত্ন ও আগ্রহে।

অগস্তিনের জননীর একান্ত যত্ন ভিন্ন তাঁহার উদ্ধার হইত না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পাইবে। তোমরা কয়জনকে এইরূপে উদ্ধার করিলে? যাহার ঘরে মা আছেন, ভগিনী আছেন, স্ত্রী আছেন, কন্যা আছেন, তাহার ঘরে অধর্ম্ম অপবিত্রতা কোথায়? অধর্ম্ম পণ্যশালায়, গৃহে অধর্ম্ম কোথায়? হে ঈশ্বরের কন্যাগণ, তোমরা যে দিন পবিত্রাত্মার আশীর্ব্বাদ চাহিয়া লইবে, সে দিন বঙ্গদেশ তরিয়া যাইবে। যদি এত পাইলে, নিজ নিজ জীবনের গুরুত্ব এত বুঝিলে, তবে আর উদাসীন

থাকিও না। কিছু দান কর। নিজ পরিবারে দান কর, অনেক পরিবার প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া পরস্পরকে ধর্ম্মদান কর, সকলে মিলিয়া এমন একটি সমাজ স্থাপন কর যাহা ধর্ম্মে ও পুণ্যে পরিশোভিত ও পরিপূর্ণ হইবে।

আর শেষ কথা এই—ভক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, অনুরাগ ভিন্ন উপাসনা হয় না, প্রেম ভিন্ন পরিবার হয় না, আত্মনিগ্রহ ও কঠোর সাধন ভিন্ন ঈশ্বর লাভ হয় না। এই সকলের অভাবে জীবন ও মণ্ডলী সকলই মিথ্যা। অতএব হে ভগিনীগণ, হে মাতৃগণ, আমাকে তোমাদের সন্তান জানিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই কথা শুন। এই সামান্য একটু ধর্ম্ম তোমাদের হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না। জান না কি, এ দেশের কন্যাগণ ধর্ম্মের জন্য কত কঠোর ব্রত পালন করেন, কত অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসেবা করেন। কঠোর সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম সতেজ হয় না। আর কি বলিব? এতক্ষণ যাহা শুনিলে, আপনাপন জীবন তেমনি প্রস্তুত কর। একদিন এমন ছিল, যখন তোমরা এই ধর্ম্মের শিক্ষাতে অপরিমিত উৎসাহ পাইয়াছিলে। আজ তোমরাও আছ, আমিও আছি। একজন নাই। যাঁহার একান্ত শুভ কামনাতে তোমাদের এত উন্নতি ও উপকার, আজ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না। যিনি নাই তাঁহার নাম আর বলিতে হইবে না, যিনি তোমাদিগকে ধর্ম্ম ও পুণ্যে শোভিত করিতে, তোমাদের ললাটদেশ পবিত্রতার সিন্দূর ও চন্দনে চর্চ্চিত করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন, আমি তাঁহার জীবনালোকে আচ্ছন্ন থাকিয়া তোমাদের সেবা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। আর তোমাদিগকে কত বলিব? এই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অধ্যয়ন কর, পরমেশ্বরের করুণাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ স্বীকার

কর, এই পরম শান্তিপ্রদ ধর্ম্মসুখে সুখী হও এবং সকলকে সুখী কর ; ধর্ম্ম ও পুণ্যের পরিবার হইয়া সংসারে স্বর্গবাস রচনা কর।

হে শুভদাত্রি, হে করুণাময়ি, আবার এক বৎসর পরে তোমার কন্যাগণ তোমার ঘরে আসিয়াছেন। আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহাদের উন্নতি আর কি হইবে না? ইঁহাদের জ্ঞান ভক্তি প্রেম অনুরাগ আর কি বৃদ্ধি পাইবে না? ইঁহারা কি তোমার হইয়াছেন? ইঁহাদের পরিবার কি বৈকুণ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে? ইঁহাদের ভক্তি কি যথেষ্ট হইয়াছে? তোমার অঞ্চল ধরিয়া ইঁহারা কি যথার্থ মুক্তি লাভ করিয়াছেন? হে ভক্তবৎসলে, তোমার এই অবলাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ও রিপুগণকে বশীভূত করিবার শক্তি দাও এবং তোমার পবিত্রতা ও পুণ্যের মুকুট ইঁহাদের মস্তকে পরাইয়া দাও। হে মঙ্গলময়, ইঁহারা ঘরে থাকেন। ইঁহাদের পিতা, পতি ও সন্তানগণ বাহিরে যাইয়া অনেক কষ্ট পান, যাহাতে ইঁহারা তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হন তাহা কর। এই তোমার কন্যাগণ আমাদের কথা শুনেন না। ইঁহাদিগকে ভক্তি দাও, শিক্ষার জন্য আগ্রহ দাও। ইঁহাদিগকে তেজঃপূর্ণ শক্তি দাও যাহাতে পরস্পরকে শাসন করিতে পারেন। এই আজ যাঁহারা সভা সাজাইয়া বসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের কণ্ঠের ভূষণ হও, বক্ষের মণি হও, হৃদয়ের আনন্দ হও, আত্মার পুণ্য শান্তি হও। প্রেমময়ি, মঙ্গলময়ি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া, আশা ভক্তির সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ধৰ্ম্মজীবন। *

বুধবার, প্রাতঃকাল, ১৪ই মাঘ, ১৮১৯ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

ধৰ্ম্মজীবন দুই জাতীয়। এক প্রকার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় দেওয়া কঠিন হইলেও প্রকাশ করা যায়; আর এক প্রকার ধর্ম্মজীবন বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, বলিতে গেলে মুখ বন্ধ হয়, ভিতর হইতে নিষেধ শুনা যায়। আমাদের ধর্ম্মজীবন প্রথমজাতীয়, না দ্বিতীয় প্রকারের? আমাদের ভাব অপেক্ষা কথা বড়, না কথা হইতে ভাব প্রবলতর? আমাদের সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, না ব্যয় করিয়াও সঞ্চিত ধনের কিছু অবশিষ্ট থাকে? সমাগত বন্ধুগণ, কোন্ প্রকারের ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিয়াছ, আজ তাহার আলোচনা কর। সর্ব্বদাই দেখা যায়, আমাদের জীবনের অবস্থা এমনি যে, যাহা করি তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থির থাকে না। যাহা বলি, তাহা এত অধিক বলা হয় যে, অন্তর তাহাতে বল দেয় না। হৃদয়ে সঞ্চিত ভাব অপেক্ষা অধিক কথা বলিতে গেলেই অসার কথা, ভাবশূন্য কথা বাহির হইতে থাকে। এই প্রকার জীবন দুদিনের জন্য। শ্রাবণের বর্ষা কোন্ নদীকে আকূল পূর্ণ করে না? কেবল নদী কেন, কোন্ পুষ্করিণী ও ছোট ছোট ডোবা পর্য্যন্ত পূর্ণ কলেবর ধারণ করে না? কিন্তু যাই ভাদ্র আশ্বিনের প্রখর তেজোময় সূর্য্য দেখা দেয়, অমনি ১৫ দিনের মধ্যে সেই উচ্ছলিততীর পূর্ণায়ত নদী অস্থিচর্ম্মসার হয়; পুষ্করিণী, ডোবার অস্তিত্বও থাকে না। এই প্রকার

---

* ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে প্রদত্ত।

মহোৎসব কালে পরমেশ্বরের কৃপাতে আমাদের মন আকূল পূর্ণ হইয়াছে। আজ হৃদয় পূর্ণ উৎসাহ, কত ভাবের আবেশ, কত প্রেমের উচ্ছ্বাস, সেবার জন্য আজ হস্ত কতই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে! ঈশ্বরের করুণা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ সকলে স্বর্গরাজ্যের নিকটে এসেছ। এই প্রকার অবস্থা তো কতবার হইয়াছে। কিন্তু যেই উৎসব ফুরাইয়া যায়, উড্ডীয়মান নিশান তুলিয়া রাখা হয়, বাদ্যভাণ্ড, উৎসবের বাহ্য আড়ম্বর ফুরাইয়া যায়, অমনি হৃদয়সরোবর শুষ্ক হইতে থাকে, এত যে উৎসাহ এবং ভাবভক্তির আতিশয্য, এত যে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের মত্ততা, এত যে আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, সকলই কোথায় চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম পৌষমাসে যেমন ছিলেন, ফাল্গুনেও সেই আকার ধারণ করিলেন। ইঁহাদের অন্তরের উৎসাহ উদ্যম, ভাব, ভক্তি সকলই অপহরণ করিয়া কে যেন অন্তর্হিত হইল। বাহির যেমন শূন্য হইল, অন্তরও তেমনি শূন্যাকার। দু দশ দিনের কথা বলা হইতেছে না, চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে তাহাই বলা হইতেছে। জীবনের এই দুরবস্থা দূর করিবার উপায় কি? ধর্ম্মরত্ন জীবনে কিরূপে সঞ্চয় করিবে একবার চিন্তা কর। এই লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য ও পরিণতি কোথায় একবার অন্বেষণ কর। যদি গত উৎসবের পর সমস্ত বৎসরের সাধনে অন্তরে এমন ভাব জ্ঞান সঞ্চিত না হইয়া থাকে, যাহার প্রভাবে আবার এই উৎসবক্ষেত্রে পঁহুছিতে পার, যদি হৃদয়-উদ্যানে এমন প্রেম ভক্তির ফুল না ফুটিয়া থাকে, যাহা দ্বারা এই উৎসববেদীকে সাজাইতে পার, যদি এমন ধর্ম্ম না পাইয়া থাক, যাহা হাটে বাজারে দেখাইলেও মলিন হয় না, যাহার প্রভাব কমে না, যাহার শক্তিতে সমস্ত জগৎ আকৃষ্ট হয়, এমন নীরব ধর্ম্মমূর্ত্তি যদি তোমার আকারে মূর্ত্তিমান না

হইয়া থাকে, তবে আর কি হইল? এই অবস্থা যদি না হয়, তোমার ধর্ম্ম কিছুই নহে। সমস্ত বৎসর নীরবে, নির্জ্জনে প্রাণসখার প্রেমরস আত্মস্থ করিয়া যদি বলবান্ না হইয়া থাক, তবে আজ চীৎকার করিয়া কি ফল লাভ করিবে?

ঈশার জীবন ও ধর্ম্ম যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, সেই জীবনের গৌরব নিস্তব্ধতা। বহু সঞ্চয়ের অল্পমাত্র ব্যয়, বহু শক্তির অল্পমাত্র প্রকাশ ঈশার জীবন। বাক্যের আড়ম্বর নাই, ভাবের আতিশয্য নাই, নিরীহ মেষশাবক আত্মরক্ষার্থ দুটী কথা বলিতেও সঙ্কুচিত। ঈশা যদি পিলাতের বিচারাসনের সম্মুখে একটী কথাও বলিতেন, হয়ত তাঁহার প্রাণ বিনাশ হইত না। তিনি যদি ফেরোসীদিগের নিকটে আপনার কথা ব্যক্ত করিতেন, তবে হয়ত তাঁহার প্রতি সেই নিদারুণ অত্যাচার হইত না। তিনি কোন কথা কহিলেন না। কথা কহিলেন না বলিয়া আরও সকলে অধিকতর বিরোধী হইল। অধিক অত্যাচার করিল। জীবনান্ত হইল, তথাপি সংগোপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন না। উত্যক্ত হইলেন না, আত্মহারা হইলেন না। আর আমরা কি করি? একটী নিন্দা অপমানের কথা শুনিলে অস্থির হই। সংবাদকাগজে কেহ নিন্দা করিয়াছে শুনিতে পাইলে রাগে দু চার দিন উপাসনা করিতে পারি না। অন্তরে সঞ্চিত ধর্ম্ম, সঙ্গোপন ধর্ম্ম এই নহে। ধর্ম্মের প্রভাবে যদি নিন্দা ও অত্যাচারের অতীত হইতে না পার, তবে ধর্ম্মবল কি? কতকগুলি লোক আছে, তাহারা সদাই নীরব নিস্তব্ধ, তাহাদের জীবনে কোন প্রকার উৎসাহ উদ্যম নাই, অন্তরে কোন প্রকার চিন্তাও নাই। অসার বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ জীবন হইতে ইহাও বরং ভাল, কিন্তু এই প্রকার মৃতপ্রায় জীবনের কথা আমি বলিতেছি

না। আমি বলিতেছি অন্তরে সচ্চিন্তার যখন জোয়ার থাকে, পাঁজার ভিতরে আগুন যেমন জ্বলিতে থাকে, মনের ভাব তেমনি যখন প্রজ্বলিত থাকে, প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয় যখন প্লাবিত থাকে তখনও যেন তোমরা শান্ত থাক; যত লাভ করিয়াছ তাহা অপেক্ষা যেন অল্প প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর, প্রচুর শক্তির অল্প প্রভাব যেন বিস্তৃত হইতে দাও এবং আত্মসংবরণ করিয়া যাহাতে চিরসতেজ ও চিরবলবান্ থাকিতে পার তাহা কর। পবিত্র চরিত্রবল যে নাই, ইহা অনেক-বার বলিয়াছি। ভাদ্রোৎসবের দিনে উপরের ঘরে বসিয়াও এই আলো-চনা করিয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, ভিতরে সেই দর্শন উজ্জ্বল হয় নাই, যাহা চরিত্রে পবিত্রতা ও পুণ্যের জ্যোৎস্নারূপে বিকশিত হইতে পারে। সেই নীরব বাণী সর্ব্বদা শুনা যায় না, যাহার বলে শ্রীগৌরাঙ্গ মা'র খাইলেন। ব্রহ্মদর্শনে সেই নিমগ্নতা হয় নাই, যাহা থাকাতে শাক্য নিরঞ্জনা নদীতীরে বালক ও স্ত্রীলোকগণ নিক্ষিপ্ত ধূলি কর্দ্দম নিজ শরীরে নীরবে ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশার যে মহৎ প্রকৃতি তাহা তিনি দ্বাদশ জন শিষ্যের নিকট সর্ব্বদা বলিলেও কি তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া সেই শিষ্যমণ্ডলীকে চরিত্রের অবয়বরূপে গঠিত করিত, যদি তাঁহার চরিত্রের মধ্য দিয়া অবিরাম নীরবে, অজানিতরূপে তাহা ফুটিয়া না উঠিত! বাস্তবিক চরিত্র যেমন নূতন চরিত্রের জন্মদানে সমর্থ, এমন আর কিছুই নহে।

আমার কথা শুন ও বিশ্বাস কর, এমন এক নীরব বাণী আছে যাহা শুনা যায়, এমন এক নিস্তব্ধ দর্শন আছে, যাহা দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হয়। যে এই কথা শুনে এবং এই দর্শনে মগ্ন থাকে, তাহাকে আর কিছু বলিতে হয় না; অগ্নির উত্তাপ যেমন সহজে অনুভূত হয়, চন্দ্রের

জ্যোৎস্না যেমন সহজেই চিত্তকে আকর্ষণ করে, কুসুমের সুবাস যেমন বিনা আয়াসে নাসিকাতে প্রবেশ করে, তেমনি দেবচরিত্র অজানিতরূপে অজ্ঞাতভাবে অপর চরিত্রে সংক্রামিত হয়। ঈশা কিছুই বলিতেন না, অথচ তাঁহার চরিত্রের ছায়াতে কত শত দেবচরিত্র রচিত হইল। আমাদের অগ্রজ আচার্য্য অধিক কথা বলিতেন না, অথচ তাঁহার নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে এমন সমস্ত কথা আসিত, যাহার দ্বারা আমরা সমস্ত বুঝিতাম। এই সমস্ত দেবাত্মগণের জীবনের অভ্যন্তর কত ঐশ্বর্য্যে, কত দেবপ্রসাদে পরিপূর্ণ ছিল, কিরূপে তাহা অনুভব করিব? ইঁহাদের এত ছিল তথাপি উচ্ছৃঙ্খল হন নাই, তবে তোমার আমার দশা কেন এইরূপ হইল? হৃদয়ে একটী কাণা কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি না। অন্তরের ভাব যত তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিতে যাইয়া একেবারে শূন্যপ্রাণ হই।

যে বাণী নিঃশব্দে বেদপ্রণেতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, যে বাণী গীতাকারে অন্তর পূর্ণ করিয়াছিল, সেই বাণী আমরা কবে শুনিব? অন্তর যে ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ থাকিলে মানুষের এক কথাতে সমস্ত মণ্ডলী নিস্তব্ধ হয়, ভাবে ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়, এবং অদৃশ্য অনন্ত রাজ্যের তাবৎ সমাচার লাভ করে, সেই বাণী অন্তরে সংগ্রহ করিয়া আমরা কবে উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিব?

হে সাধক, ধর্ম্মমণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া কত বক্তৃতা ও সঙ্গীত করিলে, ধর্ম্মলাভের জন্য কতবার বারাণসী, মক্কা ও জেরুজিলাম ভ্রমণ করিলে, কিন্তু ব্রহ্মকে নিঃসন্দেহরূপে দেখিলে কই? ব্রহ্মবাণী নিঃসন্দেহরূপে শুনিতে পাইলে কই? বিশ্বাসীর জীবন কত শান্তিময়! বিশ্বাসীর নিকট সকলই অস্তি, অস্তি, আর অবিশ্বাসীর নিকট সকলই নাস্তি, নাস্তি।

বিশ্বাসী বিশ্বময় ব্রহ্ম আবির্ভাব দেখিয়া গভীর চিন্তাতে আত্মহারা হন; আর অবিশ্বাসী সকলই শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিতেছে। আমাদের জীবন এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইয়াছে কি না পরীক্ষা কর। এই রোগের ঔষধ আর কি আছে? ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সমস্ত মণ্ডলীর নিকট নিস্তব্ধ হও; বাক্য সংবরণ কর, প্রাণে প্রাণময়কে দেখিয়া অনন্তে নিমগ্ন হও।

ঈশাকে সুরাপায়ী ও নারীগণের সংসর্গপ্রিয় বলিত। আমাদের আচার্য্যকে অনেকে ধনলোলুপ ও বিলাসী মনে করিত। তোমাদিগকেও এইরূপ বলুক তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি আত্মসঙ্গোপন কর। কুলবধূগণ যখন কোন পরপুরুষকে দর্শন করে, তখন যেমন লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তেমনি এই ব্রহ্মাশ্রিত লজ্জাশীল আত্মা যতই লোকনিন্দা শুনিবে, যতই লোকে তাহার অন্তরের কথা টানিয়া বাহির করিতে চাহিবে, ততই সঙ্কুচিত হইয়া অনন্তের আঁধারে আত্মার গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত হইবে। যতই তুমি নিস্তব্ধ হইবে ততই তোমার বৃদ্ধি, আর যতই তুমি চিৎকার করিবে ততই তুমি অন্তঃসারশূন্য হইবে।

ঈশা আত্মগোপন করিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে চোর, ডাকাত বলিয়া চোর ও ডাকাতের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া সংহার করিল। আত্মসঙ্গোপনের এত দণ্ড, তথাপি তোমাদিগকে এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিতেছি; নতুবা কিছু থাকিবে না। তোমার কিছু সঞ্চয় হইবে না, তোমার যাহা আছে, যদি হাটে বাজারে প্রকাশ কর, সংবাদকাগজে লিখিয়া প্রচার কর, তবে জানিও তোমার আর কিছু রহিল না। হে ব্রাহ্ম, হে ব্রাহ্মিকাগণ, চরিত্রসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণ

আর একটী কথা—নিজ চরিত্রসম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলা যায় না। অন্তরের বিশ্বাস কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। সঙ্গোপন ধর্ম্মে তোমাদের জ্ঞান হউক, সংগোপন ভক্তিতে তোমাদের অন্তর পূর্ণ হউক, সংগুপ্ত যোগে তোমরা অবিচ্ছেদ পরমাত্মা সহবাস লাভ কর। অব্যক্ত প্রার্থনা দ্বারা তোমরা পরাসিদ্ধি লাভ কর। তোমাদের কপালে সংগুপ্ত, পবিত্র চরিত্রের জ্যোতি এমনি প্রস্ফুটিত হউক, যাহা ইহপরকালে অম্লিন থাকিবে।

হে মূলাধার, হে পরমাশ্রয়, আমাদের স্বভাবের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। ইহাকে তোমার বৈকুণ্ঠের ক্ষেত্র হইতে আনিয়া সংসারের মাটীতে রোপণ করিয়াছি। তাই এই জীবনতরুর ধর্ম্মফল সংসারের কাকে ফেলিয়া দিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম সংসারের আড়ম্বরসার হইয়াছে। আমাদের অন্তরের সঞ্চিত ধর্ম্মধন সংসারের পাপদস্যুর হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, হে অনন্ত করুণাময়, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। কেন বৎসর বৎসর এই মহোৎসব সংঘটন কর, কেন এই সকল শুষ্ক ভূমিতে আবার ভক্তিবারিধারা বর্ষণ কর; কেন এই সকল অনাহারে মৃত আত্মাসকলের জন্য তোমার অমৃতময় প্রসাদ বিতরণ কর? যে ধর্ম্মঅঞ্জন শ্রীচৈতন্যের চক্ষে মাখাইয়া দিয়াছিলে, যে সংগুপ্ত পুণ্যের আলোকে শাক্যের ললাট রঞ্জিত করিয়াছিলে, যে নীরব বাণীতে ঈশার অন্তর পূর্ণ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া তুমি আমাদের এই উৎসবক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছ। এমন শুভদিনে শুভ অবসরে তোমার নিকট কি চাহিব? এই চাহি যে, আমাদের ধর্ম্মের শিকড় পৃথিবীর মাটী হইতে এক টানে উৎপাটন কর। সংসারের মাটীতে বর্দ্ধিত তরুতে পবিত্র চরিত্রফল ফলে না। সংসারে চরিত্রফলে পুণ্যের সুন্দর রং ধরে না।

হে নিরাশের আশা, কি আর বলিব ;—এই কোলাহল মধ্যে নিস্তব্ধতার বীজ বপন কর। আজ সব লোক এক প্রাণ এক আত্মা হইয়াছে, শত শত বৃক্ষ মিলিয়া ফুল ফলে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার পবিত্র চরণে অঞ্জলি দিতেছে। আজ এই সুযোগে একটানে এই মণ্ডলীর মূল উৎপাটন করিয়া তোমার পুণ্যসরোবরতীরে স্থাপন কর। এই সমস্ত নরনারীকে লইয়া বৈকুণ্ঠের ভক্তিতীরে স্থাপন কর। যেমন জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষে, নিজগুণে নহে, কিন্তু সেই সিক্ত মাটীর গুণে, বড় ফুল ফুটে, তেমনি তোমার পুণ্যরসসিক্ত হইয়া এই সমস্ত জীবনতরুতে তোমার গুণে উৎকৃষ্ট ফুল প্রস্ফুটিত হউক। একটী দুটী বৃক্ষ নহে, কিন্তু শত শত বৃক্ষের মিলিত ছায়া যেমন হিমালয়ের বনভূমি সুশীতল করিয়াছে, তেমনি এই মণ্ডলীর শত শত চরিত্রছায়া দ্বারা এই মণ্ডলীর সন্তাপ দূর হউক। আজ যেমন তোমাকে দেখিয়া অবাক্ নিস্তব্ধ, চিরদিন যেন তেমনি তোমার প্রভাব অন্তরে ধারণ করিয়া আমরা তোমার মত অব্যক্ত হই। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সিদ্ধদিগের যে দল, আমরা তাহার পশ্চাতে বসিয়া, পরাসিদ্ধি পরামুক্তি লাভ করি। এই প্রার্থনা করিয়া, হে সিদ্ধিদাতা পিতা, সকল ভাই ভগিনী মিলিয়া তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি।

মানবজীবনের মুল কোথায় ? *

রবিবার, ১৮ই মাঘ, ১৮১৯ শক ;

৩০শে জানুয়ারি, ১৮৯৮ খৃঃ।

হে বন্ধুগণ, প্রিয় ভাইগণ, স্নেহের ভগিনীগণ, আবার তোমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়াছ। এই জন্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এই ক্ষুদ্র কুটীরে এমন যথেষ্ট স্থান নাই, যাহাতে তোমাদের অসুবিধা না হয়, এমন বিছানা নাই, যাহাতে তোমাদিগকে আদর করিয়া বসাইতে পারি। আপনাদের ভালবাসা ও সদ্ভাবগুণে আমাদের এই ত্রুটি ক্ষমা কর।

আমাদের এই যে মিলন, ইহা শুভ মিলন। এই উপলক্ষে বিধাতাকে বিশেষভাবে ডাকিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে মিলিত প্রাণে এই কয়দিন বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পূজা বন্দনা করিয়া পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। অনেক বলিয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি তোমাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া আজও কিছু বলিতেছি :—

মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের বড়ই সাদৃশ্য। ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি ; কিন্তু বৃক্ষমূলে অনুসন্ধান কর, বীজের চিহ্নও আর পাইবে না, বৃক্ষ বীজকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে না। বৃক্ষ মাটীর উপর স্থিতি করে, মাটীর উপর দণ্ডায়মান থাকে ; কিন্তু নিগূঢ় অনুসন্ধিৎসার দ্বারা আলোচনা কর, দেখিবে যে, মৃত্তিকাও বৃক্ষের স্থিতি ও দণ্ডায়মান থাকার হেতু নহে। বৃক্ষমূলই বৃক্ষের স্থিতির কারণ। এই মূল কোথায়

---

* শান্তিকুটীরে প্রদত্ত উপদেশ।

তাহা খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। একটী আম্রবৃক্ষের শিকড় কোথায় চলিয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইবে না। মানুষও যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন, সেই ক্ষুদ্র বীজ কোথায় গেল কিছুই জানিতে পার না। মানুষ যে মূলের উপর নির্ভর করিয়া এই ইহ পরকালে স্থিতি করিতেছে, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই মূলের অনুসন্ধান করিয়াও তুমি বাহির করিতে পার না। বৃক্ষ আপনার মূল মাটীতে লুকাইয়া রাখে। মানুষের মূল কোথায় ? যে মূল হইতে মানুষের প্রাণ, জ্ঞান, ধন মান এবং অনন্তকাল স্থিতি, সেই মূল কোথায়, কোন্ আধারে লুক্কায়িত ? যে মূল হইতে মানুষ রসগ্রহণ করিয়া এত বড় হয়, এত কীর্ত্তিমান্ হয়, সেই মূলাধার কোন্ অজানিত, অগম্য দেশে আপন স্বভাবে আপনি আবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন ? ক্ষুদ্র মূলের উপর স্থিতি করিয়া বৃক্ষ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, আকাশ ভেদ করিয়া মস্তক উন্নত করে দেখিতে পাও। কিন্তু বল মহাজনের মস্তকের ন্যায় কোন্ বৃক্ষের মস্তক উন্নত হইয়াছে ? যে মূলের শক্তিতে মানুষ এত উন্নত ও চির উন্নতিশীল, সেই মূল, সেই মূলাধার যিনি তাঁহাকে অন্বেষণ কর। যাঁহা হইতে গুণ জ্ঞান পাইয়া এত আস্ফালন করিলাম, সেই গুণসাগর, রত্নসাগর যিনি, তিনিত দেখা দিলেন না। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে না পাও, ততক্ষণ তুমি আপনার মর্য্যাদা কি বুঝিবে ? অতএব হে যুবক, আর আপন বলের গৌরব করিও না। হে ধার্ম্মিক, আর আপন ধর্ম্মের এত গৌরব করিও না। গাছ যেমন মাটী হইতে রস পাইয়া জীবিত থাকে, তোমাদেরও সমস্ত শক্তি, বল, স্ফূর্ত্তি ও কীর্ত্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইতেছ। যাহা হউক, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আরও কথা আছে। তাহা এই, ক্ষুদ্র একটী বীজ

হইতে বৃক্ষ হয়, একটী বৃক্ষে কত বীজ হয়, একটী বৃক্ষ হইতে কত শত শত বৃক্ষের উৎপত্তি। এমন অনেক বৃক্ষ আছে তাহার ফুল হয় না, পাতা হইতে অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। ইব্রাহিম একদিন আপন বৃদ্ধা মহিষীর সন্তান হইল না বলিয়া বড়ই দুঃখ করিয়া ভগবানের নিকট আক্ষেপোক্তি করেন। তাহাতে ভগবান্ বলেন, সাগরের সৈকতে যত বালুকা স্থিতি করে তোমার তত সন্তান হইবে। এই ইব্রাহিমের সন্তান অসংখ্য ইহুদি ও মুসলমান। শাক্যের একটী পুত্র ছিল, তাহারও কি গতি হইল কে জানে? কিন্তু এই শাক্যের কত লক্ষ সন্তান আজ চীনে, তাতারে, জাপানে সিংহলে, এবং আরও কত দেশ পূর্ণ করিয়াছে। ঈশা বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সন্তানে পৃথিবী পরিপূর্ণ। খ্রীষ্ট-সন্তানের প্রবল প্রতাপে আজ এই জগৎ অধিকৃত। অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র একটী বীজ হইতে একটী বৃক্ষ, একটী বৃক্ষ হইতে আবার শত শত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বনভূমি আচ্ছন্ন করে। মহাপুরুষগণের সন্তানবৃন্দ ঠিক এইরূপ। আমি ইহাকেই মণ্ডলী বলি। দু পাঁচ জন বসিয়া কথা কহিলে, একটী বিধি স্থাপন করিলে, অথবা কতকগুলি নিয়মপ্রণালী করিয়া রাখিলে, ইহাকে মণ্ডলী বলিতে ইচ্ছা হয় না। মণ্ডলী বলিলে তাহা ভগবানের একটী অসীম শক্তির বিকাশ মনে হয়। তাহাকে এই ক্ষুদ্র আকারে দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

বিশ্বাসী ও মণ্ডলীতে কিছু পার্থক্য নাই। একটী বিশ্বাসী শত শত বিশ্বাসীর জন্মদাতা। একটী বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বলিলে তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই শত শত প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে। বড়বাজারের এমন অনেক স্থান আছে, এক দিকে কত কত মিঠাই মিছরীর দোকান, অপর দিকে কত আবর্জ্জনা ময়লা, তথাপি যদি তথাকার চৌতলের ছাদের উপর

একটী গোলাপ ফোটে, তাহার গন্ধে শত শত মৌমাছি আকৃষ্ট হইবে, এবং সেই গোলাপের মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবে। তেমনি বিশ্বাসী যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহার আকর্ষণে অনেকে আকৃষ্ট হইবে এবং সেই সকল বিশ্বাসীর সম্মিলিত আত্মার প্রভাবে প্রকাণ্ড মণ্ডলী গঠিত হইবে। বিশ্বাসীর মণ্ডলী সঙ্কীর্ণ নহে। এই মণ্ডলীর শক্তি সামান্য নহে। বিশ্বাসের শক্তিতে গৌরাঙ্গের পার্শ্বে অদ্বৈত, বিশ্বাসের প্রভাবে শাক্যের পশ্চাতে মহেন্দ্র, বিশ্বাসের অসীম শক্তিতে ঈশার পার্শ্বে জন, এবং আরও কত বিশ্বাসে অগ্নিসম তেজোময় শিষ্য। কেবল ইহাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার পশ্চাতে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মণ্ডলীর অবয়ব দর্শন কর। বিশ্বাসের আকর্ষণেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পার্শ্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উপবেশন করিলেন, তাঁহারই পশ্চাতে দণ্ডায়মান এই নববিধানের মণ্ডলী। অতএব যদি যথার্থ বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বলে, তবে তৎসঙ্গে সঙ্গে শত শত প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে এবং সমস্ত অবিশ্বাসের অন্ধকার বিনাশ করিবে। একটী ফুলে শত শত মাছি আসিয়া মধু সংগ্রহে ব্যস্ত হয়, একটী বৃক্ষ হইতে শত শত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া হিমালয়ের বনভূমি ছাইয়া ফেলে। হিমালয়ের বনপ্রদেশ আমি দেখিয়াছি। ইচ্ছা করি তোমরাও তাহা দেখিয়া এস। এমন ছোট বড় নানা বৃক্ষ বন আচ্ছাদন করিয়াছে যে, দেখিলে বৃক্ষবংশের বিস্তারের অন্ত করা যায় না। ইহাতে কত ফুল, কত ফল, কত শোভা।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের মণ্ডলীর মূলাধার। তিনি আমাদের রস, জল, ভক্তি, প্রেম ; তোমরা সকলে আবার সেই পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে রোপিত হও। গত বুধবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, সকলে আপনাপন শিকড় এই পৃথিবীর মাটী হইতে উৎপাটন করিয়া বৈকুণ্ঠের প্রান্তরে, ঈশ্বরের

ক্ষেত্রে রোপণ কর এবং বিশ্বাস ও নির্ভরের সেচনী দ্বারা তাহাতে ভগবৎ কৃপাবারি সেচন কর। পরমেশ্বরের কৃপা ভিন্ন তুমি তোমার একটী জীবনের মূলে জল দান করিয়া বাঁচাইতে পার না, এই প্রকাণ্ড মণ্ডলীর মূলে তুমি কত জল দিবে ? ঈশা আজ নাই ; কিন্তু ঈশাই এই প্রকাণ্ড মণ্ডলীকে রক্ষা করিতেছেন। যিনি বিশ্বাসীর মূলাধার, যিনি নিশীথের শান্তি, যিনি প্রভাতের শোভা, তিনি এই মণ্ডলীর প্রাণাধার হইয়া এই মণ্ডলীকে রক্ষা করিতেছেন।

এক বীজ হইতে সমস্ত বৃক্ষের উৎপত্তি। এক রাজা রামমোহন রায় হইতে এই ব্রাহ্মমণ্ডলীর উৎপত্তি। যাহারা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, যাহারা পাপ তাপ দুঃখ মোচনের জন্য একবার ব্রহ্মের চরণ ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করে, এক ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিন যাহারা অন্ন জল সুখ স্বাস্থ্য পাইতেছে, এক জগৎপতির ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া যাহারা এক পরব্রহ্ম-ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে, এক ঈশ্বরে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তি, তাহারা কেমন করিয়া বলে আমরা এক মণ্ডলী নহি ? বরং রজ্জুর তৃণগুলি পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে, বরং আকাশ স্বীয় নীলিমা পরিহার করিতে পারে, বরং জলের নিজ শৈত্যকে, অগ্নির নিজ তেজকেও পরিত্যাগ করা সম্ভব, তথাপি তোমাদের অমিল হইতে পারে না। তোমার অমিল তোমার সঙ্গে, তোমার অমিল তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে, তোমার বিবাদ তোমার বিবেক বন্ধুর সঙ্গে, তোমার অমিল অপর ভাইয়ের সঙ্গে নহে ; তুমি চক্ষু বুজিয়া দুই ঘণ্টা উপাসনা কর, আর কাহারও সঙ্গে তোমার মিল হয় না। পরমেশ্বরের কোন মণ্ডলীতে তোমার স্থান নাই। তুমি একাকী অসঙ্গ। ইহা হইলে তোমার উপাসনা সত্য হয় বলিতে পারি না। তুমি আমাকে কি বুঝাইতে আসিয়াছ ?

উপাসনা কর, ঈশ্বরসহবাস লাভ কর, আর তোমার সঙ্গে কাহারও মিলে না, ইহা অসম্ভব কথা। আগুণ আগুণকে নির্ব্বাণ করে না, তাহাকে বৃদ্ধি করে। জলই আগুণকে নির্ব্বাণ করে! শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার বিনাশ হয় না। ক্ষমাই শত্রুতার মহৌষধি। এই কয়দিন যেমন একত্র হইয়া প্রাণের আবেগে উপাসনা করিলে, ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সঙ্গীত করিলে, তেমন করিয়া কিছুকাল থাকিয়া দেখ, এই উৎসবের দেবপ্রসাদ জীবনসম্বল করিয়া পরম যতনে ইহা হৃদয়ে রক্ষা করিয়া দেখ, আবার সেই দিন ফিরিয়া আসে কি না। ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, বৃক্ষের সমস্ত ডাল কাটিয়া ফেলিলেও যদি তাহার মূল থাকে, এবং প্রকৃতিতে যদি রস থাকে ও ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যদি শিশির থাকে, আকাশে যদি জল থাকে তবে বৃক্ষ বাঁচিবেই বাঁচিবে। তেমনি যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, বিবেক থাকে, প্রার্থনা থাকে এবং ঈশ্বরের কৃপা থাকে, তবে এই ধর্ম্মমণ্ডলী থাকিবেই থাকিবে। আমরা আচার্য্যের কথা শুনিতাম; ইহা খোসামোদ নহে। তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম আমাদিগকে এমন আকর্ষণ করিত যে, আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া পারিতাম না। কাগজে লিখিয়া দলাদলি করিয়া মণ্ডলী হয় না দেখিয়াছি, এবং এই বুঝিয়াছি, যেমন একটী বৃক্ষ হইতে শত শত বৃক্ষের উৎপত্তি, তেমনি একটী বিশ্বাসী, বিবেকী ও সরল প্রার্থনাশীল জীবন হইতে শত শত জীবনের সৃষ্টি। এই প্রকারে উৎপন্ন যে শত শত আত্মা, তাহাই নববিধানের মণ্ডলী।

অতএব তোমাদিগের নিকট আজ উৎসবের শেষ দিনে, সকলের আগ্রহ আনন্দ ও শান্তির সমতার দিনে সর্ব্বশেষ এই কথা বলিলাম। ইহাতে মণ্ডলীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধির উপায় কি তাহা বুঝিতে

পারিলে। এখন পরব্রহ্মের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া নিজ নিজ জীবন এই ভাবে প্রস্তুত কর। নিরাশ হইও না, শত আশাতে প্রাণকে জাগ্রত কর। ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কৃপাহস্ত আমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয় নাই। তাঁহার উদ্যানে এখনও বসন্ত বিরাজিত। আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং নিজ নিজ বিবেকের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলীরূপে পরিণত হই।

হে অপার আনন্দনিলয়, নিঃশব্দে তুমি বনে বীজ বপন কর, নিঃশব্দে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপাদন কর। একটী বৃক্ষের দ্বারা শত শত বৃক্ষের সৃজন করিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট শাখাপত্রে মরুভূমিকে ছায়া ও শোভার আকর কর। তেমনি নিঃশব্দে এই ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া এমন মণ্ডলী সৃজন কর, যাহার আকর্ষণে কুলবধূ আর ঘরে থাকিতে পারে না। বিদ্বান্, অজ্ঞান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে এই বিধানে আসিয়া পড়ে। আমরা তেমন করিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছি। ধনের লোভে আসি নাই, মানের লোভে আসি নাই, বিদ্বান্ জ্ঞানী হইব বলিয়াও আসি নাই। তুমি ডাকিলে, আর থাকিতে পারিলাম না, তাই আসিলাম। আর একজনকে সঙ্গে করিয়া ডাকিয়াছিলে, যাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পরিপূর্ণ জীবন আমাদের সকলের আকর্ষণের হেতু করিয়া আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে, তিনি আজ এখানে সশরীরে বিদ্যমান নাই। তাঁহার কাছে বসিয়া আমরা কত শিক্ষা করিয়াছি। সেই পবিত্র ফুলের গন্ধে এই সমস্ত মধুলোলুপ মক্ষিকা সমবেত হইয়া এই মণ্ডলীরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। হে পিতা, যদি এই মধুচক্রের মধুরূপ প্রেম-ভক্তি তোমার হয়, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর, এই মণ্ডলী এই কর্ম্ম-

চারী ভৃত্যগণ তোমার হউক। প্রেমে মিলাইয়া আমাদিগকে আর একবার অখণ্ড কর।

বহু বৎসরের পরীক্ষার মধ্যে এমনি প্রাণের জীবন্ত ভাব কমিয়া গিয়াছে যে, দশ জনকে ডাকিয়া আর উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদের যাতনা অত্যন্ত অধিক ভোগ করিয়াছি। আমরা এবার আবার তোমার আহ্বানে মিলিত হইয়াছি ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এই মিলন দৃঢ় কর। সকলকে একাকার কর। তোমার সঙ্গে অমিলন ঘুচাও। বিবেকের সঙ্গে অমিলন দূর কর। তার পর সকলের সঙ্গে মিলাও। এই কয়েক দিন আমি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, তোমার সঙ্গে অমিলন হয় নাই, বিবেকের সঙ্গে বিবাদ হয় নাই। এখন এই আশীর্ব্বাদ কর, আপনার মিলন লইয়া বাহিরে সকলের সঙ্গে মিলন স্থাপন করি। সকলের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ কর, এখন সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলিত মস্তকে, এক হৃদয় এক প্রাণ একাত্মা হইয়া তোমার পবিত্র চরণে বার বার নমস্কার করি।

অজানিতের প্রভাব।

রবিবার, ২৫শে মাঘ, ১৮১৯ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮ খৃঃ।

আমরা অজানিতের ভক্ত, অজানিতকে ভালবাসি, অজানিতকে একান্ত বিশ্বাস করি, যিনি চির অজানিত, আমরা তাঁহার উপাসনা করি, অজানিতের অব্যক্ত হস্তে আমরা পরিচালিত। কেন না, যে যাহা জানে তাহাতে আর বিশ্বাস করিবে কি ? যাহা জানা হইয়াছে তাহার জন্য আর নূতন আগ্রহ কি ? বিশ্বাস আমাদিগের ধর্ম্মপথের নেতা। বিশ্বাস অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণদাতা। বিশ্বাস অজানিতের প্রতি সুদৃঢ় প্রতীতি। যে যাহা জানে না তাহাই জানিবার জন্য এবং যে যাহা পায় নাই তাহাই পাইবার জন্য বিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হইবে। বিশ্বাস সহকারে কোন বিষয় জানিবার জন্য এবং কোন বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলে এবং প্রতীক্ষা করিলে তাহা জানা এবং পাওয়া হইবে সন্দেহ নাই। আমরা না জানিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। উপাস্য দেবতাকে না দেখিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন অজানিত শক্তির চালনাতে জীবন আরম্ভ করিয়া সেই অজানিতের অদৃশ্য হস্তে ব্যবহৃত হইতে হইতে এই জীবন কাটাইয়া দিলাম। আজ এই জীবনে যদি কোন দেবপ্রসাদ সঞ্চয় করিয়া থাকি, আমাদের এই জীবনে যদি কোন শান্তি ও সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখিতে পাইয়া থাকি, তবে তাহা সেই অজানিতের কীর্ত্তি। না জানিয়া যাঁহার অন্বেষণে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আজ তাঁহারই হস্ত আমাদিগকে দৃঢ়রূপে ধরিয়াছে।

এই জন্য আমরা বলি, বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান নিকৃষ্ট। যদি বল জ্ঞানের ন্যায় এমন সর্ব্বপ্রকাশক আর কি আছে? জ্ঞানবিরহিত যে বিশ্বাস তাহা আর কি মূল্যবান্? অন্ধ বিশ্বাস নামে যাহা অভিহিত, তাহাও কি শ্রেষ্ঠ? না, তাহা নহে। জ্ঞানবিহীন বিশ্বাসের পক্ষপাতী হইতেছি না। কিন্তু ইহা বলিতেছি যে, বিশ্বাসশূন্য যে জ্ঞান তাহা নিতান্ত অসার। ইহা কেবল বিচারে সুপটু; কিন্তু কোন গভীর তত্ত্ব লাভে সমর্থ নহে। কেবল ধর্ম্মজীবনে কেন, যে কোন কার্য্যে বিশ্বাসকে সম্বল না করিলে কৃতার্থতা অসম্ভব। অজানিত জানিত হন কেবল বিশ্বাসের শক্তিতে। অদৃশ্য দৃশ্যমান হন বিশ্বাস সহকারে ব্রতচর্য্যা সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইলে।

একদিন এমন ছিল, এই পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্যই কেবল দেখিতাম, আকাশের ঘন নীলিমাই দর্শনের বিষয় ছিল, এমনও দিন দিন জলের শৈত্য ভিন্ন অন্য কিছু জানিতাম না, এমনও দিন ছিল, আগুনের উত্তাপ ভিন্ন আর কিছু বুঝিতাম না। এই প্রকাণ্ড সৃষ্টিব্যাপার মধ্যে স্বভাবের নিয়মে অতি সহজে কোন কোন বস্তুর কোন গুণমাত্র প্রত্যক্ষীভূত করিয়া এক সময়ে মানুষ নিরস্ত হইত; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। যেমন অণ্ড ভাঙ্গিয়া পক্ষিশাবক বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি এই প্রকাণ্ড সৃষ্টি অণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এবং এই ভগ্ন স্থানে মহা কীর্ত্তিশালী ভগবানের যত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সবিতার প্রকাণ্ড মুখগহ্বর ভেদ করিয়া অসংখ্য অজানিত বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষণে চন্দ্র সূর্য্য তারকা সেই মহাজ্যোতির্ম্ময়ের অণ্ড। আকাশের নীলিমার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপতির সৌরভমণ্ডিত সিংহাসন। জলে স্থলে ফুলে ফলে তাঁহারই মহাপ্রকাশ। বিহঙ্গগণের কণ্ঠরবে তাঁহারই

আহ্বান। নরনারীর ব্যাকুল হৃদয় তাঁহারি অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকেই লাভ করত পরম রমণীয় ধর্ম্মভূষণে পরিশোভিত। ধর্ম্মের বীজও ভাঙ্গিয়া গোধূম বীজের মত পড়িয়া গিয়াছে। বীজের কঠিন আবরণ বিনষ্ট হইলে তাহার ভিতর হইতে যেমন সুন্দর সুকোমল অঙ্কুর বাহির হয়, তেমনি এই ধর্ম্মঅঙ্কুর কঠিন আবরণমুক্ত হইয়া সুন্দর বর্দ্ধিত ধর্ম্মকলেবরে পরিণত হইয়াছে। অজানিতের সংগুপ্ত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম বহির্গত হইলেন, ইহা মিলনের ধর্ম্ম, ইহা অসাম্প্রদায়িক, বিদ্বেষ-ঘৃণা বিরহিত। প্রভাতে অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তু সমুদয় যেমন এক প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকলেবরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তেমনি এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোক এই মহা ধর্ম্মজ্যোতিতে বিলীন হইয়া গেল। স্বপ্রকাশ, জীবন্ত, জাগ্রত ঈশ্বরের আবির্ভাবপূর্ণ এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মজগৎ অজানিত অগম্য অপার মহান্ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশিত হইল।

আমরা অজানিতকে বিশ্বাস করিয়া অজানিত ঈশ্বরের সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে অজানিত জানিত হইলেন, অপ্রকাশিত ছিলেন যিনি তিনি প্রকাশিত হইয়া নিজ পরিচয় দান করিলেন। সংগুপ্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধকের হস্ত ধরিলেন। কিন্তু ইহাতেও অজানিত পরিসমাপ্ত হন নাই। এখনও সেই প্রকাণ্ড অবগুণ্ঠন হইতে কত বিস্ময়কর ঘটনা সমস্ত প্রকাশিত হইবে। কত নব নব ভাবে অজানিতের অদৃশ্য হস্ত আমাদিগের কাছে প্রকাশিত হইয়া কত নূতন ভাবে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও পরিচালিত করিবে কে জানে? সামান্য বিশ্বাসের কাণা-কড়ি সম্বল করিয়া তাহারা এত সৌভাগ্যবান্, বিশ্বাস-ঐশ্বর্য্যে তাহারা যখন পূর্ণ হইবে, তখন কে জানে তাহাদের কত কৃতার্থতা হইবে?

আজ আমরা সেই অজানিতের কৌশল ও শক্তিতে সকলে এই ঘরে

একত্রিত হইয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদের গৃহ নহে। এখানে আমরা আমাদের চির আরাধ্য পরম দেবতার পূজা করিতে আসিলাম, কিন্তু ইহা আমাদের সেই উপাস্য দেবতার পূজা মন্দির নহে। আমাদের স্থান এখানে নহে, আমাদের স্থান নিশ্চয়ই আমাদের শোণিত দ্বারা নির্ম্মিত সেই ব্রহ্মমন্দিরে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, কপাটে, ভিত্তিতে ও ছাতে আমাদের ধন আছে, শক্তি আছে, পরিশ্রম আছে, আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলিদানের স্মৃতি আছে। সেই মন্দিরে আমাদের প্রার্থনা, সাধন ও পরমাত্মা সহবাসের পরিচিহ্নিত স্থান আছে। তথাপি কি জানি কেন আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত? কি জানি অজানিত কেন আপন হস্তে ধরিয়া আজ আমাদিগকে এখানে আনিলেন? এই বিচ্ছিন্ন মেষশাবকগণকে একত্র, জাগ্রত ও বলবান্ করিয়া কি জানি অজানিত আবার কি আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন? কি জানি এই ঘটনার মধ্যে তিনি কি মহাশক্তি প্রকাশ করিবেন? যে অজানিতের হস্ত আমাদিগকে ধরিয়া এখানে একত্র করিলেন, তিনিই কেবল জানেন এই সম্মিলন হইতে কি সুফল প্রসব করিবেন। অথবা কিছুই জানি না, জানিবার প্রয়োজনও নাই। তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বন্ধুগণ, আজ কোন্ দিন? চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পিতৃসত্য পালন করত গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য সমাগত হইয়া আনন্দে আহ্লাদ করিবার দিন। আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য এই গৃহপথে একস্থানে বিশ্রাম করিতেছি। আমরা পিতৃসত্য পালনে সক্ষম হইয়াছি, এই জন্য সেই সত্যব্রত পালনে শক্তিদাতা ও সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি এবং সকল সম্মিলিত ভ্রাতৃগণ পরস্পরকে প্রেমা-

লিঙ্গন দান করিয়া সুখী হই। এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিয়া কি আমরা মরিয়াছি? আমরা কি উপযুক্ত আহার না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়াছি? আমরা কি পিতৃসত্য, পিতার আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া ঠকিয়াছি? কখনও না। যদি এই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ না করিতাম, তবে পরম পিতাকে কোথায় পাইতাম? বিবিধ অবস্থার মধ্যে তিনি যে আত্মপরিচয় দিলেন, তাহা আমরা কিরূপে পাইতাম? এই চতুর্দ্দশ বৎসর অধ্যাত্ম-খনি হইতে অজানিত আপনাকে বাহির করিয়া আমাদের মস্তকের মণিরূপে স্থিতি করিলেন; কত শিখাইলেন, কত বুঝাইলেন। এই সুদীর্ঘকালে আমাদের মধ্যে যাহার কিছু শিক্ষা হয় নাই, তাহার আর কোন দিন কিছু হইবে না।

হে বন্ধুগণ, এই অজানিত হইতে আজ কি আশীর্ব্বাদ আসিবে আমি ভাবি নাই। এই উৎসবে মিলন হইলে কি হইবে আমি তাহা ভাবি নাই। আজ এই পরের বাড়ীতে আসিলে কি পরমার্থ লাভ হইবে তাহাও ভাবি নাই। কেবল এই জানি যে, অজানিতের অঞ্চল আমাকে ধরিয়াছে। সেই অজানিতের জ্যোতি আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। সেই অজানিতের শক্তি আমাকে সবলে এখানে পঁহুছাইয়া দিয়াছে। অজানিত আমার গুরু ও নেতা। জানি না তাঁহার মনে কি ছিল। ইহাও জানি না, তাঁহার মনে আরও কত আছে। এই অন্ধকার উপাসনাতে এত তিনি আত্মপরিচয় দিবেন তাহা আমি জানিতাম না।

অতএব বলি, যদি পবিত্রাত্মার হস্ত দৃঢ় বলিয়া জান, তবে কিছু ভয় করিও না। তিন দিনে যিনি সলিমানের পাপ অহঙ্কারপূর্ণ মন্দির বিচূর্ণ করিয়া ঈশার পবিত্র ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই। আমাদের মন্দির থাকুক আর নাই থাকুক, পিতার স্নেহবক্ষ হইতে

আমাদিগকে সরায় কাহার সাধ্য? ব্রহ্মসহবাস হইতে কে বঞ্চিত করিতে পারে? পিতার মুখ এই অনন্ত আকাশ, পিতার হস্ত এই দিক্ সকল। পিতার পদচ্ছায়া এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল। পিতার স্নেহবক্ষ কত বড় একবার ভাবিয়া দেখ। এই মহান্ পিতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বিশ্বাস, ভক্তি, আশা, ধৈর্য্য ও ব্যাকুলতা সহকারে এই পিতার সেবার্থ প্রস্তুত হও।

হে হরি, অজানিত তোমার প্রকাশ, অবগুণ্ঠন তোমার মূর্ত্তি, আমরা জানি আমাদের কম্পিত দক্ষিণ হস্ত তোমার সুদৃঢ় হস্ত ধরিয়াছে। হে অজানিত সুগভীর, আমরা তোমাকে অতি অল্পই জানিয়াছি; কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এত বৎসর কেবল তোমার অদৃশ্য বক্ষে বাস করিয়াছি, এবং তোমারি অদৃশ্য হস্তে পরিচালিত হইয়াছি। এই জানি তোমার অভিপ্রায়, এত দিন আমাদিগকে দেশে বিদেশে, বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করাইয়াছে এবং তোমারি অভিপ্রায় নানা পল্লী ও সহর অতিক্রম করাইয়া আজ আমাদিগকে এখানে উপস্থিত করিয়াছে। তোমার হস্তস্থিত রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, আর এই যূথভ্রষ্ট মেষদল তোমার চরণপ্রান্তে একত্র হইল। আজকার উদ্বোধন, আরাধনা প্রার্থনা তোমার প্রভাবে পূর্ণ। তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় আজ জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত। হে মহান্ অনন্ত, তোমার ভিতরে আমরা মক্কা, বারাণসী শ্রীক্ষেত্র তীর্থে বাস করি। বল, আজ তোমার প্রকাশে এই গৃহ কি তোমার মন্দিরতুল্য মনে করিতে পারি না? এই আশীর্ব্বাদ কর, এখানেই আমরা দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া যেন তোমার জয় ঘোষণা করিতে পারি।

পিতা, এই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস করিয়া আমরা তোমার অজা-

নিত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আজ সকল দিক্ হইতে তুমি আসিয়া এই অরক্ষিত মণ্ডলীকে রক্ষা কর। তোমার সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে আমরা প্রস্তুত হই। তুমি পরম পবিত্র মুখে আজ শান্তিঃ শান্তিঃ বল। আজ আমাদের পুরাতন ভাইগণকে, আমাদের প্রিয়তম যুবক বন্ধুগণকে এবং এই প্রিয়তমা ভগিনীগণকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। নূতন কাজ করিতেছি বলিয়া যেন অভিমানী না হই। দশজন লোক আসিয়াছেন বলিয়া যেন অহঙ্কারে তোমাকে ভুলিয়া না যাই। লোক না আসিলেও যেন নিরাশ না হই। ধনহীন বলিয়াও যেন আমরা নিরাশ ও নিরুদ্যম না হই। আমরা অযোগ্য অধম। আমাদের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যখন কিছুই না জানিয়াও অজানিতের প্রভাবে এত জানিয়াছি, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়াও অনেক পাইয়াছি, তখন কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারি না। হে ভবভয়হারী, তুমি সকল ভয় ভঞ্জন কর। অন্তরের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস তোমার চরণে রাখিয়া, আনন্দ, উৎসাহ সহকারে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

অসাধারণত্ব।

রবিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৮১৯ শক ;
১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮খৃঃ।

আমাদের সমাজ অসাধারণ সমাজ। আমরা অসাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমরা অসাধারণ জীবন পাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের লক্ষ্য অসাধারণ। আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ নূতন এবং অসাধারণ। যিনি আমাদেরর অগ্রজ ছিলেন, তিনি আপনাকে মহাত্মা বলুন আর না বলুন, আপনাকে অসাধারণ লোক বলিয়া জানিতেন। তোমরা ইহাতে কিছু মনে করিও না। ইহা তাঁহার অহঙ্কার নহে। প্রত্যেক লোকের যেমন অন্যকে, তেমন আপনাকেও চেনা প্রয়োজন। তুমি যদি আপনাকে না চেন, আপনি কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা জানিতে না পার, তবে তোমার আপনার জীবনের গুরুত্ব, দায়িত্ব কত, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিবে? প্রত্যেক মানুষ ভগবানের এক একটী অভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি যদি ভগবানের অভিপ্রায় বোঝ, তবে আপনাকে বুঝিতে কিছু বাকী থাকিবে না। অতএব মহাপুরুষেরা আপনাকে জানেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যত কেন নীচ হই না, তথাপি আমরা অসাধারণ হইতে ইচ্ছা করি।

যেমন ছোট বীজ হইতে ছোট বৃক্ষ হয়, অসাধারণ বীজ হইতে অসাধারণ বৃক্ষ হয়, তেমনি ছোট অদৃষ্টে জীবন ছোট ও সামান্য হয়। অসাধারণ আদর্শ যাহার, তাহার ছোট জীবন হয় না। কোন্ ধর্ম্মে, এবং যে সকল জীবন যথার্থ উন্নত হইয়াছে তাহার কোন্ জীবনে ক্ষুদ্র আদর্শ দেখিয়াছ?

ঈশা মুষার জীবনের আদর্শ ক্ষুদ্র ছিল না। আমাদের আর্য্য যোগী ঋষিগণের আদর্শ ছোট ছিল না। মহামতি শাক্য এমনি মহান্ আদর্শের ছায়াতে জীবন গঠন করিলেন যে, তাহার প্রভাবে ধনসম্পদ বিশাল রাজ্য সামান্য তৃণের মত তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে উড়িয়া গেল। বর্ত্তমান সাধারণ হইতে পারে, ভবিষ্যৎ কখনও সাধারণ নহে। যাহা হইয়াছে তাহা সাধারণ হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা নিশ্চয়ই অসাধারণ। কারণ আমরা অসাধারণের ভক্ত, অসাধারণ ঈশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা এবং অসাধারণ আমাদের লক্ষ্য। অতএব, ব্রাহ্মগণ, ধর্ম্মকে খাট করিও না, বিশ্বাসকে সঙ্কীর্ণ করিও না; বড় ধর্ম্ম গ্রহণ কর; বক্ষকে অসাধারণ আশাতে স্ফীত কর; এক অসাধারণ উৎসাহ ও ভক্তিতে অসাধারণ ঈশ্বরের পূজা করিয়া ধন্য হও।

আচ্ছা এখন বল, পরমেশ্বর অসাধারণ কিসে? শক্তিতে তিনি অসাধারণ। এই যত কিছু সমস্তই তাঁহার শক্তি। শক্তিকে মান্য না করে এমন কেহই নাই। কোন্ নাস্তিক আছে যে শক্তি মানে না? জগতে কি শক্তির ইয়ত্তা আছে? বজ্রের শক্তি মানিবে না? বৈশাখের রৌদ্রের শক্তি মানিবে না? ভাদ্রের বন্যার শক্তি মানিবে না? যে মহাজনগণ বালকের ন্যায় এই পৃথিবীকে এদিক ওদিক করিলেন, তাঁহাদের অসাধারণ শক্তি কি মানিতে চাও না? এই মানুষ একটী ক্ষুদ্র সূচের আঘাতে মরিতে পারে, কিন্তু এই মানুষের শক্তি কত একবার চিন্তা কর। মানুষ আকাশের বিদ্যুৎকে ধরিয়া আপনার ঘরের প্রদীপ করে, নিজের আয়ত্তাধীনের মত যথা ইচ্ছা ব্যবহার করে। মানুষ সমুদ্রের মধ্য দিয়া, গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া, উন্নত পর্ব্বতশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ সুবিধার্থ সোজা পথ প্রস্তুত করে। নানাপ্রকারে মানুষের

অসীম শক্তির পরিচয় পাইবে। হে ব্রাহ্মগণ, বল তোমাদের কোন্ শক্তি আছে? যে শক্তি আছে আজ তাহা প্রকাশ কর। যদি কোন শক্তি প্রকাশ না কর, তবে তোমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্তান নহ। কিরূপে বলিব মানুষের শক্তি নাই? কাল যাহার কিছুই ছিল না আজ তাহার কত হইয়াছে! কাল ভিখারী, আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী। ইহাতে মানুষকে শক্তিহীন বলিব কিরূপে? তবে যে তারতম্য দেখ, তাহার কারণ এই। দুইটী চক্রের শক্তিতে এই পৃথিবী চলে। তাহার একটী স্বার্থ, আর একটী পরমার্থ। যদি এই স্বার্থের চক্র জীবনে সংযোগ কর, তবে এই কলিকাতায় চারিদিকে যাহা হইয়াছে, তাহা তোমাদের হইবে। আর যদি পরমার্থের চক্রে জীবনকে চলিতে দাও, সেই চক্রের শক্তিতে তবে জীবন পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। কিন্তু পরমার্থের চক্র বড় চলে না। যেমন জগন্নাথের চক্র সর্ব্বদা চলে না, পুরীর কর্দ্দমময় পথে অচল হইয়া পড়িয়া থাকে; কিন্তু আষাঢ়ের উৎসবে নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া সজোরে চালাইয়া দেয়। এই কলিকাতার পথে উৎসবের সময় এই ধর্ম্মরথচক্র সেইরূপ যেদিন চলিয়া গিয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। আজও তোমাদের সেই শক্তি আছে। যাহাতে এই শক্তি চির অব্যাহত থাকে তাহা করিতে হইবে। তোমরা বলিতে পার আমাদের ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, সম্পদ্ নাই, লোকবল নাই; সুতরাং কেমন করিয়া সেই সোণার ধর্ম্মরথ এই জীবনের উপর দিয়া চালাইতে সমর্থ হইব? কিন্তু এই কথা সত্য নহে। শক্তিরাজ্যে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়। বিজ্ঞানবলে, জ্ঞানপ্রভাবে, এক সময় মাটী সোণা হইবে। তাহা হইয়া থাকুক আর না থাকুক, শক্তি-রাজ্যে এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। দুইটী কাঠি

লইয়া ঘর্ষণ কর, তাহা হইতে তাত উৎপন্ন হইবে, আরও ঘর্ষণ কর, তাহা হইতে এত আগুণ উৎপন্ন হইবে, যাহা দ্বারা এই কলিকাতা দগ্ধ হইয়া আর এক মূর্ত্তি ধরিতে পারে। আরও যদি চেষ্টা কর, ইহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে, যাহার প্রভাব ও শক্তি অতি বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। তেমনি দুটী লোক একত্র হইয়া ধর্ম্মের আলোচনা কর, পরস্পরে পরলোক চিন্তার সহায় হও। স্বার্থের দড়ি কাটিয়া দিয়া পরমার্থের নামে জীবন উৎসর্গ কর, তবেই দেখিতে পাইবে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, অশক্তি মহাশক্তি প্রকাশ করিতেছে। পরমার্থের চক্র জীবনে সংযুক্ত করিলেই জীবন আপনা আপনি স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে।

আমি বলিতেছি, শক্তি দ্বারা জড়ও চেতন হয়। তোমরা বলিতে পার, এই লোকটী এত বাড়াবাড়ি করিতেছে কেন? কিন্তু তাহা নহে। আমি ইহা সপ্রমাণ করিতেছি। আমি একাকী এই নগরের পথে বেড়াইতাম, আপন ভাবে আপনি কত ভাবিতাম, তোমরা তাহা কিছু জানিতে না। উৎসব আসিল, কি হইবে, কি করিব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এমনিই কি এক শক্তি কোথা হইতে আসিয়া আমাকে সচেতন করিয়া দিল যে, তাহাতে আমি তোমাদের সঙ্গে উৎসবে মাতিয়া গেলাম। ইহাতে কি ফল ফলিবে ভাবিলাম না। অজানিতের হস্ত ধরিয়া তোমাদের কাছে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার ছেঁড়া নেকড়ার পুটলী তোমাদের সমক্ষে আনিয়া রাখিলাম। ইহাতে কি হইল তাহা তোমরা কিছু কিছু বুঝিয়া থাকিবে। বল ইহা জড়ে চৈতন্য কি না? একা গৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া দেশ মাতাইলেন। সেই শব্দে চট্টগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভারত উন্মত্ত হইল। একা শাক্য মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতকে মাতাই-

লেন। এই শব্দে চীন, তাতার, জাপান পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইল। বল, ইহা জড়ে চৈতন্য দান কি না?

অতএব বলি, জীবনে পরমার্থের চক্র সংযোগ কর। যেমন তুইটী কাটির সংযোগে তেজ, অগ্নি, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া কত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করে, তেমনি তোমাদের শক্তি এই প্রকার ফুটিবে যে, তাহা দ্বারা তোমাদের জীবনে অসম্ভব ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে। স্বার্থের হাত হইতে শক্তিকে পরমার্থের হস্তে সমর্পণ কর। একজনের শক্তি শত জনের শক্তি হইবে। শত জনের শক্তি এক জনের শক্তিতে সমাগত হইবে, এবং ইহা হইলেই তোমাদের জীবন অসাধারণ হইবে; এই সমাজ অসাধারণ সমাজ হইবে; এই ধর্ম্ম অসাধারণ ধর্ম্মরূপে সমস্ত জগৎকে অধিকার করিবে। আমি ইহা বলি না যে, তোমরা ইহাতে বড় মানুষ হইবে। কিন্তু ইহা বলি যে, ইহাতে তোমাদের জীবন অসাধারণ হইবে, লোকালয় ব্রহ্মময় হইবে; প্রত্যেকের জীবন দেবনিঃশ্বাসে পূর্ণ হইয়া দেবালোকসম্পন্ন হইবে। আবারও বলি, অসাধারণ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছ, অসাধারণ লক্ষ্য স্থির করিয়াছ, অসাধারণ সমাজে আসিয়াছ, অসাধারণ জীবন লাভ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছ, সুতরাং এই ব্রত সাধনে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ কর। সকল অনর্থ ও মৃত্যুর মূল, স্বার্থকে জানিও। অতএব হে পরমার্থপ্রয়াসী বন্ধুগণ, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত পরমেশ্বরের শরণাগত হও।

হে অনন্ত, হে অসাধারণ কার্য্যকারী, এই জগৎ জড়ময় না চৈতন্যময়? তোমার অনন্ত শক্তি এই জগতে এমনি সংযুক্ত রহিয়াছে যে, এই জগতের প্রতি তাকাইলে সহসা কিছুই জড়ময় মনে হয় না। হে সর্ব্বশক্তিমান্, যে শক্তিতে এই জগৎকে চালাও, আমাদিগকে কি সেই

শক্তিতে পরিচালিত করিতে পার না? যদি না পার তবে কেন আমাদের প্রাণ আকাশের অনন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনন্তের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়, যদি না পার তবে কেন প্রভাতের সূর্য্য দেখিয়া মন অনন্তের ভাবে ভাবুক হয়? স্থলপদ্মের শোভা দেখিয়া সলিমানের সিংহাসন অপেক্ষা তাহার শত শ্রেষ্ঠতা মনে হয় কেন? হে অনন্ত মহান্, তোমার শক্তিতে আমরা আচ্ছন্ন। আমাদিগকেও তুমি শক্তি দিয়াছ। আমাদের সেই শক্তিকে সংসার হইতে, স্ত্রী হইতে, বিষয়বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমাতে স্থাপন কর। তোমার শক্তি যেন কেবল তোমাকেই অন্বেষণ করে। আমাদিগকে যে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়াছ, তাহাকে অহঙ্কার হইতে টানিয়া লইয়া তোমার চরণপ্রান্তে স্থাপন কর। আমার চিন্তা, জ্ঞান, ভক্তি তোমাপ্রাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই যেন কামনা না করে। তবেই এই লৌকিক জীব অলৌকিক হইয়া জীবে ব্রহ্মে যে মহাভেদ তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে। হে পরমেশ্বর, এই ব্রাহ্মসমাজ অনেক আশা করিয়াছেন, তৎসমুদয়কে বজায় রাখিও। যাহার ভিতর যত কিছু আছে, সমস্ত একত্র করিয়া এই সমাজকে উদ্ধার কর, বলবান্ কর। আমরা অসাধারণ জীবন লাভ করিব বলিয়া তোমার আশ্রয় লইয়াছি। যাহাতে এই বাসনা পূর্ণ হয় এই আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীপাদপদ্মে সকল আশা ভরসা সমর্পণ করিয়া আশাভক্তিভরে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ।

রবিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৮১৯ শক ;
২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮খৃঃ।

বেদান্তদর্শনে দুইটী মত আছে। একটী বিবর্ত্তবাদ, অপর পরিণামবাদ। বিবর্ত্তবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত, পরিণামবাদ শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত। বিবর্ত্তবাদ কি ?—সমুদয় সৃষ্টবস্তু এবং ব্রহ্ম একরূপ। সৃষ্টবস্তু ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং একাকার—এক। কেবল ভ্রমবশতঃ আমরা নানারূপ দেখি এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টবস্তু স্বতন্ত্র মনে করি। ব্রহ্মে কোন পরিবর্ত্তন নাই ; সুতরাং সৃষ্ট জগতেও কোন পরিবর্ত্তন নাই। আর পরিণামবাদ কি ?—যদিও সকল সৃষ্ট বস্তুর নিম্নে ও গভীর প্রদেশে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব আছে, কিন্তু সেই একত্ব ব্রহ্মের ইচ্ছাতে নানারূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ উন্নতির পর উন্নতি, পরিণামের পর পরিণাম আছে। সৃষ্ট আত্মা এই নিয়মের অধীন হইয়া উন্নতি লাভ করিতে করিতে ব্রহ্মলাভ করেঁ ও ব্রহ্মসহ একাকার হয়। সংক্ষেপে এই দুই মতের সার মীমাংসা এই। এইক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের জীবনে এই দুই মতের প্রভাব কত দূর। আমরা একরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মানি। কারণ আমরাও স্বীকার করি, ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, তুরীয় ও কূটস্থ। ব্রহ্ম পূর্ব্বেও যাহা, পরেও তাহা। ব্রহ্ম, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করেন না। তিনি নির্ব্বিকল্প ও একরূপ। কিন্তু ইহা মানি বলিয়া ব্রহ্ম ও সৃষ্ট জগৎ এক ও অভিন্ন ইহা আর মানি না। অথবা সৃষ্টির কোন উন্নতি নাই তাহাও

স্বীকার করি না। অধিকন্তু আমরা পরিবর্ত্তনবাদী ; আমরা আত্মারও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতি মানি। ক্রমাগত মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, উন্নতির পর উন্নতি হইতেছে। এই প্রকার অসীম পরিবর্ত্তন ও উন্নতির প্রভাবে মানুষ যতই ভ্রম ও মায়াবর্জ্জিত হইবে, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে অবস্থিতির যাবতীয় অন্তরায় যতই চলিয়া যাইবে, ততই জীবাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ ও নিত্যযোগের উপায় সুনির্দ্দিষ্ট হইবে! ইহাই আমাদের মত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সঙ্গে এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতের সঙ্গে অধিকাংশ বিষয়ে আমাদের ঐক্য আছে। মতের সঙ্গে মতের ঐক্য হইল বটে, কিন্তু আমাদের জীবন ও মত কতদূর এক হইয়াছে তাহা আলোচনার বিষয়।

আমরা সৃষ্ট আত্মাতে অসংখ্য পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতি স্বীকার করি ; কিন্তু আমাদের জীবনে কি উন্নতি দেখা যাইতেছে? এই গত চতুর্দ্দশ বৎসরে আমাদের জীবন কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে? আমরা জীবনের পরিণতিতে গেলাম, না বিবর্ত্তের পথে পড়িয়া যাহা ছিলাম, তাহাই রহিলাম? পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, আমরা প্রকৃতির এই শক্তিকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিহত করিতে পারি নাই ; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে উন্নতি কই? কালের ভীষণ আঘাতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কিন্তু আমাদের সুবুদ্ধি, সুকৌশল, নিষ্ঠাপূর্ণ যত্ন ও আত্মত্যাগ সেই বিচূর্ণের ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আরও সুন্দর, সুগঠিত, সুরঞ্জিত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, বিচিত্র জীবন-অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে ইহাত দেখিতে পাইতেছি না। এই পৃথিবীতে যদি আমাদের উন্নতি না হইল তবে পরে যে উন্নতি হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি?

পৃথিবীতে তিন প্রকার উন্নতি দেখা যায়। প্রথম প্রকার উন্নতি স্বভাবশক্তির ঘাতপ্রতিঘাত জনিত। এই উন্নতির ক্রম অনন্ত উন্নতির অন্তর্গত নহে। যেমন পর্ব্বত, সাগর, নদ, নদী। দ্বিতীয় প্রকার উন্নতি স্বভাবের সীমাবদ্ধ উন্মেষ। ইহার ক্রমও অনন্ত উন্নতির অন্তর্নিবিষ্ট নহে, যথা পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় ইতর প্রাণী। গো-বৎস দিন দিন বড় হয় বটে, কিন্তু এমন অবস্থায় তাহাকে যাইতে হয়, যখন আর তাহার উন্নতি হয় না। অণ্ড ভাঙ্গিয়া যখন পাখী বাহির হয়, তখন তাহার গান করিবার শক্তি থাকে না। ক্রমে তাহার পাখা দৃঢ় হয়, আকাশে বিচরণ করিয়া সঙ্গীত করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের এই সীমাবদ্ধ উন্নতির ভিতরে কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহার জাতীয় পাখীদের যেমন পাখা, যেমন চলাফিরা, যেমন সঙ্গীত, ইহার তাহাই হয়। কোকিলের গান কখনও অন্য রকম হয় না। স্বর্গীয় হোমা পাখী কখনও আপন পাখা পরিবর্ত্তন করে না। অর্থাৎ পশু পক্ষীদিগের উন্নতি চিরকাল যাহা ও যেমন হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত কিছু হয় না।

তৃতীয় প্রকার উন্নতি অনন্ত উন্নতিশীল। স্বভাবের পূর্ণ বিকাশময় মানবাত্মাই এই উন্নতির অধিকারী। আত্মার উন্নতি অতি বিচিত্র। ইঁহাতে এত পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি দেখা যায়, যাহা মানুষের ভাবনা ও সাধারণ ধারণার অতীত। প্রত্যেক জীবনে ইহার ক্রম নূতন, সম্ভাবনা নূতন, সিদ্ধি নূতন। মানবজগতের ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু কতকগুলি কেন, অধিকাংশ মনুষ্যের ভিতর দেখা যায়, তাহারা একবার যে উন্নতি লাভ করে তাহা আর ঊর্দ্ধমুখী হয় না, বরং ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হন, মানুষের ভিতরে নিত্য পরিবর্ত্তন ও অনন্ত উন্নতির যে মত

তাহা ভ্রান্তিমূলক। পশুপক্ষীদিগের মত মানুষেরও যতদূর উন্নতি হইবার তাহা হইলে উন্নতির দ্বার চির অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

তোমরাও যদি মনে কর যে, যে উপাসনা করিয়াছ তাহার আর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি নাই, যে চরিত্র লাভ করিয়াছ, তাহাতে আর বিকশিত হইবার কোন অংশই অবশিষ্ট নাই, যে মত ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, যে বৈরাগ্য সাধন করিয়াছ তাহা পূর্ণ বৈরাগ্য, যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছ, তাহাই ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ; এই যদি তোমাদের ব্রহ্মলাভ হয়, তবে তোমরা আর কি লাভ করিলে? ব্রহ্ম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের জীবনের পথ দেখাইয়া দিলেন, তোমরা ব্রহ্মের কৃপাতে পবিত্র ব্রহ্মপরিচয় পাইলে, যদি ইহা চির উন্নতিশীল না হয়, তবে তোমরা এই বিধানে কেন আসিলে?

যাহা হইয়াছে, তাহাই যদি তোমাদের জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছ, তাহাই যদি পূর্ণ ধর্ম্ম হয়, যে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে, তাহাই যদি বিশ্বাসের পূর্ণ আলেখ্য হয়, তবে তোমাদের ভিতরে নববিধানের বীজ নিহিত ছিল একথা স্বীকার করিতে পারি না, এবং তোমরা যে নবধর্ম্মের গৌরব কর, তাহাও নিতান্ত অসার মনে করি। কারণ ইহাতে পুরাতন ধর্ম্মবিধানের লোক হইতে তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠতা কিছুই হয় নাই। তোমাদের অপেক্ষা অনেক শিখ, ও বৈষ্ণবের বৈরাগ্য কি অধিক নহে? তোমাদের অপেক্ষা অনেক সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগ কি শ্রেষ্ঠ নহে? তোমাদের অপেক্ষা শত শত হিন্দু নারীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহু পরিমাণে অধিক নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা কি দেখা যায় না? কত কত খ্রীষ্টান তোমাদের অপেক্ষা শত গুণ মনের অনুরাগে কি পরসেবাব্রত পালন করেন না? তবে তোমাদের অধিক গৌরব কি? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা

প্রতিদিন সত্য, জাগ্রত, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময়, সুখময় ঈশ্বরের কথা বল; কিন্তু তোমাদের জীবনে ইহার প্রভাবে যে অমৃত সঞ্চয় হইবার কথা, নিত্য প্রেমাধারের প্রেমসহবাসে জীবন যে নিত্য নূতন ও উন্নত হইবার কথা, পুণ্যময়ের পুণ্যজলে বিধৌত চরিত্র যে সুন্দর ও পবিত্র হইবার কথা, তাহার কতদূর হইল বল?

১৪ বৎসরে শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি কি নূতন হয় নাই? যুগান্তের উন্নতি ধর্ম্মইতিহাসের নূতন এক অধ্যায় পূর্ণ করে, তবে তোমরা কেন একভাবে পড়িয়া রহিলে? কোন উন্নতি কেন হইল না? তবে বুঝি, সর্ব্বোত্তম যিনি, সার যিনি, তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই; তবে বুঝি, আমরা যে উপাসনা করি, তাহা সত্য উপাসনা নহে; তবে বুঝি, আমরা যাহাকে সত্য বলি, তাহা বুঝি নাই; তবে বুঝি, আমরা যে উচ্চ ও চির উন্নতিশীল ধর্ম্মবিধানের কথা বলি, তাহার আশ্রয় আমরা পাই নাই। অগ্নিস্পর্শে বস্ত্ররাশি দগ্ধ হয়, পুণ্যময়ের পুণ্যাগ্নিতে কেন তুমি দগ্ধ হইলে না? ভিজা দিয়াশলাই একশতবার টান, আগুন বাহির হইবে না। তোমার জীবন তেমনি হইয়াছে; পুণ্যাগ্নি তাহাতে জ্বলিবে না। যদি উন্নতির পথে না যাও, যদি অনন্তের জন্য ব্যাকুল হইতে না চাও, যদি পরিবর্ত্তনে এত ভীত হও, তবে কাষ্ঠ লোষ্ট্র হইলে না কেন? যদি চির উন্নতিবিমুখ হইবে, তবে পশুপক্ষীর জীবন লাভ করিতে অভিলাষী হইলে না কেন?

ব্রহ্ম ২০ বৎসরেও তোমাদের জীবনে দেবস্বভাব দিতে পারিলেন না, তোমাদের চরিত্রে দেবচরিত্র সংযোগ করিতে পারিলেন না, পবিত্রতার আগুনে তোমাদের পাপ দগ্ধ হইয়া গেল না। তোমরা কোন এক প্রবল শক্তির প্রভাবে যেন কতক দূর পরিচালিত হইয়া সে স্থানেই জড়ের মত

দাঁড়াইয়া রহিলে, ইহা কতদূর পরিতাপের বিষয় একবার চিন্তা কর। হিন্দু, মুসলমান সকলেই ভবপারে চলিয়া গেল, অনন্তের পথের পথিক, অনন্তের ভাবনার ভাবুক, অনন্তের প্রেমপ্রয়াসী হইবার অঙ্গীকার করিয়াও, হে ব্রাহ্ম, তুমি কেন নিরাশ হইয়া পড়িয়া রহিলে? তোমরা যদি যাহা হইয়াছ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে চাও, অথবা কেবল এই বক্তৃতা শুনিয়াই চলিয়া যাইতে চাও, যদি উপাসনাতে উন্নতি না হয়, ব্রহ্ম আরাধনাতে নূতন সত্য, নূতন আনন্দ, নূতন ধন না চাও, যদি নব নব অনুরাগে ব্রহ্মপূজা না কর, নূতন উৎসাহ উদ্যমে জগতের সেবা না কর, তবে আমার প্রাণ তোমাদের সঙ্গে এক হইবে কিরূপে? যদি উন্নতি না চাও, যদি জীবনকে ব্রহ্মের ইচ্ছাস্রোতে ভাসাইয়া না দাও, তবে এই মিলন থাকিবে না। ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ পাইয়া যদি তোমরা তাহার ফল জীবনে ফলিতে না দাও, তবে তাঁহার অভিসম্পাতের ভাগী হইবে। যদি আর অগ্রসর হইতে না চাও, যদি নূতন কিছু না কর, যেমন ছিলে, তেমনি থাকিবে মনে করিয়া থাক, তবে আমাকে বিদায় দাও। মিলন ইহা নহে। বৃদ্ধের শীতল রক্তে যুবকের উষ্ণ রক্তের মিলন না হইলে মিলন হইল না। শক্তি শক্তিতে মিলিয়া প্রবল শক্তি না হইলে মিলন হইল না। যাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আকারে গঠন না করিলে মিলন হইল না। মিলনের উদ্দেশ্য উন্নতি। দুইটী শক্তির মিলনের উদ্দেশ্য প্রবল শক্তি হওয়া। যদি তাহা না হইল, তবে মিলন কি? এবং মিলন স্থায়ী হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া, ভাব লইয়া, বাসনা লইয়া, অনেক লোক মিলিত থাকা সম্ভবপর নহে। যাহারা মিলিত থাকিবে তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, প্রাণগত আগ্রহ এক হওয়া আবশ্যক, প্রত্যেকের বিভিন্ন কার্য্য

থাকিলেও সকল কার্য্যের মূল একস্থানে নিহিত রাখিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড সৌর জগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের কার্য্য স্বতন্ত্র, তথাপি তাহারা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যথার্থ মিলন এইরূপ হইবে। যদি সম্পূর্ণ মিলন না চাও, তবে মিলনে কি ফল? একাকী ব্রহ্মসহবাসসুখসম্ভোগের ন্যায় প্রীতিকর, আনন্দজনক, শান্তিময় কি আছে? মিলনের যথার্থ উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হইল, তবে একাকিত্বই চিরবাঞ্ছনীয়।

আমি অনেককাল তোমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এখন আমার পরলোকে অবস্থিতির সময়। সেই দিন আমার নিকটবর্ত্তী, যে দিনে অনেক মিলন, অনেক সহানুভূতি, সম্পূর্ণ একমত না হইলে আর মন উঠে না। এখন এতটুকু মিলনে, সামান্য সহানুভূতিতে সুখী হইতে পারি না। অতএব হয় এস, পরিবর্ত্তনের পথে থাকিয়া অনন্ত উন্নতির স্রোতে ভেসে যাই, নতুবা সব ছাড়িয়া একাকী হই। হয় নবধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, নবধর্ম্মের আলোক হস্তে করিয়া জগতে সমস্ত নর-নারীর পথপ্রদর্শক হই, উদার মনে জগতের সেবা করি, না হয় চল, পুরাতন ধর্ম্মবিধানের আদেশ স্বীকার করিয়া নিজ নিজ জীবনের অভ্যন্তরে জীবনসখার সঙ্গে অভেদ্য যোগে আচ্ছন্ন হই। আমার আশা অতি উচ্চ। সকলকে সঙ্গে করিয়া অনন্ত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে মন ব্যাকুল। সুতরাং আবারও বলি, জীবনে বিবর্ত্তবাদ পরিত্যাগ কর, পরিণামবাদী হও। পরিণাম ও পরিণতি কত দূরে জান না। অতএব নিত্য পরিবর্ত্তন ও তাহাতে উন্নতির যে বিধি পরমেশ্বর বিধান করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। কৃপাময় ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাউন।

হে ব্রহ্মসনাতন, এক অবিনাশী পিতা, বিবর্ত্তবাদী হইয়া যেন আপনাকে হারাইয়া না ফেলি, আমার নিজ অস্তিত্ব যদি ভুলিয়া যাই, তবে তোমাকে দেখিয়া সুখী হইবে কে ? যদি তোমার জগতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির বিধি স্বীকার না করি, তবে তোমার দর্শন কোথায় পাইব ? যাহারা তোমাকে যথার্থ ডাকে, তাহারা কখনও অলস হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে না। অতএব যাহারা তোমাকে প্রাণে আগ্রহ লইয়া যথার্থ ভাবে ডাকে, তাহাদের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর। স্বর্গীয়গণ তোমার গভীর প্রেমে মগ্ন আছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি আমাকে তোমার নিকটস্থ করে। সেই চির উন্নতিশীল আত্মা সকলের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া দাও।

হে লোকভঙ্গনিবারণ, অনেক দিনের চেষ্টাতে যে মিলন হয়, এক দিনে এক জনের কথাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক দিন খুঁজিয়া যে দ্বীপ প্রাপ্ত হই, কি জানি কি স্রোতের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, উচ্চ আকাশে উড্ডীয়মান নিশান যেন সামান্য বায়ুর আঘাতে ভূতলে পতিত হয়। পিতা, তোমার মনে যাহা আছে তাহা কর। কেবল এই প্রার্থনা করি, বৃদ্ধগণের সাধনের অহঙ্কার, যুবকগণের আত্মজ্ঞানের অহঙ্কার বিচূর্ণ কর। সকলের চরিত্রকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা কর, শাসন কর, উন্নতির দ্বারের সুদৃঢ় অর্গল ভগ্ন করিয়া দাও। সকলের হৃদয়ের দ্বার যদি ভাঙ্গিয়া না দাও, তবে ইহা এক প্রকাণ্ড হৃদয় হইবে না, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মতের বন্ধনী যদি ছিন্ন না কর, তবে এক মত হইবে না। যদি বহু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা তুমি প্রবল শক্তিতে সম্পাদন কর। যদি এইবার কোন মণ্ডলী হইয়া থাকে, তবে এই মণ্ডলী সমবেত শক্তি দ্বারা তোমার আশীর্ব্বাদ লইয়া

যেন পরস্পরকে শাসন করে, পরস্পরের সহায় হয়, পরস্পরকে যথার্থ প্রেমে যেন ভালবাসে। এই মণ্ডলীকে অখণ্ড ও চির উন্নতিশীল কর। প্রেমময়, তুমি আমাদের আশা ভরসা, তোমাতে একান্ত বিশ্বাস ভক্তি সমর্পণ করিয়া আশাপূর্ণ অন্তরে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

ধর্ম্মমণ্ডলী।

রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮১৯ শক ;
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮ খৃঃ।

ঈশা তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে বলিয়া গেলেন, তোমরা যখন দুই তিন জন মিলিত হইয়া স্বর্গীয় পিতাকে ডাকিবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যে আসিব এবং তোমাদের উপাসনাতে যোগ দিব। বৈরাগিগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গকে আহ্বান করেন। ইদের দিনে দিল্লীর জুমামস্‌জিদে হাজার হাজার লোক এক ইঙ্গিতে উঠে বসে, এক ইঙ্গিতে প্রার্থনার ভাব গ্রহণ করে, এক সঙ্গে প্রার্থনা আরম্ভ করে। ঈশ্বরের পূজাতে. ঈশ্বরারাধনাতে এরূপ দশ জনের, শত জনের, হাজার জনের দলবদ্ধ হইবার তাৎপর্য্য কি ? ঈশাই বা কেন তাঁহার পরিত্যক্ত মণ্ডলীতে পুনঃ পুনঃ আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ? ঈশ্বরের নামে যাঁহারা মিলিত হন, তাঁহাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি ? এই সমবেত দলের নাম কি ? এইরূপে যাহারা দলবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকে, এইরূপে যাহারা প্রাণের এক আগ্রহে পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ে মিশিয়া যায়, তাহাদের সমবেত দলের নাম ধর্ম্মমণ্ডলী। এই মণ্ডলীগত যোগ ও একতা চির অচ্ছেদ্য। ইহারা যখন জীবনের বিবিধ কার্য্যে বিব্রত থাকে, আমোদ আহ্লাদ করে, তখন ইহারা পরস্পর মতে ভিন্ন থাকিতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরের পূজার জন্য তাঁহার পবিত্র বেদীর পার্শ্বে যখন ইহারা একত্র হয়, তখন পরস্পরের হৃদয় এক হয়, একাত্ম হইলে ইহাদের ধর্ম্মগত মিলনরজ্জু সুদৃঢ় হয়। ইহাকেই ঈশ্বরের পরি-

যার বলা যায়। ধর্ম্মমণ্ডলী কেবল ইহলোকস্থ সমবিশ্বাসিগণের একতার ভূমি নহে। এই মণ্ডলীর ভিতরে ইহপরলোকস্থ সমবিশ্বাসী সমস্ত আত্মার সম্মিলন, যোগ ও একতা সন্নিবিষ্ট। সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলী কত সুদূরব্যাপী এবং ইহার শক্তি কত প্রবল, একবার ভাবিয়া দেখ।

সে দিন মণ্ডলীর বিষয় অনেক আলোচনা করিয়াছি। মণ্ডলীর জীবনে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এবং তাহাতে পরব্রহ্মের শক্তি ও কার্য্য দেখাইলাম। ঈশ্বর বীজ হইতে অরণ্য উৎপাদন করেন, অল্পসংখ্যক মনুষ্য হইতে এত বড় মনুষ্য-জগৎ রচনা করিয়াছেন, এক ঈশা হইতে কত প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী হইল, এক শাক্য হইতে কত প্রকাণ্ড বৌদ্ধ সঙ্ঘ প্রস্তুত হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিতে এই সকল অসম্ভব কার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে। আজ বলিতে চাই, ইহাতে মানুষের কর্ত্তব্য কি? ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু আমাদের জীবনে কোন সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠান করিতে কেবল তাঁহার চেষ্টা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহা মনে হয়, ইহাতে অর্দ্ধেক তাঁহার কার্য্য, অর্দ্ধেক মানুষের কার্য্য। কোন কার্য্য সেই অসীম করুণা-নিলয়ের করুণা ভিন্ন হয় না বটে; কিন্তু তোমার নিজের চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ না থাকিলে, বল, কি হইতে পারে? ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কাহার প্রতি নাই? অনন্ত স্নেহময় কাহাকে স্নেহ করেন না? কিন্তু কত জন দেবচরিত্র লাভ করে? কত জন ধর্ম্ম-মণ্ডলীর শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ হইয়া মণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করেন? এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি? ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার সঙ্গে, মানুষের আত্ম-জীবন উন্নত করিবার প্রয়াসের যোগ না থাকা, ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করিবার জন্য মানুষের হৃদয় বিমুখ থাকাই কি ইহার কারণ নহে? নিজ নিজ চরিত্র ও জীবন উন্নত, পবিত্র ও স্বর্গীয় করিবার জন্য যেমন

প্রত্যেক মানুষের যত্ন চেষ্টার আবশ্যক, মণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ ও পবিত্রতা সাধন জন্যও তেমনি মণ্ডলীস্থ প্রত্যেকের যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহ প্রয়োজন। তোমার একজনের জীবনের কল্যাণ সাধন জন্য যদি এত আয়াস স্বীকার প্রয়োজন হয়, তবে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীর কল্যাণের বিষয় ভাবিতে আরও কতগুণে অধিক যত্ন আবশ্যক, ভাবিয়া দেখ। মণ্ডলীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে অতি গভীর সম্পর্ক এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব অতি গুরুতর। একজনের উন্নতি অবন তর সঙ্গে শত জনের উন্নতি অবনতির মূল সংযুক্ত। শত শত জনের জীবনের শক্তি ও পবিত্রতা দ্বারা প্রত্যেক জন উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন। এই উপাসনাতে যদি তোমরা সকলে না আস, তবে এক জন কি করিতে পারে? আবার তোমরা যদি সরল ভাবে, প্রাণের আগ্রহে উপাসনাতে যোগদান না কর, ভাবের ঘরে চুরি কর, ধ্যানের ঘরে তন্দ্রা ভোগ কর, প্রার্থনার দ্বার কপটতার জালে আবৃত রাখ, তবে তোমাদের লইয়াই বা কি হইবে? মনের অভিপ্রায়, আগ্রহ, বাক্য ও কার্য্য এক না হইলে তেমন কোন একটী জীবন প্রস্তুত হয় না। তেমনি মণ্ডলী সম্বন্ধে অভিপ্রায়, আগ্রহ, প্রত্যেকের বাক্য ও কার্য্য যতক্ষণ না এক ভাব ধারণ করিবে, ততক্ষণ মণ্ডলীর শক্তিসম্পন্ন জীবন গঠিত হইবে না। প্রত্যেক মানুষের জীবন প্রস্তুত করিবার জন্য উহার উপাদান সমস্ত মধ্যে পবিত্রতা যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, মণ্ডলীর জীবনেও পবিত্রতা তেমনি সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়। যেখানে সামান্য অপবিত্রতাও বিদ্যমান, সেখানে সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে মণ্ডলীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমরা যত্নবান্ হও। প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনের পবিত্রতা ও সমবেত মণ্ডলীর পবিত্রতা যদি পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, তবে

এই মণ্ডলী পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমণ্ডলী অপেক্ষা বলবান্ হইবে, ইহাতে কিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চার্চ্চ শব্দ আমাদের মণ্ডলী শব্দের নামান্তর মাত্র। তাঁহারা এই চার্চ্চকে কখনও ঈশ্বরের শরীর বলেন, কখনও বলেন চার্চ্চ ঈশ্বরের বিবাহিতা পত্নী, কখনও বলেন চার্চ্চ ঈশ্বরের আবাস গৃহ, কখনও বলেন ইহা আত্মাসকলের বাসভূমি। ইহার প্রত্যেক কথাই সত্য। কারণ মণ্ডলী ও ঈশ্বরের মণ্ডলীতে কোন তফাৎ নাই। ঈশ্বর তাঁহার এই মণ্ডলীর সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমসম্বন্ধ যাহাতে বুঝায় সেই প্রকার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং ধর্ম্মমণ্ডলীরূপ সুখদ গৃহেই যে আত্মা সকল বাস করেন, ইহাতেও আর কোন সন্দেহ নাই। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলী এক একজন মহাত্মার আকার, এবং এই মহাত্মাদিগের ধর্ম্মের অবয়ব লইয়া আত্মা সকলের অবয়ব গঠিত হয়। যাবতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এক একজন মহাত্মার জীবনের সমস্ত শক্তি, যত্ন, আগ্রহ, উৎসাহ, কার্য্য মণ্ডলীর রক্ত মাংস হইয়া উহাকে আকার দান করা হইয়াছে।

অতএব প্রথম কথা এই যে, যাঁহারা এখানে আসিয়া এক মণ্ডলী-রূপে পরিণত হইতেছেন, তাঁহারা প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, বাক্যে ও কার্য্যে এক হইয়া যাইবেন, এবং এই মণ্ডলী ঈশ্বরের সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করিবেন; অপিচ এই মণ্ডলীর অবয়বের ভিত্তি কোন একজন মহাপুরুষের সমস্ত জীবনের পরিণতির উপর সংস্থাপিত দেখিতে পাইবেন।

তৎপরে কথা এই যে; প্রত্যেক ধর্ম্মমণ্ডলীর ভজনালয় আছে। খ্রীষ্টানদিগের চার্চ্চ, মুসলমানদিগের মস্‌জিদ, ব্রাহ্মদিগের মন্দির আছে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। ইহাতে লোকের এত আকর্ষণ থাকে যে, এইজন্য প্রাণ দিতেও লোকে ভয় করে না ও কুণ্ঠিত হয় না। জান তো সে দিন টালার একটী সামান্য মস্‌জিদ রক্ষার জন্য কত রক্তপাত হইল। আমাদেরও মন্দির ছিল। এই মন্দিরের পরিণাম কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। যাহা হউক, মন্দির একটী বাহিরের বিষয়। মানুষের ধর্ম্মভাব যদি প্রবল হয়, যথার্থ ধর্ম্মপিপাসাতে কোন ধর্ম্মমণ্ডলীর জীবন যদি উন্নত হয়, তবে মন্দির নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব কিছুই নহে। ঈশ্বরের পূজামন্দির সর্ব্বাগ্রে জীবনে রচিত হয়, তৎপরে উহার বাহ্য আকার পৃথিবীর ভূমিতে দেখা যায় মাত্র। পূজার গৃহ হইলেই যে ধর্ম্ম হইল তাহাও নহে। অনেক মন্দির দেবালয় ডাকাতের আড্ডা হয়, নর্ত্তক নর্ত্তকীর অভিনয়ক্ষেত্র হয়। তোমরা কি জান না, সলিমানের ধর্ম্মমন্দির হইতে ঈশা কত দুরাচারী দস্যুকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন?

অতএব কেবল মন্দির হইলেই হইল তাহা নহে। কতকগুলি লোক চাই, যাহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবে। ধর্ম্মমণ্ডলীতে বিশেষ লোকের স্থান অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলের সমান স্থান ইঁহারা অভিলাষ করেন। পৌরোহিত্যের প্রতি অনেকে বিরক্ত। নানা কারণে এই বিরক্তির হেতুও আছে। কিন্তু অন্যপক্ষে যথেষ্ট বলিবার অবকাশ আছে যে, এই প্রকার কতকগুলি লোক নিতান্ত আবশ্যক, যাঁহাদিগকে মণ্ডলীর আসনে সাধারণে ভিন্ন স্থান দিন আর না দিন, যাঁহাদের স্থান স্বভাবতঃ ভিন্ন হইবেই। ইহা সম্ভব নহে যে, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে সমস্ত লোক আত্মত্যাগী, বৈরাগী এবং ধর্ম্মের জন্য প্রাণ, মন, শক্তি, কার্য্য, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে। মণ্ডলীর সমস্ত লোক পবিত্রচরিত্র, সাধু-

জীবনসম্পন্ন ও পরস্পর হিতসাধনেচ্ছু এবং যথাসাধ্য উপাসনাশীল হইতে পারেন; কিন্তু সমস্ত লোক আত্মত্যাগী হইবে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু কতকগুলি সর্ব্বত্যাগী লোক ভিন্ন ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংসিদ্ধ হয় না। সুতরাং যাঁহারা এই প্রকারের জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থান না দেওয়া কাহার সাধ্য? যদি ইহা অস্বীকার কর ধর্ম্ম থাকে না। যাহারা ইহার বিরোধী, তাহাদিগকে নাস্তিক বলি আর না বলি, ধর্ম্মের অনিষ্টকারী অবশ্যই বলিব। ঈশার ধর্ম্মে, মোহম্মদের ধর্ম্মে, শাক্যের ধর্ম্মে, চৈতন্য ও নানকের ধর্ম্মে এই প্রকারে প্রথমে মহাপুরুষ, তৎপরে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী কতকগুলি চিহ্নিত লোক স্বীকৃত হইয়াছেন। ইঁহাদের স্থান এই সকল ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। আমরা যদি মণ্ডলীগত ধর্ম্ম স্বীকার করি, তবে আমরা ইহা না মানিয়া কোথায় যাইব? আমাদের আচার্য্য এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের স্থান অনেকে অস্বীকার করেন, কেহ কেহ নিতান্ত অনুরোধে যেন বলেন, কেশববাবু একজন ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু আমি কেবল যে কেশবচন্দ্রকে স্বীকার করি তাহা নহে, তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত আর কতকগুলি লোক মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ও এই সকল লোকের মিলন হইতে এই মণ্ডলী উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করি। যদি এই ধর্ম্মে ইহা অস্বীকার কর, তবে স্বীকার করিবে কি? অতএব কোথায় কাহার স্থান দেখিয়া লও, এবং নিজের স্থান কোথায় তাহাও নির্ণয় কর। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান জানিয়া যদি নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তবে আর কাহাকেও কাহারও কার্য্যের পরিপন্থী হইতে হইবে না।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল, আরও কিছু বলি। প্রেম ও ধর্ম্ম গাঢ় হইয়া পরিবার রচিত হয়, এবং এই ধর্ম্মপরিবারই সকলের এক

কার্য্যক্ষেত্র ; যদি তোমরা এই প্রেমপূর্ণ সমাজ গঠন না কর, তবে তোমাদের কমিটি হইবে, সভা হইবে, ধর্ম্মমণ্ডলী কথনও হইবে না। পরিবার না হইলে ধর্ম্মের ফল কোথায় বসিয়া ভোগ করিবে? ঈশা বলিয়াছিলেন, কে আমার পিতা, কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা, জানি না ; যাহারা আমার পিতার ইচ্ছা প্রতিপালন করে, তাহারাই আমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী। পরিবারের পূর্ণ আদর্শ এইটী। পিতার ইচ্ছা পালনে একপ্রাণ, একহৃদয় না হইয়া যে পরিবার গঠন করা হয়, উহা কেবল নরকের দৃশ্য মাত্র। আমরাও পরিবার করিয়াছিলাম ; কিন্তু ধর্ম্মের অভাবে, পিতার ইচ্ছা পালনে ঐকমত্যের অভাবে, প্রেমের অভাবে, স্বার্থত্যাগের অভাবে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। তোমরা আবার মিলিত হইয়াছ, তাই আবার সেই সকল কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া, ধর্ম্মে একব্রতী হইয়া, পিতার ইচ্ছানুগত হইয়া, প্রেমবান্ ও স্বার্থত্যাগী হইয়া এই ধর্ম্মপরিবার রচনা কর এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রধানতম উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ কর। সকলে মিলিয়া একক্ষেত্রে কার্য্য কর, কাহার কি কাজ বুঝিয়া লও। হে ঈশ্বরের পুত্রগণ, এস আমরা ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হই। পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা, একাত্মতা স্থাপন কর, ধর্ম্মের সাধন, পরিবারের শিক্ষা, এবং যাবতীয় জীবনের কার্য্যে পরমেশ্বরের কৃপাজালে আবৃত হইয়া সকলে একস্থানে দণ্ডায়মান হই এবং অনন্ত মহান্ পরমেশ্বরের মহাশান্তিপূর্ণ পাত্ররূপে পরিণত হই।

ধর্ম্মমণ্ডলী কাহাকে বলে, ইহার শক্তি ও সম্বন্ধ এবং ইহাতে যাহা যাহা থাকা প্রয়োজন বলা হইল। মণ্ডলীর জীবন উন্নত ও মণ্ডলীকে শক্তিসম্পন্ন করা যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা বুঝিতে পারিলে। গতবারে নিজ নিজ জীবনের উন্নতির বিষয় বলিয়াছি, এই সমস্ত বিশেষরূপে চিন্তা

কর, এবং যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা কর। শেষ কথা এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্য লইয়া জীবনের ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল অতি সামান্য দেখিতেছি। কেন না একটী ধর্ম্মমণ্ডলী প্রস্তুত করাই আমাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। এক্ষণে যাহাতে তাহা হয়, তজ্জন্য সকলের যত্নবান্ হওয়া উচিত। দয়াময় পরমেশ্বর এইজন্য আমাদিগকে উপযুক্ত ও শক্তিমান্ করুন।

হে পরমাত্মন্, সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যই কি তুমি সকল আত্মার প্রভু হইয়া ধর্ম্মদণ্ড হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ? সত্যই কি দুর্ব্বল সন্তানের পশ্চাতে মাতা যেমন দণ্ডায়মান থাকেন, তুমি সেইরূপ আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছ? এই বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরে, পরস্পরের ধর্ম্ম ও পুণ্যে পরস্পরে সমভাগী হইয়া যদি তোমার পরিবারে পরিণত হইতে আদেশ করিয়া থাক, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। হে পরম পিতা, যদি এই একশত লোক কটিবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে তোমার ইচ্ছা পালন করিবে ও পরস্পরের সহায় হইবে প্রতিজ্ঞা ক'রে এবং এই মণ্ডলীর মধ্যে যাহার যে কার্য্য বুঝিয়া নেয়, তবে কি না হয়? তিন দিনে তুমি সলিমানের মন্দির চুর্ণ করিয়া তোমার মন্দির স্থাপন করিলে, আর এই সকল লোক তোমার কৃপার ভিখারী হইলে, কি অসম্ভব থাকে? অতএব হে পিতঃ, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছাধীন করিয়া তোমার কার্য্যে সকলকে ব্যবহার কর এবং আমরা এই জীবনের আরব্ধ ব্রত সাধনে সিদ্ধকাম হইব এজন্য তুমি আমাদের সাহায্য কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিয়া আশা ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করি।

পরলোক।

রবিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৮১৯ শক ;

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৮ খ্রীঃ।

মানুষ যখন ঘর শূন্য করিয়া শ্মশানভূমি আশ্রয় করে, সেই শ্মশান-যাত্রা হইতে আবার কোথায় চলিয়া যায়? মানুষ কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া চিতার কাষ্ঠ-শয্যা গ্রহণ করিল, তথা হইতে আবার কোন্ অজানিত দেশে চলিয়া গেল? শরীর ও গাত্রাবরণ সকল খসিয়া পড়িল, অগ্নিই আচ্ছাদন হইল, এখন রহিল কি? সমুদয় শেষ হইল, রহিল কিছু ধূম ও ভস্ম। তখন কোন জ্যোতির্ম্ময় আত্মা বস্তু রহিল কি না বল। এই মানুষ ছিল, তাহার কত উৎসাহ উদ্যম ছিল, সংসারে সুখ স্বাস্থ্যের কতই ব্যবস্থা ছিল, সুখ দুঃখ কত বুঝিত, কত যত্নে শরীর রক্ষা করিত, একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে কত যন্ত্রণা বোধ করিত, রোগের যাতনাতে কত অধীর হইত, এখন দেখ শ্মশানের অগ্নি তাহার সকল সুখ দুঃখ গ্রাস করিল। যে মানুষ দেখিতে পাইতে, চির পরিচিত বলিয়া জানিতে, এখন আর তাহাকে দেখিতে পাও না, চির পরিচিত লোকের মত, আত্মীয় বন্ধুর মত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারিতেছ না। সেই মানুষ আর নাই। কোন মানুষ রহিল কি না, সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় আত্মা রহিল কি না, একবার চিন্তা কর। যে মানুষ রহিল তাহার বাস-ভূমি কোথায় তাহাও চিন্তার বিষয়।

চোখের সম্মুখে কাল লোক ছিল, আজ সুমেরু কুমেরু অনুসন্ধান কর, আর তাহার দেখা পাইবে না। কাল যাহার জন্য এত চেষ্টা,

ভাবনা, যত্ন, ঔষধ, পথ্য, সেবা আজ দশ সহস্র প্রকার আয়োজন কর, কিছুই সে আর গ্রহণ করিবে না ; ইন্দ্রের ধনরাশি, বৃহস্পতির জ্ঞানরাশি আজ সকলই তুচ্ছ। দেহের সৌন্দর্য্য গেল, দেহের উত্তাপ পথের কর্দ্দমের মত শীতল হইল, উদ্যম ও চেষ্টা দেহে আর কিছুই অনুভূত হইতেছে না। শরীর গেল, মান, অভিমানের অবসান হইল। হিন্দুশাস্ত্র বলে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার স্মৃতি সকলই শেষ হইয়া যায়। যদি এই সকলই বিনাশ পায়, তবে অবশিষ্ট থাকে কি ? হে জীব, তুমি যদি শরীর নহ, তুমি যদি বস্ত্র অলঙ্কার নহ, তুমি যদি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নহ, তবে বল তুমি কে ? হে জীবন, তুমি যদি এ ঘরে থাকিবে না, শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঘর আশ্রয় করিবে, তবে বল তুমি কে ? ঘরে যাইবে ; কেন না পৃথিবীর এই উপর্য্যুপরি আঘাত ও ও পরিবর্ত্তনে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, এবং তাহার অন্তিম তত্ত্বের কথা স্মরণ হইতেছে। তাহার স্থিতি ও গতি চঞ্চল দেখিয়া, অচঞ্চল, অবিনাশী আশ্রয় লাভ করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে। আত্মাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, আত্মা, তুমি কে ? আত্মা বলে আমি কে আমি তাহা জানি না। আমি আছি এই মাত্র জানি। আত্মা বস্তু ; এবং সে কোন স্থান হইতে আসিয়াছে ও কোথাও চলিয়া যাইবে, এই সত্য অভ্রান্ত। কিন্তু আত্মা আপনার স্থিতি গতি ও পরিণাম ও উন্নতির চরম সংবাদ অবগত নহে।

আত্মাকে দেহের সঙ্গে দেহ মনে করিও না, জড়ের সঙ্গে জড় বলিয়া ভাবিও না। বাসনা কামনা, সুখ দুঃখ ও মানসিক নানা বৃত্তিকেও আত্মার সঙ্গে এক করিও না। কাহাকেও আমার পিতা মনে করিও না, কাহাকেও মা মনে করিও না, কাহাকেও সন্তান বলিয়া ডাকিও

না. কাহাকেও স্ত্রী বলিয়া ভাবিও না। পৃথিবীর কার্য্য সাধন জন্য নানা আকার ও নানা নাম, কিন্তু বাস্তবিক কেহ কাহারও নহে। কেহ কাহারও নহে, কেহ আমার নহে; কিন্তু আমি আছি ইহা সত্য। প্রত্যেকে "আমি"; প্রত্যেকে আছি সত্য; কিন্তু এই যে অস্তিত্ব ইহা আমার শক্তি এবং আমার ইচ্ছাতে নহে। আমি আপনা হইতে অস্তিত্ব পাই নাই, আমি আপনার শক্তিতে বাঁচিয়া রহি নাই। রক্ত আমার শক্তিতে চলে না, নিঃশ্বাস আমার ইচ্ছা অনুসারে পড়ে না। হে বাপ, তুমি খেতে দাও, বস্ত্র দাও, কত স্নেহে প্রতিপালন কর; কিন্তু তুমিও ত বাঁচাইয়া রাখিতে পার না। স্নেহ পরায়ণা জননি, তুমি আমার জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু তথাপি কি তুমি আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রাখিতে পার? তোমরা শ্মশান হইতে চলিয়া যাও, তথাপি আমার কেহ থাকে এবং আমি থাকি। আমি আছি আর একজনের শক্তিতে, আমি আছি আর একজনের আজ্ঞাতে, আমি আছি এবং তাঁহার আদেশ ও আহ্বান হইবা মাত্র চলিয়া যাইব। শক্তি বল, আশ্রয় বল, প্রাণদাতা বল সকলই তিনি। তিনি অন্তরাত্মা, আমি আত্মা। তিনি পরমাত্মা আমি, আমি আশ্রিত ক্ষুদ্র আত্মা। দোহাই ধর্ম্মের, আমি আর কিছু জানি না।

ধন দিল কে আমি জানি না, বিদ্যা জ্ঞান দিল কে আমি জানি না, ধর্ম্ম পুণ্য দিয়া শোভিত করে কে তাহাও জানি না, শ্মশানের অগ্নি হইতে জ্যোতির্ম্ময় আকার দিয়া কোন্ মহা জ্যোতি আমাকে কোলে করে তাহাও জ্ঞাত নই। বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয় এবং তাহাতে কোন অজানিত শক্তির ক্রিয়া বলে ফুল ফোটে, ফল ধরে, তেমনি জানি ধন, বল, জ্ঞান, ধর্ম্ম, উন্নতি ও চরম শান্তি। আমার অস্তিত্ব,

স্থিতি, গতি, এই মাত্র বলিলাম। এক প্রকাণ্ড অবিনাশী আশ্রয়ে আমি আছি ইহাই জানি, আর কিছু জানি না। আরও বলিতে পারি, ধন থাকিলে চোরে নিতে পারে, বল থাকিলে রোগ তাহাকে সংহার করিতে পারে, জ্ঞানকেও বার্দ্ধক্যের বিস্মৃতি মলিন করিতে পারে, দেহকে যম আহার করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে আমার কিছুই যায় না, আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই না। এই সকল থাকাতে যেমন আমি থাকি না, এই সকল যাওয়াতেও আমি যাই না। আরও কথা আছে, এই যে স্থিতিমান্ আমি, এই আমি চৈতন্যরূপী। এই যে চক্ষে দেখি, ইহার পশ্চাতে আর একটী চক্ষু আছে, তাহা জ্ঞানচক্ষু। আমি চৈতন্যরূপে দেহে অবস্থান করি। আমি জ্ঞান বস্তু, বুদ্ধির কণিকা। আমি অগ্নি-খণ্ডরূপে দেহে বাস করি। জীবনে মরণে আমি এক মহা চৈতন্যের অভিনয় দেখিতেছি। যাহা কিছু হইতেছে, তাহাতেই এক মহা জ্ঞান-বিধি যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারাও এই জ্ঞান চৈতন্যের লীলা অভিনয় করিতে করিতে এক অতি গভীর ও বিস্ময়কর যবনিকার অন্তরালস্থ হইলেন।

হিমালয় প্রকাণ্ড হইতে পারে, কিন্তু মানুষ তাহা অপেক্ষা বড়। হিমালয় আপনাকে জানে না। মানুষ চৈতন্যের প্রভাবে জ্ঞানপক্ষপুটে আকাশে ভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্য তারকার বিষয় মানুষ জানে, ধূমকেতুর মুণ্ডে কি আছে মানুষ তাহাও নির্ণয় করিতে সমর্থ। মানুষ দুর্ব্বল হইলেও জ্ঞান দুর্ব্বল হয় না। সমস্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি জ্ঞান চৈতন্য বর্ত্তমান থাকে। আত্মার আর একটী বস্তু আছে, তাহা প্রেম। যেমন দেশলাইর আগুন দিয়া এই সমস্ত কলিকাতা দগ্ধ করা যাইতে পারে, তেমনি প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভিন্নতাকে বিনাশ করিয়া এক

করিতে পারা যায়। প্রেমের দ্বারা এক ইহুদী সন্তান সমস্ত পৃথিবীকে বক্ষে করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেহ কাহারও নহে। মাতা পিতা, স্ত্রী স্বামী সন্তান ও বন্ধুর সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক যখন শ্মশানের জ্বলন্ত আগুনে আচ্ছন্ন মানুষকে দর্শন কর, তখন প্রেমের বিচিত্র অভিনয় কি আর ভাবিতে অবসর পাও? কিন্তু প্রেম মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত, কেহ কাহারও নহে, তথাপি কেহ কেবল আপনার জন্য জীবন পায় নাই। সকলেই পরের জন্য জীবন লাভ করিয়াছে। নিজ জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য দিয়া পরকে ভালবাসিতে ও সেবা করিতে মানুষের মধ্যে প্রেমবস্তু বর্ত্তমান। প্রেমময় ঈশ্বর অনন্ত প্রেমে জীবন সৃজন ও প্রতিপালন করেন। মানুষকে প্রেম দিয়া পরস্পরকে ভালবাসিতে এবং প্রেমভক্তিতে ঈশ্বরকে পূজা করিতে মানুষের প্রতি আদেশ। প্রেম যেন মায়ার নিগড় প্রস্তুত না করে। নিঃস্বার্থ প্রেমে ঈশা যে পরিবার রচনা করিলেন, সেই পরিবারের জন্য সকলের প্রেম অগ্রসর হউক।

আর একটী কথা, আমি আনন্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আনন্দে চলিয়া যাইব। আনন্দপূর্ণ এই পৃথিবী, প্রভাত হইতে না হইতে প্রকৃতি আনন্দে হাসিয়া উঠে, কত পাখী আনন্দে সঙ্গীত করে, কত পদ্ম ফুটিয়া সরোবরকে শোভিত করে, কত কত কুসুমের হাসিতে উদ্যান হাস্যময়। শ্মশানের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পতির অভাব ও বিচ্ছেদ যাতনা সম্বরণ করিতে অসমর্থা হইয়া বিধবা আর্ত্তনাদ করে, যাহারা শিশু তাহারা কাঁদিয়া আকুল হয়; কিন্তু আকাশে চন্দ্র হাসিতে থাকে। শোকে দুঃখে আমরা কাতর হই; কিন্তু প্রকৃতির আনন্দ কিছুতেই কমে না। আমাদের শোকে আহত, দুঃখে কাতর প্রাণেও প্রকৃতির

আনন্দ শান্তিতে নিমগ্ন হইয়া কত সান্ত্বনা পাই। মানুষ মরিতে বসে, তথাপি হরিনামের হিল্লোলে তাহার মুখকমল কেমন ফুটিয়া উঠে। দুঃখের পর সান্ত্বনা, অশ্রুপূর্ণ লোচনের পার্শ্বে সান্ত্বনার রেখা কি দেখ নাই? অতএব মৃত্যু দুঃখের কারণ নহে, আনন্দের হেতু, চিরশান্তির বার্ত্তাবহ। এস আমরা সকলে কিছুকাল মৃত্যুর অন্ধকারে বাস করি। এই যে সমস্ত কথা বলিলাম, তাহার সার কি? মানুষ সচ্চিদানন্দের সন্তান, তুমি সচ্চিদানন্দের সন্তান সচ্চিদানন্দ। তুমি সেই সচ্চিদানন্দের কোলে বিকসিত একটী ফুল।

তুমি তাঁহার অনন্ত বক্ষঃসমুদ্রজলে একটী বিন্দু; কিন্তু তুমিও সচ্চিদানন্দ। কত যুবতী বিধবা অলঙ্কার বিহীনা; কিন্তু সচ্চিদানন্দ তাহার অন্তরে বাস করিতেছেন। সকল যায়, কিন্তু সচ্চিদানন্দের সন্তান সচ্চিদানন্দই থাকে। এখানের শ্রোতাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি কখনও দুঃখ পান নাই? কিন্তু এমনও কেহ নাই, যিনি দুঃখের পর সান্ত্বনা পান নাই। অন্ধকারের পরে আলোক আছে, রজনীর সুপ্রভাত আছে, মৃত্যুর পর জীবন আছে। যদি ইহা বুঝিয়া থাক, তবে পরলোক কি তাহা বুঝিয়াছ। পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও দেখা দিয়া যেমন সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন, তেমনি তিনি এই সমস্ত দুঃখ যাতনা, মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরলোকের সুন্দর বিশ্বাসভূমিতে সকলকে উপস্থিত করিয়া পরলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করেন। পরলোকতত্ত্ব নিগূঢ়, আমরা ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদয় অবগত নহি। তথাপি যখন এতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তখন বল, মরণে আর ভয় কি? আমরা যখন বিলাসী, আমরা যখন অবিশ্বাসী, আমরা যখন দেহী, তখন মনে হয়, সচ্চিদানন্দ আবার কি? অদেহী হওয়া আবার কিরূপ? এই

শরীরই ত সব; এই সম্ভোগই যে সার; ইহার অতীত আবার কি আছে? এইরূপে একবার উন্নতি একবার পতন, ইহার মধ্যে আমরা অবস্থান করিতেছি। তবে বল দেখি, সত্য যাহা তাহা কিরূপে স্থায়ী হয়?

ইহার তিনটী বিধি আছে। প্রথম বিধি—ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করা, দেহকে ভুলিয়া যাওয়া, কুভাব, কুকল্পনা বিস্মৃত হওয়া, মনের চঞ্চলতা ও শারীরিক সমস্ত বৃত্তিকে পরিহার করা। এ ছাড়া আর বৈরাগ্য চাই না। ইহা হইলেই পরলোকের সম্বল হইল।

দ্বিতীয় বিধি—যদি ত্যাগ কর, ত্যাগ করাই সাধনের সঙ্কল্প হইল, তবে ত্যাগের পর গ্রহণ করিবে কি? কোন স্থান শূন্য থাকা স্বভাবের নিয়ম নহে। কিছু ত্যাগ করিলে কিছু গ্রহণ করা বিধি। যদি সংসার ত্যাগ কর, দেহ ত্যাগ কর, বিলাস বিসর্জ্জন কর, তবে গ্রহণ করিতে হইবে ব্রহ্মস্মৃতি, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মসেবা। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে শূন্যস্থান পূর্ণ হইবে। হে আত্মন্, যখন তুমি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপে আবৃত হও, যোগে অবিচ্ছিন্ন হও, ধ্যানে এক হও, তখন তুমি দেহে থাক, না অদেহী হও? ব্রহ্মসহবাসে যখন তুমি আত্মবিস্মৃত হও, তখন তুমি সংসারে থাক, না স্বর্গবাসী হও? তোমার জাগ্রত বিবেক যখন এই ভববন্ধনকে নিন্দা করে, যখন তুমি পুণ্যাগ্নিতে দগ্ধ হও, পাপ-জঞ্জাল সমস্ত খসিয়া পড়ে, পুণ্য গঙ্গাজলে স্নান করিয়া যখন তুমি প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ কর, তখন তুমি কোথায় থাক? সচ্চিদানন্দের প্রেম আঁখি যখন তোমার মোহমুক্ত চক্ষুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন তুমি কোথায় চলিয়া যাও বলিতে পার কি? তবে আর বলিতে হইবে না যে, অদেহী হইলে এখানেই স্বর্গবাস

হইয়া থাকে। ইহাই ইহলোকে পরলোক সম্ভোগ। ত্যাগ করিয়া ভোগের জন্য গ্রহণ করিতে হয় এই শস্ত।

তৃতীয় উপায়—যদি বল, এখানে থাকিব কাহার জন্য? সকল ত্যাগ এবং পরলোক ও পরমাত্মাসহবাসই যদি একমাত্র সার হইল, তবে এই সংসারে থাকিব কেন? এবং ইহাতে নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনাই বা কি আছে? পরার্থ নামে একটি সুবিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র আছে। তুমি তাহাকে আশ্রয় করিয়া কেন পরম সুখী হও না? পরমাত্মার উত্তাপে তোমার আত্মা পরিপক্ক হইয়া যে উত্তম বীজ হইবে, তাহা এই পরার্থক্ষেত্রে রোপণ কর। পরমাত্মার সম্ভোগে যে বল হইবে, তাহা দ্বারা পরার্থ ক্ষেত্র কর্ষণ কর। স্বার্থ ভুলিয়া যাও, নিঃস্বার্থ হও, নির্ব্বিকার হইবে, মুক্ত হইবে, নিরাপদে থাকিতে পারিবে। হে বন্ধুগণ, মানুষ যখন শরীর ছাড়িল, চিতার ভস্ম সার হইল, তখন সে দিব্য তনু, ভাগবতী তনু লাভ করিল। এই দিব্য দেহের গতি কতদূর ব্যাপী, ইহার আনন্দ সুখ শান্তি কি অপরিমেয়, তাহা আমি জানি না। কেন না, এই যে মৃত্যুর অন্ধকার, ইহা কেহ ভেদ করিতে পারে না। পরলোকের প্রান্তর হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না। অতএব বলি, ব্রহ্মসহবাস করিও, যোগে স্থির থাকিও, প্রেম ভক্তিতে মগ্ন থাকিও, মায়া মোহ হইতে মুক্ত থাকিও, দেহবাস পরিত্যাগ কর, স্বার্থের দড়ি কাটিয়া পরার্থের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ কর। সচ্চিদানন্দের সন্তান হইয়া আনন্দে অবস্থিতি কর। মৃত্যুকে ভয় করিও না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ জন্য প্রতীক্ষা করে, তুমিও বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কর। হে বন্ধুগণ, আপনার অস্তিত্ব, স্থিতি, গতি ও মুক্তি বিষয়ে এই মাত্র বলিলাম। পরলোক গভীর ও বিস্ময়কর, আরও কত তত্ত্ব ক্রমে জানিতে

পারিবে। ইহা অনন্তকাল জানিবার ও সম্ভোগ করিবার বিষয়। ইহা হইতে নিবৃত্ত হইও না।

হে মৃত্যুঞ্জয়, হে জ্যোতির্ম্ময়, আমাদের মৃত্যু আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া যাইবার দূত ভিন্ন আর কেহত নহে। হে সচ্চিদানন্দ, রোগ দুঃখ শোক, আমাদের পরলোকের বার্ত্তাবহ বই আর কিছুই ত নহে। কৃপা করিয়া পরলোকে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া আমাদিগকে দেখাও। মৃত্যুর অন্ধকারে আমরা অধীর ও আত্মবিস্মৃত, এখন তোমাকে আশ্রয় করিতে না পারিলে আর সান্ত্বনা পাইতেছি না। সংসারের নানা অবস্থাতে পড়িয়া আমাদের ভক্তির পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। আত্মশুদ্ধির পথ অবরুদ্ধ, দেহী হইয়া মায়াবদ্ধ হইলাম, বিলাসী হইয়া পাপহ্রদে পতিত হইলাম। এখন অদেহী কর. শ্মশানের ভস্ম হস্তে করিয়া বিলাসের মুখে দান কর। এই শোকের সময় আমাদের মণ্ডলীতে অবতীর্ণ হইয়া পরলোকে যাইবার পথ রচনা কর। আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত দিব্য স্থিতি দাও, পরলোকের প্রান্তরে আমাদিগকে একত্র করিয়া সকলকে নিত্যানন্দের অধিকারী কর। তোমাতে পরম সুখী হই, পরমানন্দ লাভ করি। তুমি একমাত্র অটল অবিনাশী আশ্রয়দাতা, ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া, প্রেমভক্তিভরে আশ্বস্ত অন্তরে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

BL 1235 Majumdar, Protap
.M23 Chunder, 1840-
v.1-3 1905.
Upadeśa

Volum

ume 4

উপদেশ

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

উপদেশ

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার

প্রথম সংস্করণ

নবিবিধান ট্রাষ্ট,
কলিকাতা-৫৩

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ — ১৮৮৯ শক

শ্রীঅরুণনাথ দাসগুপ্ত, সম্পাদক, নববিধান ট্রাষ্ট,
কলিকাতা-৫৩ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
দি প্রেস সার্ভিস, ১৮নং নকুলেশ্বরতলা লেন, কলিকাতা-২৬
হইতে শ্রীহীরালাল পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রদ্ধেয় গণেশ প্রসাদের উদ্যোগে প্রেরিতপ্রবর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চুয়াল্লিশটি উপদেশ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে সঙ্কলন করিয়া তিন খণ্ডে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই খণ্ডে আরও এগারটি উপদেশ (তাহার ভিতর দুইটী সম্পূর্ণ উপাসনা সহ) প্রকাশিত হইল। এগুলি পূর্ব্বে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল উপদেশ তরুণ, বৃদ্ধ সকলেরই বিশেষ উপযোগী, বহু গভীর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ। নূতন করিয়া এই সকল উপদেশ পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন।

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ধর্ম্ম ও নীতি

পাঁচদোনা গ্রাম, ঢাকা

শনিবার, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক ; ১২ই এপ্রিল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ধর্ম্ম ও নীতি বিষয় বক্তব্য। ধর্ম্মবিষয়ে বলিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে হয়। ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে বিদ্যমান। মনুষ্যাত্মার সৃষ্টির সঙ্গেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান তাহাতে নিহিত হইয়াছে। কি পর্ব্বতবাসী অসভ্য বর্ব্বর জাতি, কি সুসভ্য জ্ঞানী মনুষ্য যাহাকে জিজ্ঞাসা-কর, সকলেই বলিবে ঈশ্বর আছেন। কোন এক ভদ্র লোক নর-মাংসাহারী ভীষণ প্রকৃতি এক উলঙ্গ বন্য মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল চন্দ্রসূর্য্য অপেক্ষা পুরাতন একজন ঊর্দ্ধে আছেন, তিনি। অতএব যাহারা নিয়ত অরণ্যে পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, কিছুমাত্র জ্ঞানের আলোচনা করে নাই, কোন দিন ঈশ্বর বিষয়ক পুস্তক পাঠ করে নাই ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ ঘোর অজ্ঞানান্ধ বন্যলোকেরাও স্বীকার করিয়া থাকে যে জগতের

কর্ত্তা একজন আছেন। তবে তাহাদের ঈশ্বরের সত্তা-বোধ কুসংস্কার মিশ্রিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে 'কিছু অস্পষ্ট। যাঁহারা উচ্চজ্ঞানের আলোচনা ও ধর্ম্মের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে এই জ্ঞান অতি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল এবং আত্মাতে প্রত্যক্ষ। জগতে নাস্তিক নাই ; প্রকৃত নাস্তিক কেহ হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দান করে, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যেও এ-প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ পাপ ও কুপ্রবৃত্তিকে পোষণ করিবার জন্য লোকে নাস্তিক হইয়া থাকে। তাহারা ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, পাপের শাস্তা নাই এরূপ আলোচনা করিয়া আপনার পাপাসক্ত মনকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে ও তাহার প্রচার দ্বারা নিজের সহানুভূতির লোক সংগ্রহের যত্ন পায়। কিন্তু তাহারা হৃদয়ে কখন নাস্তিক নয়। অচিন্ত্য জ্ঞান-কৌশলপূর্ণ এই সুবিশাল বিশ্বের কর্ত্তা নাই, জগৎ-নিয়মের নিয়ন্তা নাই, বিশ্ব অন্ধশক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা আপনি রক্ষিত হইতেছে তাহাদের হৃদয় কি ইহা বলিতে পারিবে ? কখনই নয়। যাঁহারা ঈশ্বর নাই এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ঘোর বিপদের সময়— প্রবল ঝটিকায় উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র বা নদী গর্ভে

পোত নিমগ্ন হইবার সময়, হে ঈশ্বর ! রক্ষা কর বলিয়া ঊর্দ্ধ-হস্তে ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব ঈশ্বরের সত্তা-জ্ঞান স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক। মনুষ্যাত্মা মাত্রেই এই জ্ঞানের বীজ নিহিত রহিয়াছে। আমি আছি এই জ্ঞান যেমন স্বতঃসিদ্ধ, উহাও তদ্রূপ।

ঈশ্বর নিরাকার

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই ঈশ্বর সাকার, না, নিরাকার? কতগুলি লোকে বলেন ঈশ্বর সাকার। কতগুলি লোকে নিরাকার বলেন। আর্য্যদিগের অতি সম্মান্য ধর্ম্মশাস্ত্র বেদোপনিষদ্, কি খ্রীষ্টিয়ান্‌দিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল, কি মুসলমানদিগের কোরাণ, জ্ঞানী ও সভ্য জাতির যত প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে এক বাক্য হইয়া বলিতেছে ঈশ্বর নিরাকার। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, "অপানি পাদো যবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ" তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, পদ নাই গমন করেন, চক্ষুঃ নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ র্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তুতং নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, জ্ঞান প্রসাদে

শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। তলবকার উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "যদ্ বাচা না ভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে ; তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে।" বাক্য দ্বারা যিনি বচনীয় নহেন, যিনি বাক্যের স্রষ্টা, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জান, লোকে যে সকল পরিমিত বস্তুর উপাসনা করে তাহা কখন ঈশ্বর নহে ! এই প্রকার শাস্ত্রের বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সাকার পদার্থ নন ! তবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বাহুল্যরূপে সাকার উপাসনা কেন প্রবর্ত্তিত হইল, হিন্দুরা ঈশ্বরকে সাকার কেন বলেন ? তাহার কারণ আছে। নিরাকার উপাসনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। পূর্ব্বতন ঋষিরা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। পুরাণতন্ত্রাদিতে উল্লিখিত দেবদেবীকে তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। কোন কোন ঋষি তাঁহাদের কাহাকে ক্রোধে অভিসম্পাৎ, কাহাকে বা পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। দেবতারাও ঋষিদিগের ভয়ে কম্পিত হইতেন। পুরাণাদি শাস্ত্রের আলোচনায় ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল দেবতা যদি ঈশ্বর হইতেন, ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানী ঋষিরা কখন তাঁহাদের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিতেন না ; দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন না। সকলেই জানেন ঋষিগণ

অরণ্যবাসী হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের এই এক দোষ ছিল, তাঁহারা সাধনাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল সত্য পাইতেন, তাহা জনসমাজে প্রায় প্রচার করিতেন না। তাঁহাদের এই সঙ্কীর্ণতার জন্য ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান লোকসমাজে প্রচার হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঋষিদিগের এই এক কুসংস্কার ছিল, যে সংসারী লোকেরা ঈশ্বরের উচ্চভাব পাইবার অধিকারী নয়। কিন্তু কোন না কোনরূপ ধর্ম্মের শাসন একেবারে না থাকিলে লোকস্থিতি রক্ষা পায় না, সমুদায় লোক ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া সংসারে মহাবিপ্লব আনয়ন করে। এজন্য কোন কোন ঋষি দেবদেবীর উপাখ্যান রচনা এবং তাহার উপাসনার বিধি প্রচার করেন। অনেকে বলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অর্থোপার্জ্জন ও সম্মান লাভের সুযোগ পাইয়া এই পূজা বিধির বাহুল্য করিয়া তোলেন, তাঁহারাই স্বয়ং দেবদেবীর পূজাদি সম্বন্ধে ও তাহাদের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ ও বচন রচনা করিয়া লোকের নিকটে আদরণীয় হইবার জন্য ঋষিদের নামে প্রচার করেন। একে সাধারণ লোকের অন্তর্দ্দৃষ্টির অভাব, সংসার ও বাহ্য জগৎ নিয়াই লোকে ব্যস্ত, সংসারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বস্তু আছে, জ্ঞানের আলোচনা ও সাধনার অভাবে সকলে কিছুই বুঝিতে

পারে না ; তাহাতে আবার ধর্ম্মের মধ্যেও ঘোর সংসারিকতা আসিয়া পড়িল। স্বার্থপর যাজকদিগের দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে সাধারণের অধিকার রহিত হইল। সুতরাং অন্তর্জগৎ লোকের চক্ষে একেবারে অন্ধকার হইল, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সাকার বস্তু ব্যতীত আর কিছু আছে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িল। একেত এই দুর্দ্দশা, তাহার উপর আবার বার বার বিপ্লব। হিন্দুধর্ম্মের ঘোর শত্রু বৌদ্ধদিগের দ্বারা হিন্দুসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বেদ উপনিষদের চর্চ্চা যাহা কিছু ছিল, সেই সময় হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইল। তৎপর মুসলমানদিগের দুর্জ্জয় আক্রমণ। তখন হইতে জ্ঞানের আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বহু সহস্র বৎসর হিন্দুসমাজ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের অধীনতা ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া সকল প্রকার মহত্ত্ব হারাইলেন। যেখানে স্বাধীন চিন্তা নাই, প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনা নাই, ধর্ম্ম যাজন যেখানে যাজক-দিগের ব্যবসায়, যাজনার উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ সাধন, অর্থ ও সম্মান লাভ, যে ধর্ম্মে লোকের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কেবল স্বার্থপর যাজকদিগের প্রভুতা, সেখানে সাকার জড়বস্তু ব্যতীত আর কি অবস্থিতি করিবে? লোকের স্বভাব যেরূপ নীচ হইল, তাহারা ঈশ্বরেও

সেই রূপ নিকৃষ্ট ভাব আরোপ করিল। যথা ঈশ্বর কামুক, ক্রোধী, সমর-প্রিয়, মাদকানুরক্ত। যেখানে যত অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, সেখানেই তত জড়োপাসনার প্রাদুর্ভাব, সেখানেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি ও স্বরূপে ভয়ানক জঘন্য ভাব সকল আরোপিত দেখা যায়। পর্ব্বতবাসী অনেক অসভ্য লোক অগ্নি জল বায়ু চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড় বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, তাহারা দেখে অগ্নি নিমেষ মধ্যে সমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলে; মেঘসকল ভয়ানকরূপে গর্জ্জন করিয়া জল বর্ষণ দ্বারা ধরাতলকে প্লাবিত করে; সাগর-তরঙ্গ গভীর নাদে মহা আস্ফালন করিয়া পোতাদি নিমগ্ন করে; বায়ু হুহু শব্দে প্রবাহিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল বিচূর্ণ করে; চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে পৃথিবী আলোকিত হয়। তাহারা ভৌতিক জগতের এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া বিস্মিত চকিত মনে এই সকল জড় বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেকে বিকট আকার ভীষণ প্রকৃতি শ্বেত কৃষ্ণাদি বর্ণের অশ্লীল উলঙ্গ বা কৌপীনধারী ঈশ্বর কল্পনা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোচনা নাই, সকলেই জড় বুদ্ধি, জড়বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবে অথবা আপনারা যে প্রকার ঈশ্বরকেও সেই প্রকৃতির মনে করিবে, বিচিত্র

কি ? যেখানে জ্ঞানের উন্নতি, অন্তর্দ্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক সাধনা, সেখানে কি ঈশ্বর সাকার ভাবে প্রকাশ পাইতে পারেন ? কখনই নয়। যথার্থ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক সমাজ কখনই ঈশ্বরকে সাকার বলেন না, তাহাতে ঈশ্বরের অবমাননা মনে করেন, যত সভ্য জ্ঞানী সমাজ দেখ, সকলেই ঈশ্বরকে নিরাকার বলে।

এইক্ষণ যুক্তি কি বলে দেখা যাউক। যুক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে ঈশ্বর নিরাকার। যাহা সাকার তাহা পরিমিত, তাহার সীমা আছে। পরিমিত ক্ষুদ্র বস্তুর শক্তি কখনই অনন্ত হইতে পারে না ; তাহাও পরিমিত, ক্ষুদ্র। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে, তাঁহাকে পরিমিত ক্ষুদ্র বলা হয়। উর্দ্ধনেত্রে দৃষ্টি করিয়া প্রসারিত নভোমণ্ডলে যাঁহার রচিত অগণ্য চন্দ্র সূর্য্য তারকা দেখিতে পাই, জ্যোতির্বিদেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে যাহা দেখিয়া অন্ত না পাইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হন, পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে বৃহৎ কোটী কোটী জ্যোতির্লোক যাঁহার কৌশলে সুনিয়মে প্রতি নিয়ত শূন্য মার্গে ভ্রাম্যমাণ, তিনি কি পরিমিত ? কে বলিতে পারে এসকল পরিমিত হস্তের রচনা ? অধোদৃষ্টিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে যখন নিরীক্ষণ করা যায়, দেখা যায় যে এক বিন্দু জলেতে লক্ষ লক্ষ কীটানু সঞ্চরণ করিতেছে, প্রত্যেক কীটানুর আবশ্যকীয়

ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল আছে, শিরা পাকস্থলী আছে, তাহারা আবার আপনা অপেক্ষা ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়া আহার করে, ইহা দেখিয়া কে বুকে হাত দিয়া বলিবে এ সকল পরিমিত হস্তের নির্ম্মিত? উদ্ভিদ্‌জগতের সুশৃঙ্খলা, জীব-রাজ্যের সুপরিপাটী নিয়ম, দেহ নির্ম্মাণের অপূর্ব্ব কৌশল, ভৌতিক-জগতের অতীত, অন্তর-রাজ্যের দুরবগাহ্য অচিন্তনীয় ব্যাপার সকল, এই সমুদায় অনন্ত ব্যাপার কি পরিমিত দেবতার পরিমিত শক্তির কার্য্য হইতে পারে? কখনই নয়। যাঁহাদিগের বুদ্ধির লেশ আছে, তাঁহারা কখনই একথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। অতএব যিনি অসীম জগতের কর্ত্তা নিয়ন্তা, তিনি অনন্ত নিরাকার বটেন; পরিমিত সাকার নন। এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যিনি নিরাকার, যাঁহাকে চক্ষে দেখা যায় না, তাঁহাকে মনুষ্য কি প্রকারে জানিবে ও উপাসনা করিবে? জড়-বস্তু, বাহ্য-জগৎকে জড় চক্ষু ও বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন ও উপলব্ধি করা যায়। নিরাকার ঈশ্বর জ্ঞান-চক্ষু—অন্তরেন্দ্রিয় যোগে উপলব্ধ হন। জিজ্ঞাসা করি, তোমার আত্মা সাকার "না নিরাকার? আত্মাতো সাকার নয়, তাহাকে তো চক্ষে দেখা যায় না, তবে আত্মাকে কি প্রকারে জানিতেছ? আমার শরীর, আমার হস্ত পদ, আমার চক্ষুঃ কর্ণ, সকলেই বলেন; এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য আমি

বলিতে কে? আমিতো শরীর নই, মৃত্যুর পরে এই শরীর পড়িয়া থাকিবে, হস্ত পদ আছে অচল, চক্ষু কর্ণ আছে দেখিতে শুনিতে পায় না, কেন না তখন শরীরের কর্ত্তা আমি অর্থাৎ আত্মা যে করে, দেখে শুনে সে থাকিবে না। কেহ কি বলিতে পার, আত্মার কেমন আকার? কখনই নয়। তবে দেখ আত্মা শরীর নয়, সাকার বস্তু নয়, নিরাকার হইলেও দেখ, আত্মাকে সকলেই বিশ্বাস করে। আমি বলিতেছি, তুমি শুনিতেছ, অথচ আমি নাই, তুমি নাই, অর্থাৎ আত্মা নাই ইহা কে বলিতে পারে? নিরাকার হইলেও সকলে আত্মাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছে। অমুকের ভাল বুদ্ধি, তাহার ভাল মন সচরাচর সকলেই বলিয়া থাকে ও বিশ্বাস করে। কিন্তু বুদ্ধি মনের আকার কি কেহ বলিতে পার? তাহা নিরাকার। অসভ্য অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যেও এই আত্মজ্ঞান স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একদা পর্ব্বতবাসী এক অসভ্য স্ত্রী সন্তানের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছিল, তখন তাহাকে কেহ বলিল, তোর যে পুত্র নিকটে, কাঁদিস কেন? সে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল চলিয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় নিতান্ত অসভ্য অজ্ঞানী লোকেও আত্মা এবং পরলোকেতে বিশ্বাস করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই উপরত পিতৃলোকের

কল্যাণ জন্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন! অতএব নিঃসংশয়ে প্রতীতি হইতেছে, আত্মজ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই আছে। যখন নিরাকার আত্মাকে লোকে জানিতে পারে, বিশ্বাস করিতে পারে, তখন যিনি বিশ্বের প্রাণ, অবলম্বন, সকল নিয়মের নিয়ন্তা, তিনি নিরাকার হইলেও কেন লোকে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়যোগে যেমন জড়বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, সাধকদিগের বিশ্বাসনেত্রে সেই প্রকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন, আধ্যাত্মিক সাধনাতে ভক্তগণ ঈশ্বরকে জ্ঞান ও শক্তির আধার প্রেমময় মহান্ অনন্ত রূপে হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করেন। যাঁহারা সাধনা করেন নাই, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। সাধনা—উপাসনা, প্রার্থনা করিয়া দেখ, সত্য কি না। অন্ধ ব্যক্তি জগৎ দর্শন করিতে পারে না, তাহা বলিয়া কি জগৎ অসত্য? হৃদয়চক্ষুঃ কলুষিত বলিয়া যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার জন্য ঈশ্বর অসত্য নন। কেহ কেহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর নিরাকার বটেন কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্য উদ্ধারের জন্য তিনি সাকার হন। ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাঁহার ইচ্ছামাত্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, রক্ষা হইতেছে; তিনি প্রতিহিংসার বশ হইয়া কোন দৈত্য বধ করিবার জন্য নিকৃষ্ট জড়দেহ ধারণ করিবেন, ইহা

অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? ধ্রুব সত্য নির্ব্বিকার পূর্ণ ঈশ্বরেতে সাকার ভাবের আরোপ করা, ঈশ্বরের দেহ স্বহস্তে নির্ম্মাণ করা, না, ভয়ানকরূপে ঈশ্বরের অবমাননা করা। সাকার মাত্র বিকৃতি ও পরিবর্ত্তনশীল, জন্ম-মৃত্যুর অধীন। ঈশ্বর জন্ম-মরণ-বিহীন, নির্ব্বিকল্প।

ঈশ্বর এক

প্রমাণিত হইল ঈশ্বর নিরাকার ! এইক্ষণ ঈশ্বর এক না বহু, এই জিজ্ঞাস্য। অনেকে বহু ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানী-সমাজের অবিসম্বাদিত মত ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়। উপনিষদ্, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ঈশ্বর প্রতিপাদক পৃথিবীর সমুদায় প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের একত্বই প্রমান করিতেছে। পূর্ব্বতন আর্য্য মহর্ষিগণ এবং ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ঈশ্বর এক এই কথা গম্ভীরনাদে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কোন মহর্ষি বলিয়াছেন, "নিস্তরঙ্গোতি গম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবঃ মাধুর্যৈক রসাধারঃ এক এবহি সর্ব্বতঃ।" ঈশ্বর স্থির ও গম্ভীর নিবিড় অমৃত সমুদ্র স্বরূপ ; মধুরতার একাধার, একমাত্র অদ্বিতীয় ও সর্ব্বব্যাপী। পরন্তু উক্ত হইয়াছে, "ওঁ ব্রহ্ম বা এক মিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং

সর্ব্ব মসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" পূর্ব্বে একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, তিনি সমুদায় সৃজন করিয়াছেন, তিনি নিত্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বতন্ত্র অবয়ব বিহীন, একমাত্র অদ্বিতীয়। মুসলমান শাস্ত্রেও "হক্ তালা ওয়াহেদ ও লাছানি" অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় বলেন। প্রাচীন সম্মানিত শাস্ত্রসকল, কি যথার্থ সাধকগণ, কি আধুনিক বিদ্বৎসমাজ কেহই ঈশ্বর দুই একথা বলেন নাই, বলিতেছেন না। যুক্তিতেও সায় পাওয়া যায় না। আমরা জগতের নিয়মে এক-জনেরই কর্ত্তৃত্ব দেখিতেছি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী পরস্পরের মধ্যে যোগ ও সম্বন্ধ আছে, একে অন্যকে আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য উত্তাপ আলোক দান করিয়া, মেঘ বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী ও জীবের বাসোপযোগিনী করিতেছে। অন্ন, জল, আলোক, উত্তাপ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ্ ও জীব শরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি হইতেছে। বাহ্য জগতের সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, শ্রোত্রনেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দরূপাদি বিষয়ের যোগ, এরূপ পরস্পর সকল পদার্থ আশ্চর্য্য গূঢ় সম্বন্ধে মিলিত হইয়া এক জ্ঞানবান্ মঙ্গলময় পুরুষের শুভ অভিপ্রায় সাধন করিতেছে, ইহা স্পষ্ট সংলক্ষিত হয়।

ঈশ্বর অনেক হইলে বিশ্বের সমুদায় নিয়ম কৌশলের মধ্যে আমরা এরূপ একত্ব কখন দেখিতাম না। যাহা অনন্ত পূর্ণ, তাহা এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। অস্তবৎ পরিমিত বস্তুই অনেক হইয়া থাকে। তবে কি তিনি জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন? এরূপও হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কি কোন বিষয়ে শক্তির ন্যূনতা আছে, যে অন্যের সাহায্য আবশ্যক করিবে? যদি তাহা হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। অনেকের এই প্রকার মত যে আমরা ঈশ্বর ভাবিয়া অন্য যে কোন বস্তুরই পূজা করি না কেন, তাহাতেই ঈশ্বরের পূজা হয়। তাঁহাদের ইহা ভয়ানক ভ্রম। আমি একজন কৃষককে রাজা বলিলাম, তাহাতে সে রাজা হইতে পারে না, রাজার প্রাপ্য রাজস্বাদি যদি একজন কৃষককে দান করা যায়, তাহাতে যে রাজার অবমাননা হয়, রাজা তাহাকে বিদ্রোহী স্থির করিবেন। সেইরূপ সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টা বলিয়া—কোন মনুষ্যকে, কি অচেতন পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলে কিছুই ফল হয় না, বরং অপরাধ। আমার রুচি কি ভ্রান্তির জন্য এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে পারে না। যাহা সত্য তাহা সত্য থাকিবে। যদি কোন শিশু জননী ভ্রমে একটী পুত্তলিকার স্তন পান করিতে

যায়, তাহার এই ভ্রান্তির জন্য সেই পুত্তলিকার স্তনে কখন দুগ্ধের সঞ্চার হইবে না। এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরই মুক্তি দান করেন, সৃষ্ট বস্তু কখনই নয়। এইক্ষণ প্রমাণিত হইল ঈশ্বর এক, তিনিমাত্র পরিত্রাতা, জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

ধর্ম্ম এক

ঈশ্বর যেমন এক, তাঁহার ধর্ম্মও এক। জড়-জগৎ একবিধ ভৌতিক-নিয়মে নিয়মিত ও অনুশাসিত হইতেছে, অন্তর্জগৎও এক প্রকার ধর্ম্ম নিয়মের অধীন। সূর্য্যের উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে, সেই বাষ্প আবার শীতল বায়ু যোগে ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি রূপে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। পৃথিবী সূর্য্য হইতে আলোক উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে; বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহাতে ধরণী উর্ব্বরতাগুণ প্রাপ্ত হইয়া ফল শস্য পুষ্প দ্বারা উদ্ভিদ্‌রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে; জীব সকল অন্ন জল উত্তাপ বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ভৌতিক নিয়মের একরূপ কার্য্য। কখন কোথাও অন্যথা হয় না। শরীর ধারণ সম্বন্ধে যেমন একবিধ ভৌতিক নিয়ম, আত্মার সম্বন্ধে ধর্ম্ম নিয়মও সাধারণ। বিশেষ দেশ, কি বিশেষ

জাতি, কি ব্যক্তি সম্বন্ধে ধর্ম্ম নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ঈশ্বর যেমন জগতের এক মাত্র অধিপতি, তেমন একবিধ নিয়মে তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন। তিনি ধনীর অট্টালিকায় যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে উদিত করেন, দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেও; তাঁহার জল ধনীর পিপাসার শান্তি করে, দুঃখী কাঙ্গালেরও। তিনি এক শ্রেণীস্থ লোকের জন্য এক প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন, অন্য শ্রেণীর জন্য অন্যবিধ; এক শ্রেণী ধর্ম্মের অধিকারী, অন্য শ্রেণী নয়; এরূপ পক্ষপাতী নিয়ম সেই পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে নাই। শরীরের জন্য যেমন অন্ন জল, আত্মার জন্য তেমন তিনি ধর্ম্মকে সাধারণ করিয়াছেন। তিনি ধনীর ঈশ্বর দরিদ্রের ঈশ্বর, তিনি যেমন রাজার তেমন প্রজার, তিনি তোমার তিনি আমার, তিনি সকলের। ধনীর অট্টালিকায় তিনি, কৃষকের পর্ণ কুটীরেও তিনি। তিনি অনিত্য পার্থিব শরীরের প্রতি কেবল যত্ন করেন, আত্মার প্রতি করেন না; দেশ ভেদে, শ্রেণী ও ব্যক্তি ভেদে উচ্চনীচ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; কাহাকে কতগুলি ধর্ম্ম-নিয়ম পালনের অধিকারী করিয়াছেন, কাহাকে করেন নাই; ইহা পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বরের বিচারে কখন হইতে পারে না। মিথ্যা বলা চুরি করা পাপ, কি সভ্য কি অসভ্য, কি জ্ঞানী কি মূর্খ যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই এই কথা স্বীকার

করিবে। ঈশ্বরকে ভক্তি করা, পরের উপকার করা পুণ্য, সকলেই মুক্ত কণ্ঠে বলিবে। ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মার নিকটে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত রাখিয়াছেন, তাঁহার বাহ্য জগতে যেমন এক সূর্য্য সকল দেশের জন্য, তদ্রূপ তাঁহার এক ধর্ম্ম-সূর্য্য সকলের আত্মাকে আলোক দানের জন্য। তবে জগতে ধর্ম্ম-প্রণালী বিভিন্ন দেখিতেছি কেন? হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-মতে অনেক অনৈক্য ও বিসম্বাদ দেখিতে পাই। এই বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উৎপত্তির কারণ মনুষ্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় না বুঝিয়া কি অবহেলা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে বা স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা ধর্ম্ম-প্রণালী প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, তাহাতেই তাহা ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ মানব প্রকৃতির অনুপযোগী পরস্পর বিসম্বাদী হইয়াছে। যাহা সত্য, তাহা সাধারণ; সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল জাতির মধ্যে এক প্রকার; অন্য-বিধ হইতে পারে না। অগ্নির এক সময়ে উষ্ণতা অন্য সময়ে শীতল গুণ যেমন হয় না, আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম। বেদ কোরাণ বাইবেলের যেখানে মনুষ্যের মত, সেখানেই ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ভ্রান্তি ও পরস্পর অসম্মিলন। যেখানে ঈশ্বরের, তাহাই উদার প্রশস্ত সার্ব্বভৌমিক। তোমার যেমন পরিত্রাণ

আবশ্যক, আমার জন্যও সেইরূপ। পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর সকলের জন্য একবিধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য আত্মার সঙ্গেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরের ন্যায় আত্মা ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী নয়, মৃত্যুর পরে আত্মা থাকিবে, অনন্তকাল থাকিবে, ধর্ম্মও থাকিবে। মনুষ্য-সৃষ্টির বহু বৎসর পরে যেমন শরীর রক্ষার উপায় অন্ন জলের সৃষ্টি হয় নাই, আত্মা রক্ষার উপায় ধর্ম্মেরও তদ্রূপ সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্য কখন ধর্ম্মের সৃষ্টি করে নাই। তবে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ভাব লোকের মনে জাগরুক করিয়া দিয়াছেন, এই মাত্র। ধর্ম্ম এক।

ধর্ম্ম অন্তরে

মনুষ্যের অন্তরই ধর্ম্মশাস্ত্র! অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে পুস্তক পাঠ করিয়া বা কোন ধার্ম্মিকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। পশুর নিকটে ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন কর বা উপদেশ দান কর, সে তাহা কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেননা তাহার অন্তরে সেই জ্ঞানের অভাব। মনুষ্যের নিকটে একখানা অশ্লীল আদিরস পুস্তক পাঠকর, সেই পুস্তককে সে কখন ধর্ম্ম-পুস্তক বলিবে না। কারণ তাহার

অন্তরে যে ধর্ম্মের আদর্শ রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সেই পুস্তকের কথার মিল হয় না। বেদ কোরাণ বাইবেলের উপদেশ পাঠ কর, তাহাকে ধর্ম্মবাক্য বলিয়া স্বীকার করিবে। অতএব ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যের অন্তরে রহিয়াছে, পুস্তকাদি সেই জ্ঞান আনিয়া দিতে পারে না, ধর্ম্ম-পুস্তক ও ধর্ম্মোপদেশ অন্তরে ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দেয় মাত্র। যদি অন্তরে সেই মৌলিক জ্ঞান না থাকে, বাহিরের কোন বস্তুই তাহা আনিয়া দিতে পারে না। বেদ কোরাণ বাইবেল ইত্যাদি ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যের ক্ষুদ্রভাব ও তৎসময় প্রচলিত কুসংস্কার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুস্তকের সমুদায় কথাকে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া অন্যায়। তাহাতে জীবনের উন্নতির দ্বার রোধ, মনুষ্যের উচ্চ অধিকার স্বাধীনতার বিনাশ হয়। ঐ সমস্ত পুস্তকে যাহা সত্য আছে, আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, অসত্য-ভাগ অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করিবে। হিন্দুগণ বলেন বেদ ঈশ্বরের বাক্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা বাইবেলকে ঈশ্বর প্রণীত, মুসলমানেরা কোরাণকে ঈশ্বরের গ্রন্থ বলিয়া থাকেন, একথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি এই তিন পুস্তকই ঈশ্বর প্রণীত হইত, তবে আমরা

পরস্পরের মধ্যে অতদূর মতের বৈষম্য, ভাবের অনৈক্য দেখিতে পাইতাম না। ঈশ্বর একস্থানে এক প্রকার বলিবেন, অন্যস্থানে অন্যরূপ, বা তাহার বিপরীত এ প্রকার হইতে পারে না। তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত বা মিথ্যাবাদী। ধর্ম্ম-প্রচারকেরাই লোকের মন আকর্ষণ করিবার জন্য নিজের নিজের ধর্ম্মপুস্তককে ঈশ্বর প্রণীত বা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত অভ্রান্ত ব্যক্তির রচিত বলিয়া থাকেন। পরন্তু ঈশ্বর কি কেবল কত জন জ্ঞানীর ঈশ্বর? তিনি বিশেষ বিশেষ দেশের জ্ঞানী লোকের জন্য বিশেষ ভাষার ধর্ম্মপুস্তক প্রদান করিলেন, যাহারা মূর্খ লেখাপড়া জানে না, তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিলেন, তাহা কি কখন হইতে পারে? যাহারা বেদ কোরাণ বাইবেলের নাম শুনে নাই, পুস্তক পাঠ করিতে জানে না, বেদ কোরাণ বাইবেলের ভাষাতেও কিছু মাত্র অধিকার নাই, তাহারা কি ঈশ্বর-লাভ, পরিত্রাণের অধিকারী নয়? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাহা কখনই নয়। সেই সকল লোকদিগের মধ্যেও সত্যানুরাগ, ঈশ্বরনিষ্ঠা, হিতৈষণা প্রভৃতি ধর্ম্মের উচ্চভাবসকল প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। কয়েক শত কি কয়েক সহস্র বৎসর যাবৎ বেদ কোরাণ বাইবেলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোটি কোটি মনুষ্য

সকলেই কি ধর্ম্মের অভাবে ঈশ্বরের অভাবে নরকে গেল ? ঈশ্বরের রাজ্যে কি কখন এরূপ অনিয়ম ও অবিচার হইতে পারে ? প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বর ধর্ম্মোপদেশ করেন, পুস্তকে নয়। লোকে আপন আপন হৃদয়ের ভাব মাত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রত্যেকের অন্তরই ধর্ম্মশাস্ত্র যিনি তাহা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি ধর্ম্মজ্ঞানী হইতে পারেন। পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু পুস্তকের যে সকল কথা বিবেক-বুদ্ধির অননুমোদিত, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের লিখা, অতএব সত্য, এই বলিয়া গ্রহণ করিলেই বিষম অনিষ্ট হয়। কুসংস্কারী হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপুস্তকে বা ঋষিবাক্যে অনুচিত শ্রদ্ধা ও অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করাতে তাহাদের উন্নতির দ্বার রোধ ও অনেকের ভয়ানক দুর্গতি হইয়াছে। শাস্ত্রে কেবল বাধ্য-বাধকতা। যে নিয়ম মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে, তাহা ঈশ্বরের নয়। মনুষ্য স্বাধীন, তাহার স্বাধীনতা ঈশ্বরের উচ্চ দান। স্বাধীনতাতেই মনুষ্য-জীবনের উন্নতি। হিন্দুসমাজের কেন উন্নতি নাই, তাহা কেন চিরকাল একভাবে চলিয়া আসিতেছে বরং দিন দিন অবনত হইতেছে ? তাহার কারণ তাহারা পুস্তকের অধীন, তাঁহাদের ধর্ম্মে স্বাধীনতা নাই, স্বাধীন চিন্তা

নাই, স্বাধীন কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। পশুপক্ষীদিগের জীবনে কেন উন্নতি দেখিতে পাই না? সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের যে অবস্থা ছিল, এইক্ষণও তাহাই। তাহাদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা প্রকৃতির অধীন, এজন্য। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প আদিতে মনুষ্য সমাজ যে দিন দিন এত উন্নত ও অগ্রসর হইতেছে, কেবল স্বাধীনতা, প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া। স্বাধীনতাতে মনুষ্যের গৌরব, অন্তরে যত স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মের অনুসন্ধান ও সাধন করিবে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবে, তত ধর্ম্ম জগতের সত্য সকল প্রকাশিত হইবে। অন্যথা কখনই নয়। পুস্তকের দাস, ব্যক্তিবিশেষের মতের দাস হইলে কি, তোমার ধর্ম্ম জীবনের মৃত্যু হইল।

ধর্ম্মের যথার্থ সাধনা অন্তরে

অন্তরে ধর্ম্মের সাধনা না থাকিলে বাহিরে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কিছুই নয়। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব হইবে, বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক। আমার মনে দয়ার উদ্রেক হইল, সেই ভাবের উত্তেজনায় দুঃখী বিপন্নের সাহায্য করিলাম, তাহা হইলে আমার যথার্থ দয়ার কার্য্য হইল। এইক্ষণ অনেকে সাধারণের নিকটে প্রশংসা পাইবার জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, অসদুপায়ে

উপার্জ্জিত অর্থাদি দ্বারা অনুষ্ঠানের জাঁক জমক করিয়া থাকে, তাহাকে কখন বাস্তবিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। এই সকল অনুষ্ঠান লোককে সমধিক অভিমানী ও নীচ স্বার্থপর করিয়া তোলে। ধর্ম্মের ভাব নিঃস্বার্থ পবিত্র। যথার্থ ধার্ম্মিক পৃথিবীর নিকটে কিছুই আশা করেন না। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বিনীত ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর কার্য্য বলিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। লোকের নিন্দা প্রশংসার কিছুই ধার ধারেন না। এইক্ষণ অন্তরে সাধনা নাই। কেবল বাহ্যাড়ম্বর। ধর্ম্মের নামে সচরাচর কপটতা। যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার মধ্যে কেবল অধর্ম্ম। কুৎসিত আমোদ, ইন্দ্রিয় সুখভোগ, সংসারের সেবা, দাম্ভিকতা ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য হইয়াছে। বেশ্যা প্রভৃতির অশ্লীল নৃত্য গীত, এবং সুরাপান অনেক ধর্ম্মক্রিয়ার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কোথায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মনুষ্যকে ভক্ত বিনীত পবিত্র করিবে, না, গর্ব্বিত জঘন্য চরিত্র করিয়া তুলিতেছে। যে কার্য্যে পরিত্রাণ দিবে, না, সে কার্য্য লোককে নারকী করিতেছে। আশ্চর্য্য! ধর্ম্মানুষ্ঠানের পুরস্কার কল্পিত স্বর্গে ও সুরা অপ্‌সরা ভোগ, সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের বাহ্যাড়ম্বর, শাস্ত্রের এই মত। স্বর্গেতেও এতদূর নীচভাব, কি পরিতাপের বিষয়!! সংসারের সুখ,

ইন্দ্রিয় সুখ ব্যতীত, সাধুদিগের যে অন্য কোন উচ্চতর পবিত্র সুখ আছে, তাহাতে একেবারে যেন জ্ঞানই নাই। বাস্তবিক ধর্ম্মের সঙ্গে পাপস্রোত হিন্দুসমাজে যে প্রকার প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ে নয়। আর্য্য মহর্ষিগণ এইক্ষণ আসিয়া যদি তাঁহাদিগের সন্তানদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিতেন, ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

সংসারই ধর্ম্ম সাধনার উপযুক্ত স্থান

আমরা বনবাসী হইয়া একাকী ধর্ম্ম সাধনা করি, ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ প্রকৃতি প্রদান করেন নাই। সংসারে থাকিয়া পাপ প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। প্রলোভনের ভয়ে সংসার ছাড়িয়া পলায়ন, পাপ জয় করা নয়। সংসারে পাপকে পরাজয় করাই মহত্ত্ব ও ধর্ম্মবীরের কার্য্য। পলায়ন করা কাপুরুষের কার্য্য। পাপ মনে, পলায়ন করিয়াও তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বতন ঋষিগণ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া নির্জনে ধর্ম্ম সাধনা করিতেন, তাঁহারা বনে থাকিয়াও সামান্য কারণে পাপে বার বার পতিত হইয়াছেন। এক জনে একটু অনাদর করিল, অমনি রাগ করিয়া অভিসম্পাত করিলেন, একটী সুন্দরী স্ত্রী দেখিলেন, তাহাতেই ভুলিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, পুরাণাদির

আলোচনায় ঋষিদিগের সম্বন্ধে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্ম সাধনা স্বাভাবিক নয়, সংসারে থাকিয়াই পাপ প্রলোভনকে পরাজয় করিতে হইবে। পাপকে পরাস্ত আমরা কাহার বলে করিব? নিজের বলে? না, নিজে অতি দুর্ব্বল। ঈশ্বরের সাহায্যে। অন্তরে দেবভাব, অসুরভাব দুই ভাব আছে। ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি যে সকল ভাব মনুষ্যকে স্বর্গীয় জীবন দান করে, তাহাকে দেবভাব, কাম ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল ভাব নীচ সংসারাসক্ত, পাপাসক্ত করিয়া তোলে, তাহাকে অসুরভাব বলা যায়। অসুরভাব দেবভাবের বিরোধী। অন্তরে সর্ব্বদা দেবাসুরের সংগ্রাম হইতেছে। পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধের বর্ণনা অনেকে শুনিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই যে দেবাসুরের যুদ্ধ, তাহা অনেকে দেখেন না। পুরাণোক্ত দেবতাদিগের সহায় হরি ছিলেন, অন্তরের সেই দেবতাদিগের সহায় স্বয়ং ঈশ্বর। পুরাণোক্ত অসুরগণ আক্রমণ করিয়া দেবতাদিগকে বারম্বার বিড়ম্বিত করিলেও পরে তাহাদিগকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল, অন্তররাজ্যের অসুরদিগকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহারা হীনবল ও অধীন না হয়, বারম্বার অন্তররাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিবে, দেবতাদিগকে বিড়ম্বিত করিবে। পলাইয়াও কাহার

নিস্তার নাই। অতএব সংসারে থাকিয়াই পাপাসক্তি ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে হইবে, যতই তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়, ততই আত্মার বল বাড়ে ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও নির্ভর হয়। পলায়ন করা ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস। সংগ্রামে বিমুখ, পলায়িত সেনার বলবীর্য্য প্রভুভক্তি আছে, কে বলিবে? পরমেশ্বর আমাদিগকে শক্তি-সামর্থ্য-অস্ত্র-শস্ত্র-বিহীন করিয়া সংসারে প্রেরণ করেন নাই, একাকী এখানে রাখিয়া দূরে চলিয়া যান নাই, ভয় কিসের?

মনুষ্যের আত্মা, মন, শরীরের বৃত্তিসকল সংসারের উপযোগী, সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জন অরণ্যবাসী হইলে সেই সকল বৃত্তি একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। নির্জনে থাকিলে ভক্তির পাত্রদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করার ব্যাঘাত হয়, দয়ার পাত্রে দয়া, প্রীতির পাত্রে প্রীতি, স্নেহের পাত্রে স্নেহ হইতে পারে না। এরূপ হইলে পরস্পর সাহায্যের অভাবে পৃথিবী ভয়ানক দুঃখের আলয় হইয়া উঠে। তাহাতে মনুষ্যবংশের লোপ হয়, সংসার অরণ্যে পরিণত হয়। ঈশ্বর শারীরিক মানসিক কোন বৃত্তিই নিরর্থক দেন নাই। সমুদায় বৃত্তিকে উপযুক্তমতে চালনা করিবে, সংসারে থাকিয়া সমুদায় কার্য্য তাঁহার উদ্দেশ্যে করিবে এই তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ। শাস্ত্রে আছে, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।

যত্তৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবে, যে যে কর্ম্ম করিবে তাহা পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে। পরন্তু সংসারে বাস করিবে, অথচ তাহাতে অনাসক্ত নির্লিপ্ত থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "বসন্ বিষয় মধ্যেপি, ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্; সংবসত্যেব নির্বুদ্ধি রসৎস্থ বিষয়েষ্বপি।" বুদ্ধিমান্ লোকেরা সংসারে বাস করিয়াও বাস করেন না, কিন্তু অজ্ঞানী লোকেই অসৎ সংসারে বাস করে। মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধুভাণ্ডারের উপর থেকে মধুপান করে, সেইরূপ সংসারে মগ্ন না হইয়া সংসারে সুখ ভোগ করিতে হইবে। যে সুখ ধর্ম্মের বিরোধী তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

উপাসনা

ঈশ্বরকে প্রীতি, মনুষ্যকে প্রীতি করাই ধর্ম্ম। উপাসনা ব্যতীত ইহা কখন সাধন হইতে পারে না। উপাসনার প্রধানত তিন অঙ্গ। যথা আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা। ঈশ্বরের স্বরূপসকলের সঙ্গে আত্মার যোগ সাধনই আরাধনা। যথা ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া সম্মুখীনভাবে তুমি সত্যস্বরূপ, বিশ্বের প্রাণ, আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, আমরা তোমাতেই জীবন ধারণ করিতেছি, তুমি প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী,

জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক ব্যাপার তোমারই অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে, তুমি অন্তর্য্যামী হইয়া আমাদিগের অন্তর দেখিতেছ, দুই একটি সাধুকার্য্য করিয়া মনুষ্যের নিকটে আমরা সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, হে ঈশ্বর তোমার নিকটে কোন পাপই কপটতায় ঢাকা থাকে না। তুমি মনের কলঙ্ক দেখ, তোমার ন্যায়দণ্ডে প্রত্যেক পাপীকে শাস্তি পাইতেই হইবে। গোপনে পাপ করিয়া, কুভাব কুচিন্তাকে পোষণ করিয়া কেহই এড়াইতে পারিবে না। তুমি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামী। এই প্রকার তাঁহার মহত্ত্ব, আনন্দ, শান্তি, অমৃতত্ব, দয়া, অদ্বিতীয়ত্ব, পবিত্রতা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে আলোচনা করাই আরাধনা। এই আরাধনাতে অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল আনন্দ হয়, ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তররূপে উপলব্ধি করিয়া মন প্রশস্ত ও উন্নত হয়। কৃতজ্ঞতা ; ঈশ্বরের অনন্ত করুণার জন্য উপকার স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বাধ্য ও বিনীত হওয়াই কৃতজ্ঞতা। আমরা মনুষ্যের নিকটে একটী সামান্য উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞ হই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের এত উপকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা দিনান্তেও তাঁহাকে একবার ভালরূপ স্মরণ করি না। বল সেই অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে, সংকীর্ণ জরায়ুকোষে কাহার প্রেমহস্ত আমাদের

সুকোমল দেহের নির্ম্মাণ ও রক্ষা করিয়াছিল ? ভূমিষ্ঠ হইলে যখন কিছুই জানিতাম না, বুঝিতাম না, জড়-পিণ্ডের ন্যায় ছিলাম, তখন মাতৃস্তনে দুগ্ধ, তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ কে দিলেন ? রোগের সময় ঔষধ, বিপদের সময় বিপদুদ্ধার কে করিতেছেন ? প্রতিদিন অন্নপান যোগাইয়া কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন ? কে অন্তরে বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রেরণ করিলেন ? ঈশ্বর কি নন ? তিনি কি কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন না ? তবে কে হইবে ? ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতাতে মন বিনীত হয় ও তাঁহার করুণা ধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। প্রার্থনা ; প্রার্থনার দুই অবস্থা। এক ভাব-পক্ষে, অপর অভাবপক্ষে। ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার সহবাস লাভের জন্য যে প্রার্থনা, তাহা ভাবপক্ষে। মনের দুর্ব্বলতা ও পাপ দূর করিবার জন্য যে প্রার্থনা, তাহা অভাবপক্ষে। প্রার্থনার দ্বার ব্যতীত ধর্ম্মরাজ্যে গমন ও পরিত্রাণ লাভের অন্য পথ নাই। দুর্ব্বল পাপীর প্রার্থনা মাত্রেই বল। দয়াময় ঈশ্বর, যে তাঁহাকে চায়, তাঁহার নিকটেই প্রকাশিত হন। কঠোপনিষদে আছে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্" সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর উত্তম বচন কি বহুমেধা কি

বহু শ্রবণ দ্বারা লভনীয় নহেন, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহার নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। দুঃখ কি নাই? অশান্তির আগুনে কি জ্বলিতেছ না? পাপ কি কর নাই? যে ঈশ্বরের প্রয়োজন হইবে না? সংসারের কিছুই তো তোমার আপন নয়। মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি, জীবন মরণের সম্বল একমাত্র ঈশ্বর। তাঁহা ভিন্ন গতি নাই। আজ যদি পরলোকে চলে যাও, কে তোমার সাথী বল? যাহাদের জন্য এত পাপ করিলে তাহারা তোমাকে ভুলিয়া যাইবে। যিনি তোমাকে চিরদিন প্রেম করিতেছেন, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলে, দূর করিয়া দিলে? এখন হইতে দয়াময়কে ডাক, তাঁর শরণাপন্ন হও, তিনি ভিন্ন পরিত্রাতা নাই। প্রাণের সহিত ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা ও তাঁহার সহবাসে উন্নত হওয়াই পরিত্রাণ।

ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে না পারিলে মনুষ্যের প্রতি বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ প্রেম হইতে পারে না। জগৎ ঈশ্বরের, নরনারী তাঁহার সন্তান ও প্রজা। তিনি সমুদায়কে প্রেম করিতেছেন। যিনি ঈশ্বরের প্রেমিক ভক্ত হইবেন, তিনি তাঁহার ভালবাসার বস্তুকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। ঈশ্বরকে প্রেম করার অর্থ তাঁহার ভাব, ইচ্ছা, কার্য্যকে প্রেম করা। যিনি

মনুষ্যের বিরোধী, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী ; যিনি বলেন আমি নরনারীকে প্রেম করিতে পারি না, ঈশ্বরকে প্রেম করি, তিনি মিথ্যাবাদী ।

সাধারণ নীতির অভাব

এইক্ষণ প্রায় কোন পরিবারে শান্তি সদ্ভাব নাই । প্রত্যেক পরিবার পরস্পর বিবাদ, কলহ, রাগ, বিদ্বেষের আগুনে জ্বলিতেছে । ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রণয় নাই, ভগিনীতে ভগিনীতে সদ্ভাব নাই, পরস্পরে বিশ্বাস নাই । কে কাহাকে নির্যাতন করিবে তাহারই চেষ্টা । মিথ্যা, জাল, প্রবঞ্চনা, লোকের যথার্থ স্বত্বের হানি করা, এক্ষণ আর পাপের মধ্যে গণ্য হইতেছে না । পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও স্বজাতীয়ে স্বজাতীয়ে সদ্ভাব আছে ; শত শত পশু, শত শত পক্ষীকে নির্ব্বিবাদে পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া একত্র বাস, একত্র বিচরণ করিতে দেখা যায় । কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, মনুষ্যের মধ্যে তাহা পাওয়া দুর্ঘট হইল । যেখানে পাঁচজন মনুষ্য, সেখানেই দেখ কেমন অসার বিষয় নিয়া দলাদলির ঘোঁট, পরস্পরের প্রতি হিংসা । ধর্ম্ম যাজকেরা এইক্ষণ ইহা নিয়াই মত্ত, তাঁহাদের জ্ঞান ধর্ম্ম জপ তপস্যার পরিণাম দলাদলি হইয়াছে । যেখানে জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা নাই,

সেখানেই এই দুর্গতি হইবে আশ্চর্য্য নয়। আমরা চির পরাধীন দুঃখী বাঙ্গালী, না আছে জ্ঞান, না আছে সভ্যতা, না আছে ধনবল, দেহবল। সকল দেশের লোকের নিকট হেয় হইয়া রহিয়াছি। তাহার মধ্যে যদি আবার হিংসা দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া মরি, তবে উপায় কি হইবে।

অনেক অভিভাবক বালক বালিকা ক্রোধী দুর্ব্বিনীত অসচ্চরিত্র বলিয়া আক্ষেপ করেন। তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কঠোর শাসনও করিয়া থাকেন। কিন্তু বালকদিগের স্বভাব বিগড়িয়া যাওয়ার কারণ তাঁহারা। তাঁহারা যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, শিশুগণ তাহারই অনুকরণ করে। তাঁহারা সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন না, বালকগণ সৎ হইবে কেন? বিদ্যালয়ে দুই ঘণ্টা জ্ঞান উপদেশ পাইলে কি হইবে? যদি ঘরে আসিয়া দেখে মাতা মিথ্যা কথা বলিতেছেন, পিতা ক্রোধী অহঙ্কারী, ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভগিনীতে ভগিনীতে হিংসা দ্বেষ, সত্যের প্রতি সমাদর নাই, ঈশ্বরে ভক্তি নাই, তবে কেমন করিয়া শিশুর ভাল নীতি হইবে? বালকেরা স্বভাবতঃ অনুকরণ প্রিয়, যাহা দেখে তাহাই শিখে। যদি সন্তানসন্ততিদিগের কল্যাণ চাও, তবে নিজে ভাল হও, সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর।

নারীজাতির প্রতি ব্যবহার

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশের স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বৃত্ত পুরুষেরা দুর্ব্বলা অবলাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বধীনতার উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে। তাঁহারা যেন পুরুষের সেবার জন্য — কেবল দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন, অনেক পুরুষের এই জঘন্য সংস্কার। ভার্যার প্রতি পবিত্র ভাবে দৃষ্টি নাই, দাম্পত্য প্রেমে পবিত্রতা নাই, বিবাহের উচ্চ উদ্দেশ্য, গুরুতর প্রতিজ্ঞা ও দায়িত্বের প্রতি পুরুষদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তাহারা স্ত্রীকে আপনার ভোগসুখ সাধনের সামগ্রী স্বরূপ, গৃহদাসী স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার জীবনের বিড়ম্বনা করিতেছে। কেবল তাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও হইত, অনেক দুরাচার স্বামী সহধর্ম্মিণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া কুলটা পিশাচীদিগের প্রণয়ে জীবনকে কলুষিত করিতেছে। বাস্তবিক অনেক স্বেচ্ছাচারী পুরুষ এক একটি উপায়-হীন সরলা অবলাকে বধ করিতেছে। এক ধর্ম্ম মনুষ্যকে শাসনে রাখিতে পারে, সমাজে সেই ধর্ম্মের শাসন কিছু মাত্র নাই। অসার অনর্থ বিষয় লইয়া কত দলাদলী হয়, কিন্তু ব্যভিচার, পাপে যে দেশের মহাদুর্গতি হইতেছে, তাহার প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপও

করেন না। শাসন করিবে কে? ধর্ম্মযাজকগণের তো তাহাতে উপার্জ্জন পথ বন্ধ হইতেছে না? তাঁহাদিগের তাহাতে দৃষ্টি পড়িবে কেন? আবার অনেক স্থলে অনেক ধর্ম্মযাজক স্বয়ংই শিষ্য যজমান পত্নীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন, এস্থলে উপায় কি? হায়! কি শোচনীয় অবস্থা। একজন ষাট সত্তর বৎসর বয়সের পুরুষ ইচ্ছা করিলে গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ করিতে পারিবেন, একটি স্ত্রী পাঁচ বৎসর বয়সে বিধবা হইলে সে আর যাবজ্জীবন পরিণয়ের অধিকারী নয়। কি স্বেচ্ছাচারিতা, স্ত্রীজাতির প্রতি কি কঠোর শাসন!! স্ত্রীলোকেরা যেন মানুষ নয়, তাঁহাদের যেন ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই। এই সকল কুনীতিতেই ব্যভিচার ও সন্তানহত্যা পাপে দেশ উৎসন্ন হইতেছে।

সুরাপান

এই গ্রামের অনেক যুবকের মধ্যে পানদোষের অত্যন্ত প্রাবল্য। তাঁহারা নিজে সুরাবিষ পান করিয়া মরিতেছেন, কুদৃষ্টান্ত দ্বারা অপর কত যুবক ও বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তাঁহারা এই গরল পান করিয়া আর আত্মহত্যা করিবেন না, অন্যকেও মারিবেন না। সুরাপানে যে জনের অকাল

মৃত্যু, চির দারিদ্র্য, রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, কত পরিবার ছারখার হইয়াছে, কত ভদ্র যুবা মনুষ্য-সমাজে নীচ পশুর ন্যায় ঘৃণিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশের অন্ন-জলে প্রতিপালিত হইয়া মাতলামী করিয়া এদেশকে আর দুঃখের জলে ভাসাইবেন না। জন্মভূমির প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হউন। আত্মীয় স্বজন ও দেশীয় লোকের এবং নিজের কল্যানের জন্য সাবধান হউন।

উপসংহার

আমার বক্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এইক্ষণ আপনাদিগের নিকটে মিনতি করি, অমি যাহা কিছু বলিলাম, আপনারা একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। যদি আমার কথাগুলি সত্য হয়, অনুরোধ করি, তাহা প্রতিপালন করিবেন, অসত্য হইলে পরিত্যাগ করিবেন। একজন দুঃখী লোক কয়েকটী কথা বলিয়াছে, ইহাতে উপেক্ষা করিবেন না। আপনাদের চরণ ধারণ করিয়া আর একটী মিনতি করিতেছি, আপনারা অন্ততঃ দিনান্তে একবার যিনি আপনাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, স্নেহ প্রেম করিতেছেন, তাঁহাকে ডাকুন। ব্রহ্ম বলিতে আপনাদের আপত্তি থাকে,

ঈশ্বর ও দয়াময় বলিয়া ডাকুন। ব্যাকুল অন্তরে কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখুন নিশ্চয় দুঃখ পাপ যাইবে। যদি না যায়, পরে বলিবেন যে এ বক্তি মিথ্যা বলিয়াছে। ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া সকলকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।

অসম্ভব সম্ভব

শান্তি কুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ২৩শে পৌষ, ১৮১৬ শক ; ৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

ব্রহ্মজ্ঞান, বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি, পরিষ্কার চিন্তা, নির্ম্মল প্রতিভা, গভীর ভক্তি, নির্দ্দোষ চরিত্র উপার্জ্জন করিলে মানুষ খুব উচ্চ অধিকার লাভ করে ; কিন্তু ইহাতে জগতের উপকার কি ? ইহাতে কি অসম্ভব সম্ভব হয় ? যদি অসাধ্যসাধন না হইল, যাহা স্বাভাবিক এবং সাধারণ কেবল তাহাই ঘটিল, যাহা স্বভাবের বহির্ভূত তাহা ঘটিল না, তাহা হইলে মানুষ ধর্ম্মকে অতি সামান্য বস্তু মনে করিবে। বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবে না। যতই কেন নীতি বিজ্ঞানের উন্নতি হউকনা, মানুষ অসম্ভব ঘটনার আশা করিবে, অসাধ্য সাধনের জন্য প্রতীক্ষা করিবে ; আর যদি তাহাদের আশা বিফল হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। আমি বলিতেছি অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। পুরাণে বলে এককালে ধর্ম্মাত্মাগণ অন্ধকে চক্ষুদান, মৃতকে জীবন-দান করিতেন, কোথাও বা পাঁচখণ্ড রুটীকাতে পঞ্চ-

সহস্রের ভোজন, কোথাও বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ, কোথাও বা এক রাত্রি মধ্যে সপ্তস্বর্গ বিচরণ ইত্যাদি নানা অসম্ভব ঘটনার আবৃত্তি শুনা যায়। আমি আজ ঊনবিংশতি শতাব্দীর অন্তকালে তোমাদের দিব্যচক্ষুতে সেই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারের ধূলি নিক্ষেপ করিতে প্রকাশ পাইতেছি না। কিন্তু আমি বলি ধর্ম্মবিশ্বাস, প্রবল প্রীতি, নির্ম্মল জ্ঞান এবং গূঢ় সাধনা দ্বারা জীবনের অন্তঃস্থলে এক মহাশক্তি সঞ্চার হয় যদ্দারা একদিন যাহা একান্ত অসম্ভব মনে হইত তাহা সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মাদিষ্ট কার্য্য ভগবানের প্রীতির জন্য, লোকের হিতের জন্য পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আরম্ভ কর তাহা হইতে আশ্চর্য্য ফল ফলিবে। কালের গতি, জগতের অভাব, বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া তেজের সহিত যে সংস্কারের সূত্রপাত করিবে, সহস্র দেবদূত নামিয়া তাহার সিদ্ধি বিধান করিবেন। একজনের নয়নাগ্নিতে লক্ষ জনের হৃদয় প্রদীপ্ত হয়, একজনের অসিতে অনেক জাতি বিজিত হয়, একজনের বীরত্বে সমস্ত একজাতীয় লোক বীরপুরুষ হইয়া উঠে। এক নেপোলিয়নের ক্ষমতাতে ফরাশীজাতি কিনা করিল? এক গুরুগোবিন্দ সিংহের সাহসিকতায় তাবৎ শিখজাতি সিংহ নামে আখ্যাত হইল। একা শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব হইয়া বঙ্গ উড়িষ্যাকে

বৈষ্ণব করিলেন। এক বিশ্বাসী মহাপুরুষ মহম্মদ জ্বলন্ত শক্তিতে আরব, তুরস্ক, মিসর, পারস্য, তাতার, সমুদয় অধিকার করিলেন। ইহা যদি অসম্ভব কীর্ত্তি না হয় তবে আর কি ? সেদিন একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বঙ্গদেশ উলট্ পালট্ হইয়া যাইতেছে। এখনও ইহা হইতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে পারে কে বলিবে ? দেখিলে একটি সামান্য সূত্রধর তনয়ের-দ্বারা পৃথিবীর কি অশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল ; এই সমস্ত দেখিয়াও কি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ?

অসম্ভব সম্ভব মানিতে গিয়া প্রকৃতির চিরন্তন প্রণালীকে অতিক্রম করিও না,—প্রকৃতির নিয়ম অনতিক্রমনীয়। প্রকৃতি রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করেন, গোময়কে কমলে পরিণত করেন ; তাই বলিয়া তুমি রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করিতে পার না, রৌপ্যকে স্বর্ণ করিতে পার না, যদি চেষ্টা কর সামান্য সততা পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, নিম্ন প্রকৃতিও আছে, উচ্চ প্রকৃতিও আছে, জড়ীয় প্রকৃতিও আছে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে। যেরূপ প্রকৃতি তার উপর তজ্জাতীয় নিয়ম খাটে, উচ্চ প্রকৃতির নিয়ম অনেক সময়ে নিম্ন প্রকৃতিকে রূপান্তর করিয়া থাকে বটে ; ইহার হেতু পরে বলিব, কিন্তু প্রায়ই

নিম্ন প্রকৃতি উচ্চকে নিয়মিত করিতে পারে না। জ্ঞানের অনুশীলনে জড়জগতে অনেক প্রকার উন্নতি হইল, অসম্ভব সম্ভব হইল। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভাবে অনেক অন্ধ ব্যক্তি চক্ষু প্রাপ্ত হইল, পঙ্গু গতিশীল হইল, আপাততঃ যাহাকে দেখিলে মৃত বোধ হয় এমন মানুষ পুনর্জীবিত হইল, বধির ও বোবা কথা কহিতে শিখিল। প্রাকৃতিক শক্তিকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করিয়া কেহ আকাশে উড়িতেছে, কেহ সাগরে ডুবিতেছে, বিদেশস্থিত বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ভবিষ্যতে আরও কত আশু অসম্ভব ক্রিয়া সম্ভব হইবে কে ললিতে পারে? আধ্যাত্মিক শক্তিতে কখন কখন জড়ীয় ব্যাপার ঘটিয়া থাকে বটে; কিন্তু জড় জড়ের নিয়মানুসারে, আত্মা আত্মার নিয়মে পরিচালিত হয়। তবে উচ্চ নীচ উভয় প্রকৃতির পরস্পর যোগ থাকার জন্য অনেক কার্য্যে দুয়েরই চিহ্ন দেখা যায়। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগত হওয়া প্রকৃতির নিয়ম; হিম-প্রভাবে সমুদ্রও নদীর জল যত পরিমাণে বরফ হওয়া বিধেয় তাহাই হইবে, সমস্ত জলরাশি কখনও হিমশীলাতে পরিণত হইবে না। এবং যেমন এই সমস্ত নিয়ম-প্রণালী অতিক্রম করিয়া কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই; ধর্ম্মজ্ঞানে, ধর্ম্মবিশ্বাসে এবং ধর্ম্মশাসন সম্বন্ধেও

তেমনি বিধি আছে। জড়ীয় নিয়মে যাহা অসম্ভব, আধ্যাত্মিক নিয়মে তাহা সম্ভব। জড়চক্ষে যাহা অসম্ভব অধ্যাত্মচক্ষে দেখিলে তাহা বিলক্ষণ সম্ভব; অতএব অসম্ভবের সম্ভব হয়।

পরমাত্মা চৈতন্যময়, জড়েরও প্রভু, জীবেরও প্রভু, আত্মারও প্রভু, ত্রিভুবন তাঁহার নির্দ্দেশে শাসিত হইতেছে। নিজ বিধি অতিক্রম না করিয়াও তিনি সমস্ত শাসন করেন। মহাপুরুষগণের জীবনের ঘটনাও এই প্রকারে পরিচালিত; তাঁহারা প্রকৃতির অতীত নহেন, কিন্তু ঐশী শক্তি ও অসামান্য প্রভাবহেতু উচ্চ প্রকৃতি দিয়া নীচ প্রকৃতিকে অনেক দূর চালিত করিতে পারেন। বিশ্বাসে রোগীর রোগ সারে, দুর্ব্বলের বল হয়, মনস্কামনা পূর্ণ হয়, শিথিল চরিত্র লোকের ইন্দ্রিয় সংযম হয়, এবং অন্যান্য অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, কে তাহা না শুনিয়াছে? এ বিষয়ে অনেক অত্যুক্তি আছে বটে; অনেক ভেল্কিবাজ যাদুকর ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যতদূর অবিশ্বাস করি ততদূর সঙ্গত নয়। আমরা যাই জানি ও বিশ্বাস করি তদপেক্ষা অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা জগতে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসদ্বারা নীচ প্রকৃতি মধ্যে উচ্চ প্রকৃতির আবির্ভাব হয়।

এমনও একদিন ছিল যখন মানুষ মহা অজ্ঞান-জালে জড়িত থাকিয়া ধর্ম্মের নামে হত্যা ও চুরি ইত্যাদি কুকার্য্য করিত। দেবতার সম্মুখে নরবলি দিত, সন্তান বৎসলা জননী সন্তানকে জলে ভাসাইয়া দিত, একজন অন্ধ চক্ষু পাইলে, কি একজন বোবা কথা কহিলে, একটি উৎকট রোগ আরাম হইলে, লোকে দৈববল বিশ্বাস করিত,— বলিত অসম্ভব সম্ভব হইল। আর যেখানে সেই ঘটনা হইত সেখানে তীর্থ স্থাপন করিত। এখন কত অজ্ঞানী জ্ঞান পাইতেছে, কত বৃদ্ধ অন্ধ চক্ষু লাভ করিতেছে, কত মৃতপ্রায় লোকে জীবন পাইতেছে, কিন্তু কল্পিত নিয়মে নহে, প্রাকৃতিক নিয়মে এই সমস্ত ঘটিতেছে বলিয়া কেহ একবার ফিরিয়াও তাকায় না। যুগমাহাত্ম্যবলে কি জড়-জগতে কি আত্মাজগতে অনেক অসম্ভব সম্ভব হইল। এখনও হইবে,— কতদূর হইবে কে বলিতে পারে? এখন প্রকৃতির নব নব শক্তি আবিস্কৃত হইতেছে, উচ্চ বিধিতে নিম্ন জাতীয় নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। জড়ের উপর চৈতন্যের প্রভাব দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে, এখনও দ্রষ্টব্য অনেক ব্যাপার অবশিষ্ট আছে।

অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার সেইগুলি, যাহা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা

প্রার্থনা ও ধর্ম্মানুশীলনের বলে আমরা সহজে নানা প্রকার অমূল্য ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিতেছি। তাহাদের দৃষ্টান্তে আমরা শারীরিক প্রবৃত্তিকে বশ করিতেছি, জনসমাজকে রূপান্তরিত করিতেছি, সমস্ত জগৎকে দিন দিন একাকার দেখিতেছি।

ঈশা দশটি মাত্র দুর্ব্বল হীন জাতীয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া পৃথিবীকে পরাজয় করিলেন, তৎপরে কত শত পরাক্রান্ত বিশ্বাসী সংসারের উষর ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত তাহাতে সিঞ্চন করিলেন, এবং তাহার অঙ্কুর দেখিতে না দেখিতে ধরাতল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের অসম্ভব কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইল। তাঁহাদের পদচিহ্ন পথে দেখিয়া অনেক বংশ, অনেক জাতি দুর্গম ভূমিতে উপনীত হইল, এবং যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব হইতে পারে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সেদিন ব্রাহ্মধর্ম্মজগতে একটি দেবগত প্রাণ অবতীর্ণ হইলেন,— তাঁহার নির্ম্মল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্র বিবেক,— অপরিশ্রান্ত কার্য্যকুশলতা কি না করিয়াছে? অতএব বলি জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, সাধনা, যাহা কিছু উত্তম বস্তু পাইয়াছ তাহা উন্নতির পথে ছাড়িয়া দাও— অসম্ভব সম্ভব হইবে।

অসম্ভব সম্ভবের কথা অনেক বলা হইল, অনেক দৃষ্টান্ত দেখান হইল; কিন্তু দেখিতে হইবে কিরূপে অসম্ভব ব্যাপার হইতে পারে। তাড়িৎ বার্ত্তাবহ যন্ত্রের কথা ভাবিয়া দেখ—তাড়িৎ সংযোগে জগতে অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করিয়াছে। আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মার তেমনি তাড়িৎ সংযোগ আছে। যত কিছু ভাবিবে, করিবে, বলিবে, ভাবেতে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, জীবনের আদর্শে, আশার স্বপ্নে, সমস্ত বিষয় সেই প্রাণময় অনন্তদেবতার সঙ্গে সংযুক্ত কর। ইহাতে সহজে এবং প্রাকৃতিক প্রণালীতে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা সম্ভব হইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতি দেবপ্রকৃতি হইয়া যাইবে।

অতএব এস, আমরা সকলে সেই অনন্ত দেবতার মহাশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হই। তাঁহার ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলাইয়া, তাঁহার জ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই অনন্ত গুণ হইতে গুণ লাভ করিয়া একান্ত তাঁহারই আশ্রিত হইয়া যে সমস্ত অসম্ভব ব্যাপার আমাদের জীবনে এবং প্রকৃতিতে নিহিত আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করি, দিনের পর দিন আরও অধিক শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভাবদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাদের সকলকে অশীর্ব্বাদ করুন।

উত্তম দৃশ্য কি ?

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ৩০শে পৌষ, ১৮১৬ শক ; ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

পৃথিবীতে উত্তম দৃশ্য কি ? যাহা দেখিলে ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব চরিতার্থ হয়, জ্ঞানীর প্রজ্ঞা পরিপক্ক হয়, দর্শকের অন্তর্দ্দর্শন খুলিয়া যায়, এমন উত্তম দৃশ্য কি ? সেই পুরাতন পৃথিবীর পুরাতন বৃক্ষে পুরাতন পত্র, পুরাতন লতায় পুরাতন ফুল, পুরাতন আকাশে পুরাতন শশীতারা, পুরাতন লোকের পুরাতন কথাবার্ত্তা, সেই পুরাতন ধর্ম্মমণ্ডলীর পুরাতন বিবাদ, বিচ্ছেদ, পুরাতন পুরোহিত, পুরাতন মন্ত্র পাঠ করিতেছে, পুরাতন বৃদ্ধ মোল্লা পাঁচোক্ত নমাজের আজান দিতেছে, ইহা আর দেখিতে ভাবিতে ইচ্ছা করে না। ইহা অপেক্ষা উত্তম দৃশ্য কি আর নাই ? এক ভাবে এই সমস্ত উত্তম বটে। সুন্দর প্রকৃতি, গগনের শোভা, লোকের শ্রী, ধর্ম্ম-ইতিহাসের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আমরা সকলে ভালবাসি ; কিন্তু যাহার মন জড়ীভূত, যাহার চক্ষু কুভাব ও কুদৃষ্টিতে অন্ধপ্রায়, যাহার চিন্তা কেবল সংসারে আবদ্ধ,

সে কোন্ গূঢ়তত্ত্বের অধিকারী ? জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে কে ? যোগীর যোগমগ্ন-চিত্ত, মনীষীর গভীর ধ্যান, জ্ঞানীর সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ও শাস্ত্রবিদ্‌দিগের নির্ম্মল ধারণা ভিন্ন উত্তম দৃশ্য ভোগ করিবে কে ?

প্রভাত হইয়াছে মাত্র, পথের ধূলি ঘননিবিষ্ট তৃণের নীহারকণিকাকে মলিন করে নাই, লতায় লম্বিত কুসুম-রাশির সুগন্ধ চারিদিকে ছুটিয়াছে, আকাশে আলোক, পৃথিবীতে শান্তি, নিঃশব্দ নগরের এ অলৌকিক শোভা কে দেখিবে, কে ভোগ করিবে, কে ব্যবহার করিবে ? ভোগীও নয়, রোগীও নয়,— কেবল যোগী। তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে তিনি যোগাসন পাতিলেন, নিমেষে প্রকৃতির মধ্যে মহাপ্রকৃতিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার যোগচক্ষু সকল দৃশ্যের মধ্যে এক আভ্যন্তরিক দৃশ্য দর্শন করিল, প্রকৃতির মধ্যে পরম পুরুষকে দেখিতে পাইল, পক্ষীর কণ্ঠে দেবধামের সমাচার শুনিল, আকাশের বিস্তারে অনন্তের ইঙ্গিত পাইয়া হৃদয় পূর্ণ হইল, মানুষের আকারে পরব্রহ্মের ক্ষীণ ছবি তিনি বুঝিতে পারিলেন, পৃথিবী তাঁহার নিকটে আর পৃথিবী নহে— স্বর্গধাম। সমুদয় সুন্দর দৃশ্য তাঁহার জন্য। তিনি ত্রিসংসারের অধিকারী। কেননা তিনি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার আত্মা

ঈশ্বরের অংশ ।

জগৎ জড়ীয় নহে, চিদাভাসে পরিপূর্ণ, দর্শকও জড়ীয় নহে চিদানন্দের সন্তান । যদি মানুষের ভাবুকতা না থাকে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, প্রেম ভক্তি না থাকে, তবে তাহার সঙ্গে প্রকৃতির যোগ হইবে কিরূপে ? বাহ্যিক প্রকৃতি ও আন্তরিক প্রকৃতির ভিতর সূক্ষ্ম সংস্রব আছে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক না ঘটিলে অধ্যাত্ম যোগ হয় না । দৃষ্ট প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্র প্রভাব, দর্শকের প্রকৃতি মধ্যেও সেই নিগূঢ় প্রভাব । প্রভাব বল, আর শক্তি বল, আর প্রতিভা বল, আর জ্যোতির্ম্ময় যোগানন্দ বল, মূলে সামগ্রী একই । সেই যোগেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড হইতে মানবাত্মাতে, মানবাত্মা হইতে জড় জগতে আগমন নির্গমন করেন । সেই লীলাতে অভিভূত হও, যোগী হইবে, সুন্দর দৃশ্য দেখিবে ।

এই বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, যোগ, ভক্তির যোগ না হওয়াতে ইহা অপূর্ণ । ইহাতে যাহা পাওয়া উচিত ছিল লোকে তাহা পায় না, যাহা পায় তাহা যথেষ্ট নহে । মানবাত্মাও অপূর্ণ, বিজ্ঞান অপূর্ণ, কাব্য সাহিত্য অপূর্ণ, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম অপূর্ণ । বাহ্য প্রকৃতি না বুঝিয়া লোকে নিজ প্রকৃতি বুঝিল না ।

আপনার স্বভাবের গভীর তত্ত্ব না পাইয়া লোকে বাহ্য স্বভাবের তত্ত্ব পাইল না। একের পূর্ণতাতে উভয়ের পূর্ণতা হয়। একের শূন্যতাতে উভয়ে শূন্য। অতএব প্রত্যেক জন প্রকৃতিপরায়ণপুরুষের কর্ত্তব্য যে জড়ে চিন্ময়কে অন্বেষণ করেন, এবং আত্মা মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতিকে দর্শন করেন। যাহা বাহিরের দৃশ্য তাহার অভিপ্রায় আত্মার ভাবকে উদ্দীপন করা, বাহিরের উৎকৃষ্ট সামগ্রী হৃদয়ের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে বিকশিত করিয়া দেয়। যদি সূর্য্য দেখিয়া তোমার আত্মা মহা জ্যোতির্ম্ময়ের রাজ্যে প্রবেশ না করিল, যদি শতদল পদ্ম তোমার হৃদয়ে সোণার শতদল রচনা না করিল, যদি চন্দ্র দেখিয়া তোমার অন্তরে চিন্ময় রশ্মি প্রকাশিত না হইল, যদি যাহা কিছু বাহিরে দেখিলে তাহার অনুরূপ পদার্থ আত্মার মধ্যে না পাইলে, তবে এই বাহ্যিক দৃশ্য বাহিরে পড়িয়া রহিল, অন্তরের ঐশ্বর্য্য লাভ হইল না। তুমি আর সেই সৌন্দর্য্যের কোন সমাচার পাইলে না, তোমার চক্ষু লাভ করা বিফল হইল।

বেশ্যারাও মল্লিকাফুল তুলিয়া নিজ কবরীতে ধারণ করে, শিথিল চরিত্র ধনীরাও সুন্দর উদ্যানে নদীতীরে সন্ধ্যার সময়ে ভ্রমণ ও বায়ুসেবন করে, তাহাদের সঙ্গে তোমার ভিন্নতা কিসে? তাহাদের ভাবুকতা ও তোমার

ভাবুকতা কি এক ? তাহারা ইন্দ্রিয় সুখস্পৃহায় চালিত, তুমি ব্রহ্ম সহবাসের আকাঙ্খী। তাহাদের ভোগে শরীরের ভোগ, তোমার যুক্ত আত্মায় যোগ। অতএব এ সমুদয় বাহ্য দৃশ্য সম্ভোগ করাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নহে। বাহ্যদৃশ্যকে অন্তরের স্বর্গরাজ্যে পরিণত কর। পূজার আয়োজন কর, সাধনার আরম্ভ কর, জড়জগৎ হইতে চৈতন্যধামে প্রত্যাগমন কর। আবার শোন, কেবল আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রকৃত প্রেমিক ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়া সমস্ত জগতে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রেম পাইয়া যে প্রেম না করে, প্রেমে অনুরুদ্ধ হইয়া যে সেবা না করে, শ্রম না করে, সে কি প্রেমিক ? — সে কপট। শান্ত যোগী, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত সাধক জগতের দুঃখ অগ্নি নিভাইতে ব্যাকুল। ইহাই আধ্যাত্ম প্রকৃতির প্রণালী— ইহাই অনতিক্রমণীয় ধর্ম্ম।

যেমন চন্দ্রমা রাত্রি ভিন্ন দিবসে প্রকাশ পায় না, প্রকাশিত হইয়া নিশাচ্ছন্ন আর সকল বস্তুকে আলোকিত করে, তেমনি মহা ভাবপূর্ণ বিশ্বাসীর হৃদয় ভিন্ন আর কুত্রাপি সেই মহাদেবের মহৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হয় না এবং সেই মহাভাব প্রাপ্ত সিদ্ধ ব্যক্তির প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, পবিত্রতা নিজের সাধনলব্ধ পুরস্কার কেবল তাঁহার নিজ

হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে না; কিন্তু নরনারীর দিকে ছুটিয়া যায়। যদি শাক্যমুনি সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই উরুবিল্বের বনে আশ্রম রচনা করিয়া বসিয়া থাকিতেন, বারাণসী, বৈশালি, রাজগৃহ, অযোধ্যা, কপিলাবস্তু, এবং অন্যান্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া মহা বৈরাগ্য, মহা শান্তি বিতরণ না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল বৌদ্ধবংশ কোথায় থাকিত? যদি ঈশা সেই হর্ম্মণ পর্ব্বতের শিখরে, কি গালিলীয় উপসাগরের পার্শ্বে কেবল দশজন শিষ্য লইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন, জগতকে স্বর্গরাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে কোন উদ্যোগ ও পরিশ্রম না করিতেন, যদি তাঁহার পরাক্রান্ত শিষ্যগণ দেশে বিদেশে গ্রামে নগরে, রাজপথে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে কে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিত?

বনের ফুল বনে ফুটিয়া নির্জ্জনে শুখাইয়া যায়। সে উৎকৃষ্ট ফুল বটে, কিন্তু কে তাহার সমাচার পায়? সে কোন কার্য্যে লাগে? তদ্দ্বারা কোন দেবতার পূজা হয়? পৃথিবীতে কত সাধু শন্ত আছেন তাহাতে কি লাভ হইল! শন্তজন যদি আপন শান্তিতে পৃথিবীর জ্বালা নিবারণ না করেন, যদি ভক্তের ভক্তি উচ্ছ্বাসে অভক্তের শূন্য হৃদয়কন্দর ভরিয়া না যায়, যদি যোগীর যোগবলে

অযোগীর অন্তঃকরণ ব্রহ্মসত্ত্বায় সংযুক্ত না হয়, তবে যোগ ভক্তি এক জাতীয় স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। তাহা একজনের জন্য, সকলের জন্য নহে। আপামর সাধারণের তাহাতে কোন লাভ ক্ষতি নাই। এবং তদ্দারা সম্যক জগতের কোন ধর্ম্ম বৃদ্ধিও হয় না। কিন্তু কোন্ দেশীয় প্রকৃত মহাত্মাজন এই প্রকার স্বার্থপর প্রণালীতে জীবন যাপন করিয়াছেন ? তাঁহারা পৃথিবীর সেবা চিরকাল করিলেন, এবং তাহাতেই ধন্য হইলেন। ভয়ানক রৌদ্র, শ্রাবণের বর্ষা, মারিভয়ের ভীষণ মূর্ত্তি, দুর্ভিক্ষের দৌরাত্ম্য, রাজপুরুষদিগের উৎপীড়ন, কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। জগতের হিতের জন্য তাঁহাদের কত অশ্রুপাত, কত প্রার্থনা, কত আত্মত্যাগ, কত পরিশ্রম,—শেষে রক্তপাত ও মৃত্যু। কেবল সাংসারিক স্বার্থ নহে, আধ্যাত্মিক স্বার্থও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা কর।

যদি তাঁহারা আপন বক্ষের রক্তে জগতের পথকে সিক্ত না করিতেন, তবে কোথায় থাকিত ধর্ম্ম, কোথায় থাকিত নীতি, কোথায় থাকিত পূজা, নিষ্ঠা ও সাধন ? যদি গলগথার শ্মশানে ঈশ্বরনন্দন ঈশা শূলে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ না করিতেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত যদি জগতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রচার না করিত, তবে সংসারের এই শূলযন্ত্রণা কে বহন করিতে পারিত

অতএব যখন দুঃখীগণ ডাকিতেছে, অবিশ্বাসী মহা অন্ধকারে পড়িয়া তোমার পানে তাকাইতেছে, তোমার দ্বারে বার বার আঘাত করিতেছে, তখন কেন আর নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? পৃথিবীর আকাশের সমস্ত চন্দ্র তারকা তোমাকে পথ দেখাইয়া চলিতেছে, স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি তোমার অন্তরে বসিয়া প্রেম, পুণ্য, শান্তিতে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছেন, কেন বিলম্ব কর? অনন্তের ভাণ্ডার হইতে এত ধন লাভ করিয়াছ একবার ও কি কৃতজ্ঞতা দেখাইবে না? এত আশীর্ব্বাদ পাইলে তুমি কয়জনকে আশীর্ব্বাদ করিলে? এত জ্ঞান পাইলে কয়জনকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলে? এত বিশ্বাসে তুমি আশান্বিত হইলে তুমি তাহাদ্বারা কয়জনকে আশ্বস্ত করিলে; গ্রামে, নগরে, পল্লীতে পল্লীতে তোমার জ্ঞানের আলোক কতদূর ছড়াইলে, তোমার জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে কয়জন যুবক কুব্যবহার ছাড়িয়া নীতি ও ধর্ম্মের অনুশরণ করিল? পৃথিবীর সমুদয় সাধুগণ হইতে আশীর্ব্বাদ লইলে, কিন্তু কাহাকেও একটী ধর্ম্মের প্রদীপ জ্বালিয়া সুপথ দেখাইলে না? তোমাকে ধিক্।

ইহাতে হইবে না। আপন জীবন জগতের জন্য দান করিতে হইবে। আপনার ধর্ম্ম, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞানের পূর্ণপাত্র হস্তে লইয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে। আপনার অর্জ্জিত সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত নিঃস্বার্থ মনে লোকের

জন্য সর্ব্বত্র স্থাপন কর। নীতি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর। যদি ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে এত রত্ন লইয়া থাক তাহার সদ্ব্যবহার কর। লোকের সর্ব্বোচ্চতম উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হও।

এখন বুঝিতে পারিয়াছ উত্তম দৃশ্য কি ? উত্তম দৃশ্য ভোগ করে কে ? উত্তম দৃশ্য ভোগের প্রণালী কি ? এবং ইহা ভোগের প্রমাণ কি ?

অতএব বলি প্রকৃতিকে অমান্য করিও না। উহা দেখ বলিয়া তোমার এত আনন্দ হয়। তুমি প্রকৃতির সন্তান হইয়া উহা ভোগ করিবার অধিকারী। এইজন্য আপনাকে সৌভাগ্যশালী জানিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া সহজ ও সরল হইয়া ধর্ম্মের উন্নতিলাভ কর। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদিগকে যোগানন্দের পথে আকর্ষণ করুন, তোমাদের চক্ষুকে মোহমুক্ত করুন।

স্বর্গরাজ্য কাহাকে বলে ?

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮১৬ শক; ২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

স্বর্গরাজ্য কাহাকে বলে আমি তাহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিব।

এই যে যমের মুখের উপর ঘন আবরণ, ইহা কেহ সরাইতে পারে না। মৃত্যু কি, তাহার পর কি হয়, ইহা কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে না। মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকার কেহ সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে পারে না কিন্তু এই আবরণ এতদূর সূক্ষ্ম যে উহার ওদিকে কি আছে তাহা কতক বুঝা যায়। প্রথমতঃ ইহা এই বুঝা যায় যে এই পৃথিবীর শ্রান্তি, সন্তাপ, এই অনবরত বিবাদ কলহ, এই হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিঘাত, এই নানা দুর্ভাগ্য পরীক্ষা, এই আত্মার শান্তি হরণ করিবার জন্য মহড়ম্বর ইহা পরিহার করা যায় না। সংসারের দ্বারা পেষিত না হইলে পরলোকের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যে পরিমাণে ইহলোক অসহ্য সেই পরিমাণে পরলোক স্পৃহনীয় হয়, এবং সেই পরিমাণে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। যে দিনে

কি রাত্রে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে যে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করে সে উপরের সমাচার প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ এই সংসারের ভিতরেও স্বর্গরাজ্যের কথা আসিতেছে। এই উৎসবের পূর্ব্বাহ্ণে, এই শুভদিনে, বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সম্মিলন কালে, স্বর্গরাজ্যের কথা মনে আসিতেছে। স্বর্গরাজ্য কাহাকে বলে? কিসে স্বর্গরাজ্য হয়? যেমন এই পাঁচটী ফুল একত্র সম্বন্ধ হইয়া সুন্দর ফুলের তোড়া হইয়াছে, যেমন পাঁচটী গাছ একত্র হইয়া একটী উদ্যান হয়, যেমন পাঁচটী মানুষ একত্র হইয়া একটী পরিবার রচিত ও রক্ষিত হয়, এবং আনন্দ সুখ-শান্তিতে কাল যাপন করে; তেমনি স্বর্গরাজ্য দশ জনের মিলনে হইয়া থাকে, যখন দশজনের হৃদয় মিলিয়া একাকার হয়, এবং সেই আকারের মধ্যে পরমাত্মার আকার দৃষ্ট হয়, তখনই আমরা স্বর্গরাজ্যের আভাস প্রাপ্ত হই।

এই মিলন সম্পূর্ণরূপে অমিলনকে দূরীভূত করে; ইহাতে একজনের জ্ঞানে দশজন প্রদীপ্ত হয়, এক জনের সুচরিত্রে দশজনের চরিত্রদোষ সারিয়া যায়, একজন শত জনকে এক জন করিয়া তুলে, এক অলক্ষিত তাড়িৎ প্রবাহে অনেক আত্মা মিলিত হইয়া অভিন্ন হয়, পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিলিয়া জলাশয় হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা

মিলিয়া অগ্নিক্ষেত্র হয়, কে না জানে ? এইরূপ দশজনে মিলিয়া ভগবানের পূজা সেবাদি করিলে, পস্পরের মধ্যে এক দিব্যপ্রভাবের উৎপত্তি হয়, তাহারই উপর স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি।

কতকগুলি লোক মিলিয়া দল বান্ধিলেই স্বর্গরাজ্য হইল না। সম্প্রদায় হইলেই স্বর্গরাজ্য হইল না। সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়া অনেক নরকের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক লোক একত্র হইয়া চীৎকার করিলে, একদল একত্র হইয়া অপর দলের উচ্ছেদ চেষ্টা করিলে, এক সমাজের যত্নে অপর সমাজের অখ্যাতি রটিলে, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ বাড়িল ; উহা স্বর্গরাজ্য নহে—নরক রাজ্য—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সংস্থাপনা। ইহা পরিহার করিবে। ঈশা দ্বাদশটী শিষ্য লইয়া এক প্রকাণ্ড স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথমতঃ সেই দ্বাদশটী লোকের ভিতর বিরোধ ছিল, এত বিরোধ ছিল যে, কি করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশা স্বকার্য্যসাধন করিতেন ভাবিয়া স্থির করা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিজের গুণে শিষ্যেরা পরস্পরের গুণ স্বীকার করিল, একতা স্থাপন করিল, ও পৃথিবীকে জয় করিল। তবে আমাদিগের নিরাশ হইবার কারণ কি ? যদি আজ এই গৃহ, এই বারেণ্ডা, এই উদ্যানপর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইত, তবে সুখের বিষয় হইত : কিন্তু যে কয়েকজন

আমরা মিলিয়াছি যদি আমরা একাত্ম হই, তাহা হইলে কি কিছু অসম্ভব থাকে ? যদি অল্প সংখ্যক হৃদয় দৈবশক্তিতে মিশিয়া যায়, উৎসাহে উৎসাহ, আহ্লাদে আহ্লাদ, ধর্ম্মনিষ্ঠাতে ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িয়া যায়, তবে কি না হয় ? হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সংঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহাতে দ্যুলোক, ভূলোক চমকিয়া উঠে। বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষের সংঘর্ষণে যেমন দাবানল উৎপন্ন হইয়া তাবৎ অরণ্যকে, তাবৎ দেশকে দগ্ধ করে, তেমনি মানবসমাজেও হইয়া থাকে।

সেদিন আমেরিকাতে কি অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। হয়ত একস্থানে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িয়াছিল, ঘটনাক্রমে তাহাতে একবিন্দু অগ্নির সংযোগ হইয়া গেল ; হয়ত একটী শুষ্ক বৃক্ষের সঙ্গে আর একটী বৃক্ষের সংঘর্ষণে এককণা আগুণ জন্মিয়া অরণ্য, নগর, দেশ সমুদয় জ্বলিয়া উঠিল, এবং সংসারে যাহা কোন কালে ঘটে নাই তাহাই সংঘটিত হইয়া গেল। ধর্ম্ম ইতিহাসে ও লোকসমাজে এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

এখানে সাম্বৎসরিক উৎসবের আড়ম্বর প্রায় কিছুই নাই। না বাদ্যভাণ্ড, না পতাকার প্রাচুর্য্য, না পুষ্প পত্রের ছড়াছড়ি ; অন্য কিছুই আকর্ষণ নাই। কিন্তু আত্মার ভিতরে আগুণ জ্বলিতেছে ; ভক্তি, বিশ্বাস,

আশা, উল্লাসের তরঙ্গ উঠিতেছে। সমরক্ষেত্রে মত্ত অশ্বের ন্যায় মন নাচিতেছে। এই পঁয়ষট্টি বৎসরের তাবৎ ঘটনা যত ভাবি, ততই ভগবানের এই আশ্চর্য্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মলীলা স্মরণপথে পড়িয়া হৃদয়কে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় বিমুগ্ধ করে, অবাক করে, অন্তর কেবল অন্তর্ম্মুখী হইয়া অবিশ্রান্ত ভক্তি বিশ্বাসে উৎপীড়িত হয় ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে চায়।

প্রিয়গণ, তোমাদের যার যত বয়স সেই পরিমাণে তোমাদের সঙ্গে পরমেশ্বরের লীলা অন্তরে আলোচনা করিয়া দেখ,-দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কিজন্য তোমাদের পক্ষে এই উৎসবে যোগদান করা কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞানময়, শক্তিময়, আত্মার অন্তরঙ্গ প্রভু—এই শরীরে জীবনরূপী দেবতা, আমাদিগকে কিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন! কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কি হইতে যাইতেছি? আমাদের অনেক জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন কে কোথায় পড়িয়া আছেন—কত লোকে সুরাসক্ত, কুকার্য্যে লিপ্ত, অত্যাচারে পীড়িত, আর আমরা এই মাঘ মাসে মহানন্দে সেই স্বর্গরাজ পবিত্র দেবতার সঙ্গে উৎসবে প্রবৃত্ত হইতেছি। অসীম উৎসাহ আনন্দে আজ অন্তঃকরণ ভাসিতেছে।

অমি বলিনা 'শান্তিকুটীর' স্বর্গধাম, এখানে অনেক কার্য্য হয় যাহা সত্য ও শান্তির বিরোধী। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ,

যখন এখানে তোমাদের সমাগম হইয়াছে, তোমাদের ভক্তি অশ্রুতে ইহার মলিনতা ধৌত হইবে। যেমন ফুলে ফুল মিশিয়া ফুলরাশি হয়, পত্রে পত্র মিশিয়া ছায়া ও শোভাকে সৃজন করে, গঙ্গাতে বহুনদী মিশিয়া পদ্মার প্রকাণ্ড স্রোত বহমান হয়, তেমনি আশা হইতেছে, এই দশ পনের জন ভাল করিয়া মিশিতে পারিলে, সকলের ভক্তিরাশি সেই ব্রহ্মধাম আজ সুশোভিত করিবে; পত্ররাশির ন্যায় সেই ব্রহ্ম কল্পতরু-মূলে সঞ্চিত হইতে পারিবে; জলস্রোতের ন্যায় নগরকে শীতল করিয়া সেই ব্রহ্মসাগরে মিশিবে; এবং নববিধানের মধ্য দিয়া স্বর্গরাজ্যের অবতারণা হইবে। ভক্তিতে ভক্তি মিশিলে উহা মহা বন্যায় ন্যায় ছুটিব, এবং আমাদের সকলের আত্মাকে প্লাবিত করিবে। একের চেষ্টা যত্ন সকলের চেষ্টা যত্নের সঙ্গে মিশিয়া মহা কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার খুলিয়া দিবে।

হে মঙ্গলময় পিতা, আজ তোমার স্বর্গদ্বারে পাপীরা আঘাত করিতেছে। স্বর্গরাজ্য কি, কিরূপে তুমি এই রাজ্য রচনা করিয়াছ, আমাদিগকে তুমি তাহা কথঞ্চিৎ দেখাইয়াছ, সকল বন্ধুবান্ধবগণকে তাহা তুমি দেখাও। আমরা কি বলিব যে স্বর্গরাজ্য বিষয়ে তোমার যে অঙ্গীকার তাহা পূর্ণ হয় নাই? কৃপাময় স্বর্গরাজ! কয় বৎসর হইল কলিকাতায় তুমি কি করিয়াছিলে? কতকগুলি হৃদয়

মিলিয়া তোমার জয়ধ্বনিতে এই কলিকাতার আকাশকে পূর্ণ করিয়াছিল। এত অমিল, এমন ছিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মমণ্ডলীকে কি চিকাগোর মহামেলা এক হৃদয় এক প্রাণ করিয়া দেয় নাই? হে পিতা, আমরা এখনও ত মরি নাই। এখনও যে প্রাণে প্রাণ মিশাইলে মহাপ্রাণের সঞ্চার হয়; হৃদয়ে হৃদয়ের প্রতিঘাতে মহাআগুণ জ্বলিয়া উঠে; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। আমাদের মধ্যে তোমার ঐ পবিত্র স্বর্গরাজ্য আনয়ন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইতিহাস

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮১৬ শক; ২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

ইতিহাসকে তুচ্ছ করিও না; ইতিহাসের তুল্য ধর্ম্মের প্রমাণ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মের অনেক প্রমাণ পাই বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে প্রণেতাগণের কল্পনা ও ভাবুকতার এত আতিশয্য যে সর্ব্বত্র তাহাদের সাক্ষ্য সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। বিজ্ঞানে ধর্ম্মের প্রমাণ আছে সত্য; কিন্তু উহাতে বুদ্ধির এত প্রাখর্য্য, যুক্তির এত জটিলতা, বিশ্বাসের এত অল্পতা যে উহা দ্বারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর অন্তরের যথার্থ পিপাসা নিবারণ হইতে পারে না। আরও দেখ বিজ্ঞানের মধ্যে সন্দেহমূলক ও জিজ্ঞাসা-সূচক এত কথা রহিয়াছে যে তাহাতে অনিশ্চয়তা আপনা আপনি সমুপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের মধ্যে নানা মুনির নানা মত; কেহ জড়বাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ অদৃষ্টবাদী, কেহ বা অন্য কোন মতাবলম্বী, কার কথা শুনিয়া চলিব? বিজ্ঞান আস্তিককে নাস্তিক করিতে পারে, এমন কি সময় সময় করিয়াও থাকে।

কিন্তু ইতিহাস ত কাহারও কল্পনা নহে, কাহারও যুক্তি তর্কে রচিত হয় না। যে ঘটনা আপনা আপনি ঘটিয়া থাকে, তাহাই লইয়া ইতিহাস গঠিত হয়।

ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত যথা ধর্ম্ম ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস, এবং প্রতিজন লোকের জীবন বৃত্তান্ত। আমাদের দেশে ধর্ম্ম ইতিহাস, জাতীয়তা, এবং ব্যক্তিগত ঘটনা এমন মিশ্রিত যে তিন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এবং সমস্তই ধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেকটীর পরিস্কার বিভাগ, কি কাল নির্ণয়, কি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। ধর্ম্ম ইতিহাসের নাম এদেশে পুরাণ। মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম ধর্ম্ম বৃত্তান্ত হইলেও ইহা জাতীয় ইহার সন্দেহ নাই। রামের রাজ্যত্যাগ, বনগমন, সিংহলে যুদ্ধ ধর্ম্ম ইতিহাস রূপে গণিত হইলেও ব্যক্তি বিশেষের জীবনী। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের দেশীয় ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্নিবিষ্ট করা দুরূহ ব্যাপার। এইরূপ মিশ্রণ অন্যায় নহে, কারণ আমি মনে করি কি ধর্ম্মবৃত্তান্ত, কি জাতীয় ইতিহাস, কি প্রতিজনের জীবনের ঘটনা তিনেরই ভিতর মঙ্গলময় ঈশ্বরের কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে কিনা ইহাপেক্ষা পরিষ্কার নির্ণয় থাকিলে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত।

তোমরা যখন প্রভাত সূর্য্যের তরুণপ্রভা, কি শুকতারার শুক্লজ্যোতি দর্শন কর, তখন আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার ভিতর ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানের পরম বিভূতি প্রত্যক্ষ কর এবং অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাক। কিন্তু জগতের ইতিহাসে, ঘটনাবৈচিত্রের দিকে একবারও চাহিয়া দেখ না। ঐসকল ঘটনার গর্ভে সেই মহাপ্রভাবশালী ভগবানের কত কীর্ত্তি, কত মহিমা, কত সামর্থ্য, কত অভিপ্রায়, কত গভীর আত্মপ্রকাশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তৎপ্রতি একবারও দৃষ্টিপাত কর না। এই ধারাবাহিক মানবসমাজের গতি, ইহাতে নানা অবস্থার তরঙ্গ, কত অন্তর্মুখী স্রোত—আবর্ত্ত, কত উত্থান পতন, উন্নতি অধঃপতন, কত মহাজয় ও মহাবিনাশ ইহা কি আপনা আপনি হইতেছে? কত জাতি, কত জীবন, কত ধর্ম্ম-বিধান ভাসিয়া যাইতেছে, কতক বা লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতেছে, কতক পঁহুছিতেছেনা, কত তরী বাত্যা তাড়িত হইয়া বিপন্ন হইতেছে, ভগবৎ করুণার অনুকূল বাতাসে আবার স্বস্ব কার্য্য সাধন করিতেছে। এই সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখ, ইহাকেই জগতক্ষেত্রে পরমাত্মার অভিনয় বলা হয়। ইহা লইয়াই পুরাণ শাস্ত্র, ইহা বিধাতার অস্তিত্বের এবং ক্রিয়ার বিশেষ প্রমাণ।

পূর্ব্বতন সময়ে এই প্রণালীতে পরব্রহ্ম কার্য্য

করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়েও এই প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ তাহার সাক্ষী।

তুমি, আমি ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া কোথায় যাইতেছি। যাহা আরম্ভ করিয়াছি, ইহার পরিণাম কোথায়? যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি কি দেখিতেছি, ইহা কি বৃথা? না, এই কারণ হইতে দূরব্যাপী নানা কার্য্য উৎপন্ন হইবে? এতাবৎ বিষয় বিশ্বাসনয়নে দর্শন কর, উজ্জ্বল জ্ঞানে অনুধাবন কর। তুমি আমি আমরা অতীত ঘটনার তাৎপর্য্য খুঁজিয়া অস্থির হইতেছি, কে জানে যে আমাদের দুঃখ, সুখ, সংগ্রাম, পরীক্ষা, জয় পরাজয় কোন দূরস্থিত ভবিষ্যতের ইতিহাসকে রচনা করিতেছে? ছায়াবাজীর পুতুলের ন্যায় আমরা কাহার সংকল্প সিদ্ধ করিতেছি, কোন্ অদৃষ্ট অভিপ্রায় পূর্ণ করিতেছি?

বরং চন্দ্র সূর্য্য দেখিওনা; ইহাদের অনুধাবন জ্যোতির্ব্বিদদিগের দর্শন চিন্তা, দূরবীক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে, আমি তুমি না দেখিলেও চলে। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনা চক্ষে দেখিতেছি, কর্ণে শুনিতেছি, হস্তে স্পর্শ করিতেছি, তাহার ভিতরে ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিয়োগ করিয়া ভগবানের অতুল কীর্ত্তি, ও মহান আত্মপ্রকাশ কেন দর্শন করি না? অতএব জীবনবিদ্যাকে, অন্তর্দর্শনকে, নিগূঢ় ধ্যানকে উজ্জ্বল বিশ্বাস অক্ষরে অঙ্কিত কর; নূতন শাস্ত্র রচিত হইবে।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত বাষ্পময় ছিল, ক্রমে উহা জলময় হইল, তারপর অন্তর্নিহিত অগ্নি-উৎপাতে এখানে ওখানে দুচারিটী দ্বীপ দেখা দিল, দুইদশটী পর্ব্বত ঊর্দ্ধে গাত্রোত্থান করিল, তারপর বসুন্ধরা ক্রমে দৃঢ়কলেবর হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। প্রথমে এই পৃথিবী নানা জাতীয় ভীষণ জন্তুর আবাসভূমি ছিল তাহাদের প্রোথিত কঙ্কাল দেখিলে ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইয়া থাকে। এই সমস্ত শৃঙ্গী নখী বিকট-দন্ত সর্ব্বগ্রাসী আদিম জন্তুরা জলে স্থলে বিচরণ করিত। তখন মনুষ্য ও তাঁহার পিতামহগণ কোথায় ছিলেন ? তখন জন্মিলে কি বাঁচা যাইত ? ক্রমে সেই সকল জন্তু শান্ত হইল, অদৃশ্য হইল, তাহাদের মৃতদেহে পৃথিবীর মৃত্তিকাস্তর উচ্চ হইল এবং উচ্চতর জীবজাতি জন্মগ্রহণ করিল। সর্ব্বশেষে মনুষ্যের অবতারণা হইল। ইহাতে স্রষ্টার কত মহিমা, কত কৌশল, কত কীর্ত্তি !

যেমন জন্তু মরিয়া মানুষ জন্মে, তেমনি নিকৃষ্ট মানব হইতে উৎকৃষ্ট মানব জন্মে ; সৃষ্টি পরিণতির দিকে, এবং পূর্ণতার দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।

ভূতত্ত্বেও ইতিহাস আছে, মানবজীবনেও ইতিহাস আছে, আর জাতীয়বৃত্তান্তে ত আছেই। এই ইতিহাসকে

ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিবে।

বিশ্বস্রষ্টা অনন্তদেবতা এই ধর্ম্মরাজ্য আশ্চর্য্যরূপে গঠন করিলেন, কত ঘটনা ঘটিল যাহা সম্ভব মনে করা হয় নাই, কত পরিবর্ত্তন হইল যাহা প্রত্যাশার বিপরীত, কত সামান্য লোকের অসামান্য কীর্ত্তি, কত অসামান্য ব্যাপার বৃথা হইয়া গেল। কত নূতন বিধান, কত নূতন প্রণালী, কত আঘাত প্রতিঘাত, বিনাশ এবং পুনর্জীবন! আজ যাহা হইল না, কাল তাহা নিশ্চয়ই হইবে। কাল যাহা ছিল আজ তাহা কোথায় রহিল? কেবল সর্ব্বশক্তিমানের অখণ্ড অভিপ্রায় চিরকাল থাকে আর কিছুই থাকে না। এক শতাব্দীর অসমাপ্ত ঘটনা পর শতাব্দীতে আবার অভিনীত হইতেছে; একজনের কি এক বংশের অসমাপ্ত কীর্ত্তি আর এক বংশ সফল করিতেছে। যাহা থাকুক, যাহা চলিয়া যাউক, নিশ্চয় একথা বিশ্বাসযোগ্য যে সাধুচেষ্টা, সত্যপ্রচার, আত্মত্যাগ ও ব্রহ্মকৃপা কখনও নিরর্থক হয় না।

যোগী ঋষিগণের ধ্যান ধারণা, ঈশার প্রেম ও আত্মত্যাগ, মোহম্মদের বিশ্বাস ও উদ্যম, বৈষ্ণবদিগের ভক্তি ও জীবে দয়া, এসমস্ত কি চলিয়া গিয়াছে? না, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে কিন্তু চলিয়া যায় নাই। তাহাদের অদৃশ্য ও পরিবর্ত্তিত কলেবরের মধ্যে বাহ্যিক সামঞ্জস্য দেখা

কঠিন হইলেও আভ্যন্তরিক মিলন আছে? বিগত ধর্ম্মের ইতিহাস মধ্যে ভূতকালে এমন অবস্থা পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে, যাহা ফিরিয়া আসিলে আমাদিগের পক্ষে জীবনধারণ তেমনি অসম্ভব হইয়া উঠে। সেইজন্য যেমন অপর বিষয়ে তেমনি ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিময় বাষ্পমধ্যে ও কুম্ভীরময় জলমধ্যে বাস করা অসম্ভব, তেমনি নানা উপধর্ম্ম ঘটিত মারিভয় ক্রমে অতিক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম-জগতকে বাসোপযোগী ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতেছে। নিকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জন্মিতেছে, সকল ধর্ম্ম সমন্বিত হইয়া এক দিব্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম রচিত হইতেছে।

বন্ধুগণ, বল দেখি তোমরা কি মনে করিতেছ না যে বর্ত্তমান কালে জীবন ধারণ করিয়া অতিশয় সৌভাগ্যশালী হইয়াছ? দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের যাহা কিছু বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কদাপি অবিশ্বাসী থাকা যায় না।

পঁয়ষট্টি বৎসর হইল এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কয়েকজন শিথিল প্রকৃতি জমীদারের দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছিল, কয়েকটী ব্রাহ্মণ মিলিয়া ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতেন, কে জানিত যে ইহার উন্নতি নানা সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়া এত উচ্চস্থান অধিকার করিবে?

কে জানিত যে রাজা রামমোহন রায় এই সামান্য বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকাতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন?

ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কোথায় ছিলেন? ভাবোচ্ছ্বাস ও জ্ঞানালোক পূর্ণ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া যে তিনি আমাদের আত্মাতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, :বহু শ্রম স্বীকার করিয়া যে "ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস" স্থাপন করিলেন; ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী স্থিরীকৃত করিলেন, গৃহধর্ম্মানুষ্ঠানের আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আদি সমাজের আদিতে তিনি কোথায় ছিলেন?

প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি, অতুল প্রতিভাসম্পন্ন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তুমি কোথায় ছিলে? নববিধানের মহাসমন্বয় বীজ বক্ষে নিহিত করিয়া কোন স্থানে লুক্কাইত ছিলে? তোমার গৌরব এখনও অনেকে বোঝে নাই। তোমার আসার সঙ্গে শত শত বিশ্বাসী প্রাণের বীণা এখনও একত্রে বাজে নাই। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বাজিবে।

পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ১১ই মাঘে বঙ্গদেশের অদৃঢ় ভূমি মধ্যে নূতন ধর্ম্মবিধানের মূল নিখাত হইয়াছিল আজ তাহার এত পরাক্রম? ভূমির গুণে নয়, কেবল মূলের গুণে ইহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে কত আচার্য্য,

কত সাধক, কত শত উপাসক, কত যুবক, কত বৃদ্ধ, কত বালিকা, কত বর্ষিয়সী, কত পরিবার ও মণ্ডলী শিক্ষা ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে ; এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মনীতিতে নিষ্ঠা, পরলোকে প্রত্যয় লাভ করিয়াছে। লোকের জীবন ভাল হইয়াছে। মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ভবিষ্যতের আশা খুলিয়া গিয়াছে।

ইহা কি তোমার কার্য্য, না আমার কার্য্য ? ইহা রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্য, না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য ? না ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কার্য্য ? কাহারও নহে। ইহা সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার কার্য্য। সত্য বটে আমাদের নেতাগণ আমাদিগকে চিরঋণে বদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে যুগধর্ম্ম প্রণেতার লেখনী অনুভব করিতে পারিতেছি। তিনি আমাদের জীবন সংগ্রহ করিয়া আমাদের ধর্ম্মকে আকার দিলেন, আমাদের ধর্ম্ম লইয়া মণ্ডলীতে স্থাপন করিলেন, আমাদের মণ্ডলী হইতে আমাদের দেশীয় ইতিহাসের নূতন পথ আবিস্কৃত করিলেন। কেবল যদি রামমোহনের প্রশংসা কর, কেবল যদি দেবেন্দ্রনাথের দেবচরিত্র পাঠ কর, কেবল যদি দিন রাত কেশব কেশব করিয়া চিৎকার কর, যাহা

কর্ত্তব্য তাহা সমাধান হইল না। ইহার ভিতর অনেক অত্মার বিমিশ্রণ আছে, অনেক লোকের চেষ্টা আছে, অনেক জীবনের ইতিহাস আছে। ইহার ভিতর ভগবানের জাতিব্যাপী, যুগব্যাপী, জগদ্ব্যাপী কার্য্য-কৌশল নিরীক্ষণ কর। তাঁহার আত্মপ্রকাশ দর্শন কর।

একদিন আমাদের প্রতিজনের জীবনের ইতিহাস, ব্রাহ্মসমাজের ও নূতন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইবে। এতদ্দ্বারা সমুদয় জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন হইবে, সমুদয় সম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাব জন্মিবে, চতুর্বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হইবে, ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে একতা হইবে, সমস্ত ভারতবাসীগণ একজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই পঁয়ষট্টি বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কত নূতন চরিত্র গঠন করিয়াছে, কত নূতন সাহিত্য ও কাব্য প্রচার করিয়াছে, কত প্রকার নূতন সামাজিক সংস্কার পরিচালিত করিয়াছে, কত দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কত পরাক্রান্ত জাতির নিকট নিজের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করিয়াছে, কত উচ্চতম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব মিলিত হইয়া ধর্ম্মের ও ভ্রাতৃমণ্ডলীর উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশার সুসমাচার, মুশার ধর্ম্মবিধি, মোহম্মদের একেশ্বরবাদ, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ বৈরাগ্য, বৈষ্ণবের মহদ্‌ভক্তি, প্রাচীন

যোগী ঋষির বেদোপনিষৎ দর্শনাদির মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে দেখ তোমার আমার সকলের জীবন এই ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে। ব্যক্তিগত জীবনের কতশত বৃত্তান্ত না ইহার ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যখন লোকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতি উষ্ণীষধারী, আতর-গোলাব-সিঞ্চিত, কাবাল-বেদা পরিধায়ী আয়তদেহীদিগকে দেখিতে পাইত, তখনত আর আশা করে নাই যে ইঁহাদের হস্ত হইতে এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিধানের অবতারণা হইবে; ইঁহাদের প্রভাবে এত নগর-সংকীর্ত্তন, এত বক্তৃতা, এত শাস্ত্রীয় তত্ত্ব, এত মানব তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। বৈষ্ণবভাবে, বৈষ্ণব-সুরে এখন এমন ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত ও গীত হইতেছে যে ভক্ত বৈষ্ণব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছেন। খৃষ্টজীবন সম্পর্কে, খৃষ্টশিক্ষা বিষয়ে, খৃষ্টের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ বিষয়ে এমন সমস্ত গভীর ব্যাখ্যা হইতেছে যে তাহা শুনিয়া ভাল ভাল জ্ঞানী খৃষ্টান আহ্লাদে উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বলিতেছেন এই ব্রাহ্মেরা খৃষ্টের সারতত্ত্ব বুঝিয়াছেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাহা দেখিবে, তাহাই অদ্ভুত। যদি এই ব্যাপার নূতনতত্ত্ব, নূতন বিধান, নূতন ইতিহাস না হয়, তবে আমি জানি

না "নূতন" শব্দের অর্থ কি ?

এই নূতন তত্ত্বে আমাদের নিজ নিজ জীবন, আমাদের পরিবার গঠন, আমাদের মণ্ডলী ও দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত নিহিত রহিয়াছে। এই নববিধানসমাজ যদি স্থাপিত না হইত, তবে সকলে আজ কোথায়. থাকিতে ? নববিধান নামে বিরক্ত হইলে কি হইবে, ইহার অস্তিত্ব ও মর্ম্মকে প্রত্যেক সরল ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে।

যেমন জলে লবণ সংযোগ করিলে লবণের চিহ্নমাত্র থাকে না, কেবল জলই অবশিষ্ট থাকে ; তেমনি আমরা সকলে এই ব্রাহ্মসমাজে এমন ভাবে মিশিয়াছি যে আমাদের বিভিন্ন জীবনের চিহ্ন ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল এই ব্রাহ্মসমাজেরই বিস্তীর্ণ আয়তন নয়নগোচর হয়। কিন্তু স্বীয় জীবনকে এই মণ্ডলীগত জীবনের মধ্যে খুঁজিয়া পাই আর না পাই —যত না পাই ততই ভাল—, আমরা প্রতিজন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে লীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেবল রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি, কেবল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ, কেবল আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতিভা মিশিয়া রহিয়াছে এমন মনে করিও না। ইহার উপাদানে শত শত সরল ধর্ম্মপিপাসু লোকের অশ্রু জল, শত শত যুবার উৎসাহ ও সত্যপ্রিয়তা

অনেক বৃদ্ধের বহুদর্শন ও পরিপক্ক বিবেচনা, অনেক বৈরাগী আত্মত্যাগীর কঠোর সাধনা, অনেক ব্রহ্মবাদিনী নারীর নিষ্ঠা, ভক্তি, পরসেবা, অনেক গায়কের মধুর কণ্ঠধ্বনি, অনেক উত্তেজিত হৃদয়ের আত্মভেদী প্রার্থনা, অনেক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রাণগত যত্ন, চেষ্টা, অনেক বিদেশীয়দিগের জীবনপ্রদ সহানুভূতি একীভূত হইয়াছে। এত প্রকার উপাদানে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত। সঙ্গীত পুস্তক খুলিয়া দেখ পত্রে পত্রে ইহার সাক্ষ্য আছে। উপাসনার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখ উহা এইরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচনা কর, উহা এইরূপে চলিয়া আসিতেছে। পবিত্র চক্ষুতে দেখিলে এখনও ইতিহাসে ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডে জীবনদাতা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মহালীলা প্রমাণিত হয়। মানুষের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাসে ইতিহাসে বিভেদ থাকে না।

যে ধর্ম্মের এমন আশু উন্নতি হইল, যাহাতে মানুষের এমন আশ্চর্য্য বিকাশ হইল, আশার অতীত নানা ঘটনা হইল, ইহার অবতারণা ও অগ্রসরগতিতে পরমেশ্বরের মহা বিধান, যুগযুগান্তব্যাপী মহা অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ কর। আরও অগ্রসর হও, আরও উৎসাহিত হও, আরও উপাসনা কর, আরও ত্যাগ স্বীকার কর, পরস্পরের সঙ্গে আরও

কর্ত্তব্য তাহা সমাধান হইল না। ইহার ভিতর অনেক অত্মার বিমিশ্রণ আছে, অনেক লোকের চেষ্টা আছে, অনেক জীবনের ইতিহাস আছে। ইহার ভিতর ভগবানের জাতিব্যাপী, যুগব্যাপী, জগদ্ব্যাপী কার্য্য-কৌশল নিরীক্ষণ কর! তাঁহার আত্মপ্রকাশ দর্শন কর।

একদিন আমাদের প্রতিজনের জীবনের ইতিহাস, ব্রাহ্মসমাজের ও নূতন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইবে! এতদ্দ্বারা সমুদয় জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন হইবে, সমুদয় সম্প্রদায় মধ্যে সদ্ভাব জন্মিবে, চতুর্বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হইবে, ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে একতা হইবে, সমস্ত ভারতবাসীগণ একজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই পঁয়ষট্টি বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কত নূতন চরিত্র গঠন করিয়াছে, কত নূতন সাহিত্য ও কাব্য প্রচার করিয়াছে, কত প্রকার নূতন সামাজিক সংস্কার পরিচালিত করিয়াছে, কত দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কত পরাক্রান্ত জাতির নিকট নিজের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করিয়াছে, কত উচ্চতম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব মিলিত হইয়া ধর্ম্মের ও ভ্রাতৃমণ্ডলীর উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশার সুসমাচার, মুশার ধর্ম্মবিধি, মোহম্মদের একেশ্বরবাদ, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ বৈরাগ্য, বৈষ্ণবের মহদ্‌ভক্তি, প্রাচীন

যোগী ঋষির বেদোপনিষৎ দর্শনাদির মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে ।

ব্যক্তিগতভাবে দেখ তোমার আমার সকলের জীবন এই ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে। ব্যক্তিগত জীবনের কতশত বৃত্তান্ত না ইহার ইতিহাস মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে । যখন লোকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতি উষ্ণীষধারী, আতর-গোলাব-সিঞ্চিত, কাবাল-বেদা পরিধায়ী আয়তদেহীদিগকে দেখিতে পাইত, তখনত আর আশা করে নাই যে ইঁহাদের হস্ত হইতে এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিধানের অবতারণা হইবে ; ইঁহাদের প্রভাবে এত নগর-সংকীর্ত্তন, এত বক্তৃতা, এত শাস্ত্রীয় তত্ত্ব, এত মানব তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। বৈষ্ণবভাবে, বৈষ্ণব-স্বরে এখন এমন ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত ও গীত হইতেছে যে ভক্ত বৈষ্ণব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছেন। খৃষ্টজীবন সম্পর্কে, খৃষ্টশিক্ষা বিষয়ে, খৃষ্টের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ বিষয়ে এমন সমস্ত গভীর ব্যাখ্যা হইতেছে যে তাহা শুনিয়া ভাল ভাল জ্ঞানী খৃষ্টান আহ্লাদে উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বলিতেছেন এই ব্রাহ্মেরা খৃষ্টের সারতত্ত্ব বুঝিয়াছেন । এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে যাহা দেখিবে, তাহাই অদ্ভুত । যদি এই ব্যাপার নূতনতত্ত্ব, নূতন বিধান, নূতন ইতিহাস না হয়, তবে আমি জানি

না "নূতন" শব্দের অর্থ কি ?

এই নূতন তত্ত্বে আমাদের নিজ নিজ জীবন, আমাদের পরিবার গঠন, আমাদের মণ্ডলী ও দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত নিহিত রহিয়াছে। এই নববিধানসমাজ যদি স্থাপিত না হইত, তবে সকলে আজ কোথায়. থাকিতে ? নববিধান নামে বিরক্ত হইলে কি হইবে, ইহার অস্তিত্ব ও মর্ম্মকে প্রত্যেক সরল ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিতে হইতেছে।

যেমন জলে লবণ সংযোগ করিলে লবণের চিহ্নমাত্র থাকে না, কেবল জলই অবশিষ্ট থাকে ; তেমনি আমরা সকলে এই ব্রাহ্মসমাজে এমন ভাবে মিশিয়াছি যে আমাদের বিভিন্ন জীবনের চিহ্ন ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল এই ব্রাহ্মসমাজেরই বিস্তীর্ণ আয়তন নয়নগোচর হয়। কিন্তু স্বীয় জীবনকে এই মণ্ডলীগত জীবনের মধ্যে খুঁজিয়া পাই আর না পাই —যত না পাই ততই ভাল—, আমরা প্রতিজন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে লীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেবল রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি, কেবল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ, কেবল আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতিভা মিশিয়া রহিয়াছে এমন মনে করিও না। ইহার উপাদানে শত শত সরল ধর্ম্মপিপাসু লোকের অশ্রু জল, শত শত যুবার উৎসাহ ও সত্যপ্রিয়তা

অনেক বৃদ্ধের বহুদর্শন ও পরিপক্ক বিবেচনা, অনেক বৈরাগী আত্মত্যাগীর কঠোর সাধনা, অনেক ব্রহ্মবাদিনী নারীর নিষ্ঠা, ভক্তি, পরসেবা, অনেক গায়কের মধুর কণ্ঠধ্বনি, অনেক উত্তেজিত হৃদয়ের আত্মভেদী প্রার্থনা, অনেক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রাণগত যত্ন, চেষ্টা, অনেক বিদেশীয়দিগের জীবনপ্রদ সহানুভুতি একীভূত হইয়াছে। এত প্রকার উপাদানে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত। সঙ্গীত পুস্তক খুলিয়া দেখ পত্রে পত্রে ইহার সাক্ষ্য আছে। উপাসনার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখ উহা এইরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচনা কর, উহা এইরূপে চলিয়া আসিতেছে। পবিত্র চক্ষুতে দেখিলে এখনও ইতিহাসে ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডে জীবনদাতা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মহালীলা প্রমাণিত হয়। মানুষের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাসে ইতিহাসে বিভেদ থাকে না।

যে ধর্ম্মের এমন আশু উন্নতি হইল, যাহাতে মানুষের এমন আশ্চর্য্য বিকাশ হইল, আশার অতীত নানা ঘটনা হইল, ইহার অবতারণা ও অগ্রসরগতিতে পরমেশ্বরের মহা বিধান, যুগযুগান্তব্যাপী মহা অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ কর। আরও অগ্রসর হও, আরও উৎসাহিত হও, আরও উপাসনা কর, আরও ত্যাগ স্বীকার কর, পরস্পরের সঙ্গে আরও

মিলিত হও; এই ব্রাহ্মসমাজ বিধাতার মহাকীর্ত্তি, ইহা তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রণালীর পরাকাষ্ঠা। এখনও আত্মসম্প্রদানের জন্য শত শত যুবক তাঁহার বেদীর সম্মুখীন হইতেছে; কে জানে যে বিধাতার এই প্রণালী মধ্যে তাহাদের জীবন-বৃত্তান্তে আরও কত কত নূতন ঘটনা না ঘটিবে, আরও নূতন অতি সুন্দর ইতিহাস না লিখিত হইবে? তবে কোন্ সরলচিত্ত ব্রাহ্মকে তুচ্ছ করিব, কোন্ সম্প্রদায় ও কোন্ বিভাগের প্রতি অবজ্ঞা করিব? অতএব বলি ঘটনাকে তুচ্ছ করিওনা, ঘটনার সূক্ষ্ম শৃঙ্খলে আত্মপ্রকাশক ঈশ্বরের কৌশল দর্শন কর। ঘটনাতে ব্রহ্ম-প্রমাণ দেখ, বিধান দেখ, ইতিহাস দেখ, আরও পবিত্র উৎসাহের সহিত, নিজ নিজ জীবনের এবং মণ্ডলীর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হও। ইহা নিশ্চয় জানিও তোমার, আমার এবং সকলের জীবনের একত্র সমাবেশ ভিন্ন ইতিহাস আর কিছুই নহে। কে মনে করিয়াছিল এই উত্তপ্ত বাষ্পময় জড়পিণ্ড হইতে এমন সুদৃশ্য শস্যশালিনী পৃথিবী হইবে? সেই তপ্ত আগুনের বক্ষ হইতে সুন্দর দ্রাক্ষালতার জন্ম হইবে, তণ্ডুল গোধুমের জন্ম হইবে, এত উদ্যান প্রান্তরের জন্ম হইবে? অতএব আর কেন নিরাশ হইব? এখন কি ধরাতল দুইজন লোকের দৌরাত্মে রসাতলে যাইবে? এখন কি এই ব্রাহ্মসমাজ দুইজন লোকের অত্যাচারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কখনই না।

হে লীলা কীর্ত্তিময় ভগবান, এইত আমাদের ইতিহাস। এই সমস্ত তোমার মনে ছিল, কে জানে তোমার মনে আরও কত আছে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ কে বলিবে? এই ছিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীকে বিচিত্ররূপে গ্রথিত করিয়া কি আশ্চর্য্য প্রণালীতে নিজ লীলা প্রকটন করিবে, আমরা কিরূপে জানিব?

আমাদিগকে অশেষ আশা, বিশ্বাস দাও। তোমার হস্তের পবিত্র লেখনী যেন সমস্ত ঘটনার ভিতর দেখিতে পাই। আত্মার খনিমধ্যে মহামূল্য রত্ন নিহিত করিয়াছ, আজ আমরা হতভাগা বলিয়া উহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। তোমার সমস্ত ঘটনার পত্রে পত্রে তোমার মহিমার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিতেছি না; যদি সমস্ত কলিকাতা, সমস্ত ভারত, সমস্ত পৃথিবী তোমার এই নবধর্ম্মবিধান স্বীকার করিয়া জয়ধ্বনি করিত তবে কত আনন্দ করিতাম ও কৃতার্থ হইতাম। যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার এই মহোৎসব করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাও হইল না আমরা একাকী — অল্পসংখ্যক। তথাপি কি হে জ্যোতির্ম্ময় বিধাতা, তোমার মহাকীর্ত্তি স্বীকার করিব না? হে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর! আজ সকলে মিলিয়া আনন্দের আশার সহিত তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

উপাসনা

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

উদ্বোধন

যদি তাঁহার আরাধনা না করিলাম, তবে তপস্যায় লাভ কি? যদি তাঁহার আরাধনা না হইল, যদি অন্তরে বাহিরে হরিরূপ দর্শন না করিলাম তবে তপস্যায় প্রয়োজন কি? ব্রহ্মদর্শন ও আরাধনাই তপস্যার সার। এস প্রিয়গণ, আত্মার বিবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণে ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্ম আরাধনা করি। দেবগণ বৈকুণ্ঠ হইতে আমাদের পূজায় যোগ দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদের পিতৃপুরুষগণও প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা উৎসাহিত হইব বলিয়া স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় পরম দেবতা উপস্থিত হইয়া অশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যোগী সিদ্ধ যতি-গণকে নমস্কার করি, পরলোকবাসী আচার্য্য এবং সাধুগণকে স্মরণ করি, ইহলোকবাসী এদলে কি অন্য দলে যত ভক্তগণ বাস করিতেছেন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আত্মাতে মিলিত হই। একাগ্রচিত্তে সকলে মিলিত হইয়া পবিত্র

পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই ।

আরাধনা

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

হে সারাৎসার পরম সত্য, তুমি মূলে কিরূপ সত্য আমরা বলিতে পারি না । কিন্তু এই দেহ মন আত্মা তোমার সত্য আশ্রয়ে বাস করিয়া তোমার স্থিতি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । সমুদয় সৃষ্টি, সমুদয় জীব তোমার সত্য নাকি প্রকাশ করিতেছে । এই জড়ীয় পৃথিবীর ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া আত্মা তোমার সত্তা আত্মা ও স্বরূপের জ্যোতি দর্শন করিতেছে । স্ফটিক যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্রের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া আপনার স্বচ্ছ আকাব প্রকাশ করে, যেমন অগ্নি-কুণ্ডে ভস্মের মধ্য অগ্নিরাশি আপনার লোহিত প্রভা প্রদর্শন করে, তেমনি তাবৎ অসার বস্তুর মধ্যে দিয়া হে মহাসত্য, মহাশক্তি, পরম-পুরুষ, তুমি আত্মপ্রকাশ করিতেছ । আমরা জড়ীয় মায়ায় বিমুগ্ধ, অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, তাই সর্ব্বত্র তোমাকে দেখিতে পাই না । কিন্তু সময়ে সময়ে আমাদের বিশ্বাস-নেত্র খুলিয়া যায়, তোমার নির্ব্বিকার ধ্রুবসত্য

প্রকাশ পায়, এবং আমরাও বলি তুমি সার, তুমি সত্য, তুমি জীবন্ত জাগ্রত যথার্থ ।

এই ভবান্ধকারে হে জ্ঞানময়, তোমারই প্রত্যাদেশ কেবল তোমাকে চিনিবার উপায় । জ্ঞানের আলোকে তাবৎ বিশ্বসংসার কে প্রদীপ্ত করিলে, মানুষের অন্তরে এমন এক আলো জ্বালিয়া দিলে যদ্দ্বারা আমাদের আত্মদর্শন, ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিবেক সমুদয় প্রস্ফুটিত হইল, আমরা চৈতন্য নয়নে হে চিন্ময় তোমাকে দেখিতে পাইলাম ।

অনেক মায়া ও অবিদ্যা চারিদিকে ; কিন্তু তাহাদের কি সাধ্য আজ তোমার জ্ঞানমূর্ত্তিকে ঢাকিয়া রাখে? তোমার প্রকাণ্ড বিধি ও সূক্ষ্ম বিধি দেহ মনে, বাহিরে ভিতরে তোমার পরিচয় দিতেছে । শরীরের রোমে রোমে জ্ঞানের অগ্নিকণা চমকিতেছে । হৃদয়বেদীতে মহা আচার্য্য তুমি আসীন । আমাকে আমার নিকট তুমি বুঝাইয়া দিতেছ । সকল বিষয়ের স্বতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছ । তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতেছ । তোমাকে সর্ব্বময় ও সকলের অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া আপনাদের সমস্ত ত্রুটী অপরাধ তোমার সাক্ষাতে স্বীকার করি । তোমার তীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্র সমস্ত প্রকার কপটতাকে কাটিয়া ফেলিল, আমরা তোমার নিকট পরিচিত হইয়া

পড়িলাম। মা জ্যোতির্ম্ময়ী, মহাবিদ্যা! তুমি সম্মুখস্থ, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী, স্বপ্রকাশ।

তোমার সঙ্গে নয়নের মিলন হয় বলিয়া কি এই চক্ষু তোমার সীমা নির্ণয় করিতে পারে? সংসারের সমস্ত বস্তুতে তুমি পূর্ণ, ঘট যেমন জলে, আকাশ যেমন বায়ুতে তেমনি তোমাতে সমস্ত জগৎ পূর্ণ, তথাপি পৃথিবীর ধারণাশক্তি কখনও তোমার ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই আমাদের চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ সকলকে অতিক্রম করিয়া তুমি আরও সুদূর। সপ্ত-সাগরকে তুমি গণ্ডুষ করিলে, সকল সূর্য্য তারকা, বিদ্যুৎকে অস্তমিত করিয়া কোন অজানিত আলোকের মধ্যে তুমি অন্তর্দ্ধান হইলে, কোন অন্ধকারের মধ্যে আত্মসংগোপন করিলে; যুগ যুগান্ত তোমাকে খুঁজিতেছে, সমুদয় ঋষি মুনিবংশ তোমার সন্ধানে আত্মব্যয় করিতেছেন, প্রথম শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল লোক তোমার আরাধনা করিতেছে, তোমাকে না পাইয়া সমাধিস্থ যোগীগণ শেষে তোমাতে বিলীন হইলেন। তবে আর আমরা কি বলিব? আমরা নীরব হই। শেষ এই কথা রহিল — তুমি অগম্য, অপার, অনাদি, অনন্ত, মহান।

কিন্তু আরাধনার শব্দ নিরস্ত হইলেও হৃদয়তো নিরস্ত

হয় না। অনন্তের আয়তন দেখিয়া পার্থিব তর্ক সমাপ্ত হইল, তোমার মহিমার ভারে পেষিত হইয়া জ্ঞান ধ্যান ব্যর্থ হইয়া গেল, যাহারা প্রখর বুদ্ধি তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যাহারা দীন অভাগা, আর্ত্ত তাহারা কোথায় যাইবে ? তাহারা তোমার দ্বারে আঘাত করিতেছে। তাহারা তোমার করুণার দোহাই দিতেছে। জ্ঞানী ধ্যানী আপনাদের চিন্তায় নিরত; অসহায় যাহারা তাহারা তোমার সহায় পাইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন শাস্ত্র কি আছে, এমন দেশ কোথায় আছে, যে তোমার প্রেমের কথা না বলে ? উত্তপ্ত বালুকাতে নগ্ন শরীরে বসিয়া বন্দী কাফ্রি আকাশের পানে তাকাইয়া তোমাকে না জানিয়াও তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছে। নিদারুণ শীতে পশুচর্ম্ম পরিধান করিয়া এস্কিমো বরফক্ষেত্রে রক্ষা পাইবার জন্য হে দয়াময় তোমাকে ডাকিতেছে। সকল অসভ্য বর্ব্বর জাতি বিপদের সময় তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছে। জ্ঞানী সভ্যেরা উৎকৃষ্ট আসনে, উৎকৃষ্ট বসনে; উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় মর্ম্মর নির্ম্মিত মন্দিরে পিতা পিতা বলিয়া, তোমাকে আরাধনা করিতেছে। আর যাহাদের মন্দির নাই, ঘর নাই, মণ্ডলী নাই,— আকাশ যাহাদের মন্দির, প্রান্তর আসন, সর্ব্বজন যাহাদের মণ্ডলী,

তাহারাও হে দয়াময়, নিজ নিজ জীবনে তোমার অপার প্রেম অনুভব করিয়া তোমার প্রশংসা করিতেছে। তোমার ক্ষেত্রে কত শস্য, তোমার বনে কত ফুল তোমার নদীতে কত জল, তোমার পৃথিবীতে কত ঐশ্বর্য্য! তোমার হস্তগঠিত জনসমাজে কত ভালবাসা, কত আদর, যত্ন, বন্ধুত্ব। শিশুর জন্য মাতৃবক্ষে স্নেহ, রোগীর জন্য কত চিকিৎসা, বিপন্নের জন্য কত উপায়; আমাদের অন্তর বাহিরে তোমার প্রেমের এই সমস্ত আশীর্ব্বাদ। দিবানিশি তোমার ভালবাসার গুণ-কীর্ত্তন করিলেও ফুরায় না; তোমার স্বভাব সর্ব্বমঙ্গলময়। তুমি দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কল্যানময়, মাতা, পিতা।

এত স্নেহ ও দয়া কি জন্য? কেবল পরিত্রাণ জন্য; সমস্ত দেশের ধর্ম্ম-যাত্রীগণ মিলিত হইল, পুণ্য নিকেতনের দ্বার খুলিয়া গেল, পরিত্রানের সুসংবাদ নরনারীর ব্যাকুল হৃদয়ে আশা দিল, মুক্তির জন্য পাপাহত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়াছে, সর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। হে পুণ্যময়, সকলে তোমার ঐ নিষ্কলঙ্ক চরণে স্থান চায়। পুণ্যের জন্য বারানসী, শ্রীক্ষেত্র, মক্কাতে তোমার অনুসন্ধান করিয়াও পায় না। কে জানে কি প্রগাঢ় তৃষ্ণাতে

সকল ধর্ম্মার্থী লোকে আকুল ? ধর্ম্ম ভিন্ন ভূমণ্ডলের শোভা নাই, স্থায়িত্ব নাই, রক্ষা নাই, সেই ধর্ম্ম তুমি ; অতএব আমরা তোমার আরাধনা করি, তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করি, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার পূজা করি। হে পুণ্যময়, তুমি যদি এখানে অবতীর্ণ হও, তোমার নিষ্কলঙ্ক জ্যোতিতে সকল লোকের ভিতর বাহির উজ্জ্বল হইবে। হে শুদ্ধতম, হে অপাপবিদ্ধ তুমি কি এই সভায় পদার্পণ করিবে, এবং আমাদের সমস্ত পাপ ধৌত করিবে ? হে পুণ্যময়, তুমি আসিয়াছ অতএব আমরাও অন্যান্য পাপী বংশের ন্যায় উদ্ধার হইতেছি। মুক্তিদাতা তুমি আমাদের পাপ তাপ হরণ করিতেছ। তোমার তেজঃপুঞ্জ সহবাসে প্রবিষ্ট হই, তোমার পরম স্বর্গীয় স্বভাবের আস্বাদন গ্রহণ করি।

জয় সচ্চিদানন্দ শান্তিদাতা, তোমার পরম সুন্দর সিংহাসনে তোমাকে আসীন দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাহিরের ফুল শুষ্ক হয়, জলও শুকাইয়া যায়, কিন্তু এই পঁয়ষট্টি বৎসরে ত আমাদের হৃদয় শুষ্ক হইল না, নিত্য সরস রহিল, যুবারা-বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধেরা অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু যুবাবৃদ্ধ তোমাতে নিত্যযুবা, নিত্যশিশু, নিতসুখী ; তোমার দর্শন ভিন্ন সুখের পিপাসা আর কিছুতেই মিটে না।

আমরা কখন বিষন্ন, কখন প্রসন্ন, আমরা সুখী কি দুঃখী জানিনা ; কেবল এই জানি যে সমস্ত বিষাদ তোমাতে মিটিয়া যায়, সকল দারিদ্র্য দূর হয়। এই জীবনের অপমানের মধ্যে তুমি গৌরবের মুকুট ; এই বনবাসের মধ্যে তুমি আনন্দের পুষ্প কানন। আনন্দের আর্দ্র কণ্ঠ তোমার মধুর মহিমা গান করে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত অন্তর তোমার সুন্দর মুখচ্ছবি দর্শন করে। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

তোমার তুল্য কে আছে ? এই সপ্ত স্বরূপে কি তোমার অখণ্ড সত্বা বর্ণিত হইল ? এই কয়েকটি স্তবে কি তোমার প্রসংশা শেষ হইল ? এই সমস্ত বিশ্বে যত প্রকার রূপ, রস, বর্ণ আছে সমুদয় তোমার আত্ম-প্রকাশ, যত ধর্ম্মে যত প্রকার দেব দেবীর কল্পনা আছে সমুদয় তোমারি ছায়া, যত প্রকার যোগ, তপস্যা, সাধন আছে, সমুদয় তোমারই অন্বেষণ, যত জাতীয় ভক্ত উপাসক আছেন সকলে তোমারই সন্তান, তাবৎ ধর্ম্মবিধান তোমার আদিষ্ট ও প্রচারিত, সমুদয় ধর্ম্ম-মন্দিরে তোমারই অধিষ্ঠান। তোমার দক্ষিণ বাহুতে সমুদয় পুরুষত্ব ও শক্তি, তোমাকে দেখিলে আর কোন দেবতা ও মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় না। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলে মিলিয়া বলিতেছে জয়

একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি স্তবনীয়, বন্দনীয়, তোমার শরণাগত হই। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ধ্যান

"যদি এখনই ভূবন হয় মধুময়" তবে আর কথায় প্রয়োজন কি ? যদি জলের মৎস্য জল পাইল, যদি পক্ষীশাবক পক্ষী মাতার কোমল বক্ষঃ পাইল, যদি মক্ষিকা মধুময় শতদল পাইল, তবে আর অপেক্ষা কেন ? হে প্রাণ তুমি পরমাত্মারূপ শতদলে প্রবেশ কর, আর কথা নাই। ভক্ত মীন অগাধ পরমাত্মা-সাগরে ডুবিয়া যাও। আর্ত্ত জীব পরমাত্মার বক্ষে প্রচ্ছন্ন হও, আর অধিক বাক্যব্যয় করিওনা, সকল কথা স্থির হউক, সকল আরাধনা নিস্তব্ধ হউক, ধ্যান আরম্ভ হউক। সকলে ইষ্টদেবতার চিন্তনে মগ্ন হই।

উপদেশ

যাইবার সময় ঈশ্বর তনয় ঈশা বলিয়া গেলেন, "খেদ করিও না, মর্ম্মাহত হইও না; আমার পিতার আবাসে অনেক ভবন আছে: আমি তোমাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করিতে চলিলাম। এখন চলিলাম

আবার আসিব এবং আসিয়া তোমাদিগকে লইয়া যাইব। যেখানে আমি বাস করি সেখানে তোমরাও বাস করিতে পাইবে।”

এই যে নানা ভবনময় স্বরূপ পিতৃগৃহ তোমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এখানে থাকিতে থাকিতে যদি সেই স্বর্গের দেবপ্রাসাদ না দেখ, মরণের পরে যে দেখিবে তাহার প্রমাণ কি? পৃথিবী দিব্যধামের পূর্ব্বাভাস ও প্রতিচ্ছবি: সেই দিব্যধামে কেন অবিশ্বাস করিবে? ইহাইত তোমার ও আমার বাসভূমি।

ঈশার অঙ্গীকৃত সেই বাসভূমির সৌন্দর্য্য এখান হইতে দেখা যায়, এবং তাহার সমাচার শুনা যায়।

যদি বল তাহার প্রমান কি? কিরূপে ইহা জানিলে? আমার উত্তর এই যে, সেই ভবনে কথঞ্চিৎ পরিমাণে বাস করিয়াছি। সেখানকার আনন্দ সমাচার শুনিয়াছি। এই উৎসবের সময় আমি সেই পবিত্র পুরীতে বাস করিতেছি। যাহা কল্পনার ছবি, যাহা ভাবের প্রতিমা তাহার বর্ণনা করিয়া আমি তোমাদের মনস্তুষ্টি করিতে চাহি না। চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, কল্পনা যাহা ভাবে নাই এমন ঐশ্বর্য্য, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে ও ভাল-বাসে, তাহাদের জন্য ভগবান স্বর্গধামে সঞ্চিত করিয়াছেন,

আজ তদ্বিষয় আলোচনা করিব।

মহাত্মাগণ উপদেশ দিয়াছেন শরীর দেবমন্দির, জীবন দেবতার আবির্ভাব। উহা লাভ করিয়াছি বলিয়া কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকি। এই উপদেশ পালন কর। শরীর নিরাকার আত্মার আধার মাত্র, দেহের কণায় কণায় সেই পরম দেবতা সংযুক্ত রহিয়াছেন! অনেকে ইহা বুঝে না। তুমি আমি অনেক সময় ইহা বুঝি না কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা নহে।

শরীর অনেক সময় নরকধাম হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব ইহা দেহধাম নহে? নরক ও স্বর্গ উভয়ই সন্নিকট ও পার্শ্ববর্ত্তী।

ইতিহাস বলিতেছে এমন লোক ছিলেন যাঁহারা দিনে কি নিশীথে অবিচ্ছেদে আপনাদিগের দেহ মন মধ্যে পরম দেবতাকে দর্শন করিতেন এবং প্রতিদিন পুণ্য ভূমিতে পদ বিক্ষেপ করিয়া সেই অমর ধামে চলিয়া যাইতেন।

ইঁহারা শ্রান্তদিগের আশ্রয়, ইঁহারা পাপীদিগের আশা, ইঁহারা জ্ঞান ধর্ম্ম, ভক্তি, যোগের আদর্শ। এই যে সমুদয় মহাজন যাঁহারা ধর্ম্মস্থাপন করিলেন। এইসকল যোগী, সিদ্ধ মানব চুড়ামণিগণ কে? ইঁহারা প্রত্যেকে আমাদের পিতার নির্ম্মিত এক একটী

গৃহ। ইঁহারাই সেই অঙ্গীকৃত স্বর্গরাজ্যের এক একটি আবাসতীর্থ।

স্বধাম বলিলে এই বুঝায় যেখানে ভয় নাই, আরাম আছে, যেখানে আমার জন্য সকল আয়োজন, সকল ব্যবস্থা, যেখানে আমার জন্য প্রেম, সহানুভূতি, আদর সমস্ত। সধুগণের সংসর্গে তেমনি অভয় পাই, আরাম পাই, আশ্রয় পাই, প্রেম পাই, সহানুভূতি আদর লাভ করি। অতএব তাঁহারা আমাদের আলয়। এই অসংখ্য অগণ্য ভবনময় পিতার গৃহে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ, কোন ভয় ভাবনা তাঁহাদের নাই। এখানে নিত্য আরাম নিত্য শান্তি। এই পিতার গৃহ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ডামিয়েন অনায়াসে কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে নিয়ত প্রফুল্লভাবে বাস করিয়া অকাতরে তাহাদের সেবা করিলেন, এবং তজ্জন্য আপনার পবিত্র দেহকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্রাহ্মের জন্য এই ঈশার অঙ্গীকৃত স্বর্গরাজ্য আশার পথ দেখাইতেছে। ইহাতে দীনাত্মা শোকার্ত্ত, ভগ্নহৃদয়েরা আনন্দে অগ্রসর হইতেছে। ঈশার অঙ্গীকৃত স্বর্গের গৃহ সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, "দীনাত্মারা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদের জন্য, শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।"

স্বধাম, আপনার গৃহ এবং আপনার গৃহবাস সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। আপনার ভগ্ন কুটীরে শাকান্ন ভোজন করিয়া তুমি যেমন প্রীতি পাইবে, অন্যের সুন্দর প্রাসাদে অমৃত পান করিয়াও তোমার তেমন তৃপ্তি হইবে না। তোমার নিকটে স্বর্গধাম এই প্রকার প্রিয়তম হউক।

আবার দেখ পৃথিবীর এই গৃহ, যেখানে চোরে চুরি করিতে পারে, কালের আঘাতে যাহা নিয়ত ভগ্ন হইতেছে, সেই গৃহবাস যদি এত প্রিয়তম হয়, তবে যে গৃহ দেবতাদের নির্ম্মিত, যাহাতে কোন প্রকার ভয় ভাবনা নাই, কখন যাহা ভগ্ন হইবে না, অনন্ত কাল যাহাতে শান্তি সুখ ভোগ করিবে, সেই গৃহ তোমার কত শতগুণে প্রিয়তম হওয়া উচিত।

আরও দেখ পৃথিবীর সুন্দর ধর্ম্ম মন্দির, শত যত্ন করিলেও রক্ষা করা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে, জাপানে, চীনে, তাতারে, কত পাহাড় কাটিয়া কত সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইল, আজ তাহার অনেক বিচূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু শাক্যের সেই নির্ব্বাণ বৈরাগ্য শান্তি আর ভগ্ন হইল না। রোমের পরম সুন্দর ধর্ম্মমন্দির সমস্ত তাইবর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু ঈশার প্রেমগৃহ খৃষ্ট জগতের পরম

শান্তিনিকেতন হইয়া রহিয়াছে। কোটী কোটী খৃষ্টান আজ খেদ না করিয়া আশার সহিত মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।

বৌদ্ধের জন্য নির্ব্বাণ, বৈষ্ণবের জন্য মহাভাব, খৃষ্টানের জন্য পিতার স্বর্গরাজ্য বর্ত্তমান। বিধানবাদী তোমার গৃহ কৈ ?

অনেক ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ পিতার রাজ্যে বৌদ্ধগণের জন্য একটি, খৃষ্টানের জন্য একটি, বৈষ্ণবগণের জন্য একটি, মুসলমানের জন্যও একটি মন্দির : কিন্তু বিধানবাদী, দেখ তোমার পিতার বিস্তীর্ণ দেশে তোমার জন্য বড় বড় ছোট ছোট কত শত মন্দির। জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার পরব্রহ্ম সমস্ত গৃহের পূর্ণ আলোক হইয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া আহ্বান করিতেছেন। কোন ঘরের দ্বার তোমার জন্য অবরুদ্ধ নহে। এই ঘর তোমার নহে বলিয়া কেহ তোমাকে তাড়াইবে না; ধন্য ঈশ্বর, জয় ঈশ্বরের। সাধুদিগের চরিত্রের উপাদানে বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। চরিত্রে ধর্ম্মজীবনের উচ্চ চূড়া, চরিত্রে ধর্ম্ম প্রভাবের পূর্ণ আলোক, চরিত্রে সমস্ত সাধুর সুন্দর কুটীর। এক একটি সাধুজীবন দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে ইহার চরিত্র-পরতন্ত্র হইয়া পড়ি। চক্ষুর অগোচর সমস্ত দেব গ্রামের সমস্ত মনোহারিত্ব এই

চরিত্র মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া কত সুন্দর গৃহ চারিদিকে অবলোকন করিতেছি। কতজন পরলোকের সুন্দর গৃহ হইয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। কত জীবিত জন আপন চরিত্র গৃহ লইয়া সকল গৃহশূন্যদের আশ্রয় ভূমি হইয়াছেন।

উপাসনায় কি লাভ? উৎসবে কি প্রয়োজন? যদি তোমার আমার ভ্রান্ত আত্মা সেই দেশের জন্য ব্যাকুল না হয়? যেখানে অগ্রজগণ প্রবেশ করিয়াছেন, সেই স্থান দর্শন কর, সেই পথের সম্বল লও, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লও। কাজ, কর্ম্ম, মতামত, দলাদলি, উত্তেজনা, পাপ পুণ্যের সংগ্রাম, আঘাত, প্রতিঘাত, ছাড়িয়া পিতার গৃহে প্রবেশ কর।

যাহারা স্বর্গবাসী হইবে, পিতার ঐ পবিত্র ভবনে বাস করিবে, তাহাদের তুইটি গুণ চাই। একটি সহ্যগুণ, অপরটি কার্য্যগুণ। এই তুই সেতুর উপর দিয়া বিস্তীর্ণ ভব সাগর পার হইতে হইবে। সহ্যগুণ কি? রোগ, বার্দ্ধক্য, উৎপীড়ন, বিপদ, পাপযন্ত্রনা, পরীক্ষা সমস্ত ঈশ্বর প্রেরিত জানিয়া অবনত মস্তকে তাহা বহন করিতে হইবে। ঈশার কথা মনে কর, কত উৎপীড়ন সহ্য করিলেন; সমস্ত দেশের স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কত লাঞ্ছনা করিল। কি

অপরাধে সেই কোমল মস্তকে কণ্টক বিদ্ধ ? কি দোষে সেই প্রশান্ত বক্ষে কঠিন ক্রুশের প্রহার ? ইহাত জানিতে আর বাকি নাই। ইহার কাছে তোমার আমার দারিদ্র্য দুঃখ কিছুই নহে। সামান্য তৃণভার বহন করিতে আমরা অধীর হই। আর সেই বিনম্র মেষ-শাবক অকাতরে সমস্ত ভব ভার বহন করিয়া পিতার মহিমাকে উজ্জ্বল করিলেন। হে অধীর মন, সহ্যকর, উৎপীড়নে অধীর হইও না। পৃথিবীর প্রদত্ত বিষ পান করিয়াও অকাতরে ঈশ্বরের পুত্রগণ পৃথিবীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঈশ্বর নিজে ভারবাহী, তাঁহার প্রেরিতগণও সেই প্রণালীতে শিক্ষিত। শাক্যের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির এক হাত লম্ববান হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। অপর হস্ত ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়া সমস্ত দুঃখ, সন্তাপ, মৃত্যু, যাতনা, বার্দ্ধক্য, রোগ হইতে শান্তি দিবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে।

আবার দেখ সহ্যগুণের সঙ্গে কার্য্যগুণ, ধৈর্য্যের সঙ্গে চেষ্টা, শান্তির সঙ্গে উদ্যম, ক্ষমার সঙ্গে ন্যায়ানুসন্ধান, স্থিরতার সঙ্গে উৎসাহ মিলিত না হইলে ধর্ম্মচরিত্র গঠিত হয় না। যাঁহারা অমর ধামের অবিনশ্বর গৃহ স্বরূপ হইলেন। তাঁহাদের জীবনে কার্য্যগুণ অতি প্রধান গুণ ছিল।

শাক্য নিরঞ্জনা নদীতীরে যখন গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া স্থির অচলের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, তখন বালকেরা তাঁহার পৃষ্ঠে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া উপহাস করিত, তাঁহার সেই ধ্যান সমাধি হইতে যদি অবিশ্রান্ত কার্য্য সমুত্থিত না হইত তাহা হইলে এই বৌদ্ধকীর্ত্তি কোথায় থাকিত ? কার্য্যগুণে কি না হয় ? কার্য্যগুণের প্রভাবে কয়লা হইতে মধু জন্মে, মৃত্তিকা হইতে সুস্বাদু দ্রাক্ষা জন্মে। কার্য্যগুণে ধর্ম্মের উপকারিতা, জীবনের কীর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলাচরণ, ভাবীবংশের জন্য আদর্শ স্থাপন।

সেই নিশীথে হরমন পর্ব্বতের শিখরে শিষ্যবৃন্দ সহ দণ্ডায়মান ঈশার সমস্ত শরীর হইতে যখন রজত-কান্তি বাহির হইতে লাগিল, এবং পরলোকগতগণ যখন তাঁহার পার্শ্বে অবতীর্ণ হইলেন, তখন শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিলেন, এই সুন্দর স্থান আর পরিত্যাগ করিব না। এই পুণ্যভূমিতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করা যাউক। কিন্তু কার্য্যগুণের জ্বলন্ত হুতাশন ঈশা কি তাহাতে সন্মত হইলেন ? যদি তিনি এই প্রলোভনে পড়িয়া সদনুষ্ঠানে বিরত হইতেন, তবে কার্য্য-কুশল খৃষ্টজগতের আজ কি দশা হইত ? পতিতাদিগকে কে উদ্ধার করিত ? পাপব্যাধি পীড়িতদিগকে কে

আরোগ্য করিত ? পিতৃহীনদিগের কে সহায় হইত ? সহ্যগুণে ও কার্য্যগুণে কে জগতের দৃষ্টান্ত হইত ? অতএব অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং অশেষ কার্য্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লও।

বন্ধুগণ, চল সেই শান্তিধামে প্রবেশ করি,—যেখানে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির কার্য্য, প্রেমের সঙ্গে সেবার ব্রত, চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতায় অবনত মস্তক, শান্তবক্ষঃ হইতে কার্য্যের প্রবাহ নির্গত হইয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ-স্রোত-সংযোগে অনন্তের দিকে ধাবিত। উত্থান কর, জাগ্রত হও, মায়া-নিদ্রা পরিহার কর, চল অমৃত ধামে প্রবেশ করিয়া সার মনুষ্যত্ব গ্রহণ করি।

প্রার্থনা

পিতঃ, তোমার গৃহে অনেক সন্তান, তোমার ক্রোড়ে সহস্র সহস্র আলয়, তোমার হস্তে সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্তের জন্য অন্ন, এবং তৃষ্ণার্ত্তের জল রহিয়াছে। তোমার ঘরে আসিয়াছি। আমাদিগকে পৃথিবী হইতে ভাল করিয়া টানিয়া লও। আমরা বিদেশকে স্বদেশ ভাবিতেছি। হাট বাজারের ঝুট জরিকে অক্ষয় মুকুট ভাবিয়া

আদর করিতেছি। মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অজানিত ভবপ্রান্তরে বেড়াইতেছি। আমরা আশাধারী হইয়া কত মণ্ডলীতে, কত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তোমার এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এই আকাশের সীমা হইতে সীমান্ত ভ্রমণ করিলে কি হইবে, যদি তোমার গৃহ দেখিতে না পাই, এবং আমার স্ব-ধাম অমৃত নিকেতন দেখিতে না পাই, চিনিতে না পারি? যোগীর পরা ভক্তি, জ্ঞানী জনের অভ্রান্ত জ্ঞান, ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত জনেয় সহ্যগুণ ও কর্ম্ম কুশলতা, কে আমাদিগকে দিবে?

তোমার মনোনীত গৃহ দেখাও, কোথায় আমাদিগকে স্থান দিবে দেখিতে দাও। যুগধর্ম্ম নিকেতনে তোমার সন্তানগণকে কত জ্ঞানের অন্ন, কত প্রেমেরজল বিতরণ করিতেছ, আমরা কি বাহির হইতে কান্দিয়া ফিরিয়া যাইব? হে পিতা কাতর প্রাণে এই ভিক্ষা করি আমাদিগকে বিদেশের প্রলোভন হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার অমর নিকেতনে লইয়া যাও। আমরা আশা পূর্ণ প্রাণে, ভক্তির সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বলিদান

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

(অপরাহ্ণ)

আমাদের এ ধর্ম্মেও কি বলিদানের ব্যবস্থা আছে? ব্রাহ্মধর্ম্মে নরবলির কথা কি উঠিতে পারে? আমাদের ব্রহ্ম-পূজাতে কি রক্তপাতের বিধান হইয়াছে? বলিদান কাহাকে বলে? ছাগ-কণ্ঠ ছিন্ন করা, মেষাদিকে বিনাশ করা, অশ্ব-মেদ, গো-মেদ, ইহাই কি বলিদান? ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া হস্তকে শোষণ করা, গ্রীষ্মের ভয়ানক রৌদ্রে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া থাকা যদি বলিদান, কি তপস্যা হয় তবে যে সে লোক সহজেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারে ; ইহা অপেক্ষা যদি উচ্চতর, বিশুদ্ধতর কোন বলিদানের ব্যবস্থা থাকে তাহা জানিতে চাই।

আমার বিচারে যাহারা নিজ হস্তকে শঙ্কুচিত করিয়া সমুদয় সুখ দুঃখ সেই পরম নিয়ন্তা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতার হাতে সমর্পণ করে, যাহারা নিজের প্রাণ রক্ষার ভার পর্য্যন্ত নিজ হস্তে রাখে না ; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ

করিবার জন্য সপ্রতিজ্ঞ হয়, তাহারা বলিদানের ফল প্রাপ্ত হয়। আত্ম-মহিমা স্থাপনের জন্য কিম্বা স্বেচ্ছা-সাধন করিবার জন্য কি লোকের প্রশংসা অপহরণ করিবার জন্য শরীর নষ্ট করিলে বলিদানের ফল হয় না। বাহ্যিক আড়ম্বরে, ত্যাগ সংযমে, দান তপস্যার আড়ম্বরে যথার্থ আত্মশুদ্ধি হয় না। "তুমি যদি বলিদানের প্রয়াস করিতে আমি তাহা দিতাম; কিন্তু ভগ্ন-হৃদয়-রূপ যে বলিদান ঈশ্বর তাহাই আকাজ্ক্ষা করেন"

বলিদানের উপযুক্ত বস্তু এই শরীর বটে; কিন্তু শরীরে যে দুষ্প্রবৃত্তি আছে তাহাই বলিদান করিতে হইবে। আর যদি জিজ্ঞাসা কর জীবন রক্ষণীয় কি নহে? তাহার উত্তর এই ঈশ্বরের মহিমার জন্য, জগতের হিতের জন্য আত্ম বিনাশ বিহিত কার্য্য। যে শরীর রক্ষার্থ শরীর পালন করে জগতের হিতের জন্য নহে, দীর্ঘজীবি থাকাই যার জীবনের উদ্দেশ্য, সে ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কেবল ধন সঞ্চয় করিবার জন্য ধন উপার্জ্জন করে। কিন্তু যেমন ব্যয় করাই সঞ্চয় করার উদ্দেষ্য, তেমন জীবন দান করাই জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর সেবায় শরীর পতনে, যত্নের জীবন ব্যায় করিয়া মঙ্গলময়ের মহাপ্রসাদ স্বরূপ সুফল লাভ করিয়া আত্মা দিব্য ভাগবতী তনু

ধরিয়া অবিনাশী পরমাত্মার পূর্ণজ্যোতিসম্পন্ন স্বর্গলাভ করেন। ইহাতে রক্তমাংসের কোন সংশ্রব নাই।

পৃথিবী ক্রমাগত বলিদান চাহিতেছে এবং অবিশ্রান্ত তাহা গ্রহণ করিতেছে। তণ্ডুল গোধূম মাটিতে পড়িয়া না বিনষ্ট হইলে নূতন শস্য তাহা হইতে জন্মে না, এমন জীব আছে যাহারা না মরিলে তাহাদের সন্তান প্রসূত হয় না। একের ক্ষতিতে অন্যের লাভ হয়, একের কষ্টে অন্যের সুখ হয়, উৎকর্ষ সাধনের এই নিত্য বিধি। আমার জন্য কৃষক যদি গ্রীষ্ম বর্ষা বহন না করে, শ্রম দারিদ্র্য সম্বরণ না করে তাহা হইলে আমার অন্নসংস্থান হয় না। আমার জন্য যদি বিচারকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা, শিক্ষক, চিকিৎসক বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন না করেন, তাহা হইলে কি জনসমাজে তিষ্ঠিতে পারি? কবিগণের রচনা আমার জন্য, জ্ঞানীদিগের গবেষণা আমার জন্য, চন্দ্র সূর্য্যের আলোক আমার জন্য, বৈরাগীর আত্মত্যাগ, প্রেমিকের আত্মবঞ্চনা, দাতার ধনহানি, সমস্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার জন্য। সন্তানের জন্য পিতার অকাতর চেষ্টা, শ্রম, শিশুর জন্য মাতার রাত্রি জাগরণ, পাপিষ্ঠের জন্য ধর্ম্মাত্মার আত্মনিপীড়ন, রোগীর জন্য সুচিকিৎসকের স্বাস্থ্য নষ্ট, স্বজাতির জন্য দেশানুরাগীর প্রাণ দান, এ

সমস্ত বলিদান ভিন্ন আর কি ? ভগবান এই সকল সুকীর্ত্তি সদ্ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া অকীর্ত্তিমান মানুষ তাহার অনুশরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোমার জন্য এত মহাত্মা এত ক্ষতি সহিলেন, তুমি কি পরের জন্য কোন স্বার্থ ত্যাগ করিবে না। যদি ধর্ম্ম চাও মাটী হইতে হইবে। মৃত্তিকা যেমন আপনার ভিতর সমস্ত অসার বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহার বিনিময়ে নিজ উৎকৃষ্ট রসে ও শক্তিতে তৃণ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, শস্য, উৎপাদন করে, তেমনি সহস্র দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া অনেক অসারতা বহন করিয়া আপনার সহ্যগুণে ও কার্য্যগুণে যে পৃথিবীকে ধনশালিনী ও কীর্ত্তিশালিনী করে তাহারই জীবন ধন্য। দারিদ্র্যের সন্তাপে, রোগীর রোগে, শোকার্ত্তের হৃদয়ভেদে, পাপীর অনুতাপে সহানুভূতি সহায়তা, স্বদেশের জন্য পরিশ্রম না করিলে তোমার যোগ্য ক্রিয়া হইল না। যাঁহারা সমস্ত লাভ ক্ষতিতে জলাঞ্জলি দিয়া অপরের জন্য শীতে, গ্রীষ্মে, নিজ ব্রত পালন করিলেন, নিজ জীবনকে ক্ষয় করিলেন, তাঁহাদের আত্মবলিদান ঈশ্বর আপন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা জগতের মহাকার্য্যে যৌবনে অকাল বার্দ্ধক্য লাভ করিলেন, বার্দ্ধক্যে নির্বান্ধব হইলেন, ধনাঢ্য হইয়া গভীর দারিদ্র্য বহন করিলেন, সুস্থ শরীরকে রুগ্ন

করিলেন, বন্ধুবান্ধবদ্বারা তিরস্কৃত ও তাড়িত হইলেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত আত্মবলিদান গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের তপস্যা সার্থক, ত্যাগস্বীকার ফলপ্রদ।

সংসার, সম্পদ, সন্তান, ধন, মান লইয়া চিরদিন কাহারও স্থায়ী হয় না। এই সমস্ত ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক একদিন ছাড়িতেই হইবে। তবে যোগ্য উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাহা ত্যাগ করিতে কাতর কেন হও? যদি ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে চাও মোহপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, অত্যাগী হইয়া, নিজ অভিসন্ধি সাধনের জন্য অন্যের প্রাণান্ত করিয়া কি প্রকারে সেখানে যাইবে? যদি যাইতেই পার তবে সেই প্রেম-ধাম, সেই বৈরাগ্যধাম তোমার ভাল লাগিবে কেন? ঈশ্বর যাহাকে মারেন তাহাকে রাখে কে? তিনি যাহাকে রাখেন তাহাকে মারে কে? তিনি যাহার সর্ব্বনাশ করেন তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে কেহ পারে না। তিনি যদি ঐহিক ক্ষতি করিয়া পারত্রিক মঙ্গল বিধান করেন তাহা ক্ষতি নহে, পরম লাভ। শরীর বিনাশ করিয়া তিনি যদি আত্মার অবিনাশী শক্তি বিধান করেন তাহাতে ক্ষতি কি? সংসারে মানবের সকল সৌভাগ্য বিনষ্ট হয় বটে, জগতের সম্মুখে সে বলিদান যায় বটে, কিন্তু তাহার স্বর্গের সম্বন্ধ দিন

দিন দৃঢ় হইয়া উঠে। সে নিত্যধামে পরম সৌভাগ্য উপার্জ্জন করে। ভগবানের দ্বারে বলিদানের এইরূপ প্রথা। ক্ষতিতেই লাভ, দানেই সঞ্চয়, অপমানেই গৌরব, মৃত্যুতেই অমৃত। অতএব হে অলস মন, হে অর্দ্ধবিশ্বাসী হৃদয়, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে মহাবলিদানে প্রস্তুত হও। মহাশক্তি জগদম্বা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। তোমার পরিশ্রমকে দ্বিগুণ করিবার জন্য, তোমার দেহ মনের সকল শক্তিকে তাঁর নিজ কার্য্যে উৎসর্গ করিবার জন্য, তোমার মরণশীল জীবনের বিনিময়ে অক্ষয় জীবন দিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। বন্ধুগণ এইজন্য অগ্রসর হও। কি জানি কখন কি হইবে? আজ এই উৎসব করিয়া উৎসাহ শেষ হইল না, অদ্যকার আনন্দে সকল আনন্দ ফুরাইল না, অদ্যকার কার্য্যে সকল ব্রত উদ্যাপন হইল না, ইহার পর অনেক বলিবার আছে, অনেক খাটিবার আছে, অনেক ভোগ করিবার আছে, ইহা ভুলিয়া যাইও না। পরব্রহ্মের অজানিত প্রসাদ লাভে উচ্চপথ অবলম্বন কর, তাঁহার অনন্ত শক্তির আশ্রয়ে দলবদ্ধ হও, ঈশ্বরের জন্য দেহত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হও। উৎসবের মেষগণ, এই বেদীর দিকে অগ্রসর হও, আমি তোমাদিগকে বলিদানের মন্ত্র শিখাইয়া দিব। তিনি যদি তোমাদিগকে বধ করেন তাহাও

শ্রেয়ঃ, অন্যে যদি তোমাদিগকে এককালে শত জীবন দেয় তাহাও অগ্রাহ্য। অতএব তোমরা তপস্যার অগ্নি প্রজ্বলিত কর, বলিদানের জন্য আয়োজন কর, সিদ্ধি-লাভের জন্য প্রস্তুত হও।

হে জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বর, কথায় মানুষ ভোলে না, তুমি কি কথায় ভুলিবে? কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে সংসারে কোন গুরুতর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে যে এই ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হইবে? যদি বাহিরের সামান্য সিদ্ধিও না পাইলাম তবে তোমাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইব? সামান্য সেবাতে যখন বন্ধুকে, পরিবারকে ভোলান যায় না, তোমার ঋণ ইহাতে কিরূপে শোধ হইবে? কত সোণার শরীর তোমার অন্বেষণে মাটী হইল, কত মহাজনের বাণিজ্য, জ্ঞানীর বিদ্যা ব্যয় হইল, কত পরিবার, কত জনপদ ছারখার হইল, তবুও তুমি তুষ্ট হইলে না।' কি দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব? আমাদের কি আছে? আমাদের এই জীবন আছে, ইহা তুমি গ্রহণ কর, আমাদের এই আত্মা আছে ইহা তুমি গ্রহণ কর। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বিচার যাহা কিছু আছে তুমি সমস্ত গ্রহণ কর, আমরা যেন তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় স্বীকার করি। আমাদের এই সামান্য উদ্যোগ, সাধন, সেবা তোমার চরণে অর্পণ

করি, যাহা তুমি দিয়াছ তাহা তোমাকে দিয়া তুষ্ট হই। আমাদের এই রক্তকে পবিত্র কর, মনকে দেবতুল্য কর, চরিত্রকে স্বর্গের সামগ্রী কর, এবং এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে তোমার যোগ্য করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গঙ্গাতীর

বারাকপুর, উদ্যান

শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৮১৬ শক, ২৬শে জানুয়ারী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

উদ্বোধন

আজ ভব নদীর প্রান্তে স্বর্গের জ্যোতি পড়িয়াছে। এ পারে বসিয়া ব্রহ্মনাম করিতেছি, ওপার হইতে পরব্রহ্মের মধুর নাম শুনিতেছি। নয়ন উন্মীলিত করিয়া সেই পবিত্র আকার দর্শন করি, নয়ন নিমীলিত করিয়া সেই সুন্দর মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করি। উৎকৃষ্ট স্থানে উত্তম হৃদয় লইয়া সর্ব্বোত্তম সারের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এখন সর্ব্বতোভাবে তিনি পবিত্র সন্দর্শনদান করুন; কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

আরাধনা

হে সারাৎসার সত্য, এমনি প্রবাহমান কালস্রোতে জীবনতরণী ভাসিতেছে; এমনি কখনও তরঙ্গ কখনও তুফান, কখন জোয়ার কখন ভাটা — সংসারে কিছুই স্থির নাই। এইমাত্র জল স্বচ্ছ, ক্ষণকাল পরে আবার

কালো, এই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আবার ক্ষণপরেই পরিচ্ছন্ন, কিছুরই স্থিরতা নাই। কেবল তুমিই নিত্য, সত্য, নির্ব্বিকল্প, স্থির—কালের পরিবর্ত্তন তোমার উপর উপদ্রব করে না, ঘটনার অস্থিরতা তোমাকে চঞ্চল করে না; হে অক্ষয় সত্য, তুমিই সার, অটল, বিকারশূন্য। তোমাতে অবিচলিত হই; তুমিই জীবন্ত যথার্থ দেবতা।

তোমার জ্ঞানে ভুবন উজ্জ্বল, তোমার সুকৌশল লেখনী এই নদীর রেখাকে টানিয়া সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিয়াছে, তোমার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই সকল বৃক্ষপত্রে, দূর্ব্বাদলে, এই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, এই অন্তরের ভাব চিন্তাতে, এই জীবনের উত্থান পতনে, তোমার জ্ঞানগরিমা এই অনন্ত আকাশে এবং তাহার ভিতরে যত কিছু আছে তৎসমস্তকে রচনা করিয়াছে। বাগানের ফুল, শিশুর মুখ, সাধুর হৃদয় তোমারই রচনা; আমাদের নিয়তি তোমার অভিপ্রায় শূন্য নহে। আমরা কি আপনার নিয়মে উঠি, বসি, বাঁচি, মরি? তোমার ইচ্ছা, অভিপ্রায়, ভাব, মতি, গতি, সূক্ষ্ম অকাট্য জালের ন্যায় আমাদিগকে জড়াইয়াছে। সাধ্য কি তাহাকে অতিক্রম করি? তোমার দ্বারা চালিত হইতেছি; অথচ আপনাকে স্বাধীন ভাবিতেছি। তোমারি চৈতন্যের উজ্জ্বল নেত্র আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে,

তোমার সর্ব্বান্তর্যামী জ্ঞান আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছে, আমরা তোমার নিকট অপরাধী আবার তোমার নিকট নিরপরাধী। হে জ্ঞানময়, আমরা তোমার শিষ্য, তোমারই অনুগামী, তোমা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতেছি। তুমি সর্ব্বদর্শী, চৈতন্যময়, সাক্ষী-স্বরূপ।

তোমার অপার গৌরব, তোমার অসীম যশঃ মহিমা, তুমি সর্ব্বময়, তোমারই সমস্ত। তুমি সমস্ত হইতেও প্রকাণ্ড। আমরা প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরের আঁধার দূর করিতে পারি না, তোমার অনন্ত আলয়ে কত শত স্থির সূর্য্য ও ঘূর্ণিত সৌরজগত। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া তোমার জ্যোতির কি পরিমাণ করিব? হে অনন্ত মহিমা! তোমার গুণ, তোমার চরিত্র, তোমার ব্যবহার যতই ভাবি, তাহাতে আমাদের স্বাভাবিক নীচতা দূর হয়, আমরা আপনাদিগকে অনন্তের সন্তান, অনন্ত-তীর্থের যাত্রী বলিয়া বোধ করি। যখন ক্ষণকালের জন্য জীবনের জঞ্জাল সরাইয়া তোমার মহাপ্রবাহে নামি, তখন যেন কোন অনন্ত অজানিত, বিস্ময়কর দেশে চলিয়া যাই। আমরা তোমার সন্তান এ কথা যখন মনে হয়, তখন বুঝি কেন এ স্বভাব অজানিত সামগ্রীর জন্য ব্যস্ত হয়, তখন বুঝি আমি কূপবাসী ক্ষুদ্র ভেক নহি, কোন অনন্ত, অক্ষুব্ধ বারিধির মৎস্য, এখন কূপে

বদ্ধ থাকিলেও অকূল অদৃষ্টের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। এখন নিজের বাস কুটীরে আবদ্ধ হইয়াছি বটে; কিন্তু আত্মা এই বিশাল আকাশ পথে তোমার সঙ্গে বিচরণ করিতে চায়। আমরা অসীম ব্রহ্ম-প্রবাহের বিন্দু, আমরা অন্তরের ভগ্ন-খণ্ড, আমরা অপার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আমরা তোমার মহিমার স্তুতিবাদক। তুমি অনাদি, অনন্ত, অগম্য, ভূমা, মহান।

পিতা যখন এ পৃথিবীতে তোমার এত দয়া তখন সে পৃথিবীতে তোমার কত দয়া কে জানে? প্রেম প্রয়াসী-ভক্ত তাহার কিছু কিছু অবগত হন, কিন্তু তাবৎ বুঝিতে না পারিয়া অনেক আশা করিয়া থাকেন। কৃপাময়, এখানে সকল মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ, মরণান্তে কত প্রকার মঙ্গল-সিদ্ধি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ কে জানে? এখানে তোমাকে যত্নবতী জননী বলিয়া বুঝিতেছি, সেখানে না জানি তোমার আদর যত্ন আরও কত বুঝিব। এখন শরীরের অবসাদে আত্মার ভক্তি বাড়িতেছে, জড়ের সঙ্গে আত্মার কত প্রেমময় সম্বন্ধ, জড় জগতের রূপ রস গন্ধে স্পর্শে ইন্দ্রিয় এবং আত্মা তোমারি করুণারূপ দর্শন শ্রবণ আস্বাদন করিতেছে। বায়ু আমাকে সেই দেশে লইয়া যাইতেছে, জল আমাকে সেখানে লইয়া যায় যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্য, রোগ মৃত্যু দুর্ভাবনা নাই। পুষ্প

সকল শাখা হইতে খসিয়া পড়িয়া বলিতেছে বিভুপদে আত্মা অঞ্জলি দাও, নদী প্রেম-সঙ্গমের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে, সমুদ্র অনন্তের প্রেমবক্ষ প্রসারণ করিতেছে। কাহার জন্য এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছ? ক্ষুদ্র কীট জাতি, জীব জাতি, মানব জাতি কেনা তোমার ভাণ্ডার হইতে পালিত হইতেছে। তোমার করুণার নিকট আমার ভক্তি ভাবের কি মূল্য? ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর; তোমার প্রেম-ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তোমার পূজা করি। দিবসের শ্রমাবসানে তোমারি স্নেহপূর্ণ চরণে আত্ম নিবেদন করি। কৃপাময় গুণধাম তুমি।

অতি পবিত্র তুমি, তোমার সহবাস স্পর্শ করিলে আমরা পবিত্র হই। মুক্তিলাভ করা কি তাহা জানি না, তোমার কাছে বসিলে তোমাময় হই, তোমাময় হইলে প্রবৃত্তি, বাসনা, বিষয়-তৃষ্ণা, সকল মন্দভাব মিটিয়া যায়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, 'আত্মা স্বর্গীয় হয়, ইহাই মুক্তি তোমার পবিত্র তেজ হৃদয়ঙ্গম হইলে তাবৎ জড়তা, পশুত্ব, রাজসিকতা রহিত হয়, আত্মা তেজস্বী হয়, জীবিত হয়, সংসার বৈকুণ্ঠ হয়, কৃত পাপের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, ইহাকেই মুক্তি বলি। এই জন্য হে পুণ্যময়, তোমার পবিত্র আরাধনা আমার অতিশয় রুচিকর, তোমার মুক্তি-প্রদ সঙ্গ সর্ব্বদাই অন্বেষণ করি। তুমি শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় অপাপবিদ্ধ।

হে আনন্দময়, তোমাকে একাকী ডাকিয়া সুখী হই। দশজনের সঙ্গে ডাকিয়াও সুখী হই। কাহাকেও না দেখিলে তোমকে দেখিয়া গভীর নির্জ্জনে আমার চিত্ত মধুময়, দশ জনের মধ্যে তোমাকে বিরাজমান দেখিলে অন্তঃকরণ আহ্লাদে প্রফুল্ল। তোমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া হিমালয় মধ্যে প্রগাঢ় স্বাস্থ্য উপার্জ্জন করি, মহা সমুদ্র হইতে কত সুধা মন্থন করি, বাহ্য-প্রকৃতিরাজ্যে স্বর্গরাজ্য দর্শন করি, এই মানব সমাজে দেবসভা প্রত্যক্ষ করি, যাহা দেখি সকলই মনোহর বোধ হয়। কি স্বদেশে কি বিদেশে তোমার আনন্দময়রূপ হেরিয়া কৃতার্থ হই। আনন্দের রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। যদি তোমাতে মতি থাকে আনন্দের রথে আরোহণ করিয়া এখান হইতে স্বর্গে যাইব। তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদে নরকের আগুন জ্বলে, তোমার সঙ্গে মিলনে সকল বিশ্রাম, সকল তৃপ্তি, সকল শান্তি লাভ করি। তুমি সুখময়, সচ্চিদানন্দ।

তুমি এক অদ্বিতীয়, সকল ধর্ম্মের বিধাতা, সকল জ্ঞানের আধার, তুমি সকল জীবের প্রাণ, এই নানা ধর্ম্ম বিধান তোমারই আত্মবিকাশ ও বিচিত্র প্রকৃতি। তুমি দুঃখীর কাছে দুঃখী, সুখীর কাছে সুখী, যোগীর কাছে মহাযোগী, ভক্তের কাছে একান্ত পরাধীন।

তোমার নানা মহিমা বলিব কি প্রকার? তুমি বিশেষ তুমি নির্ব্বিশেষ, প্রতি বস্তুতে তুমি, সমস্ত সৃষ্টিতে তুমি, তোমারই শরণাগত হই, মনের আনন্দে, অপার ভক্তিতে তোমাকে নমস্কার করি।

ধ্যান

অনেক তুফান খাইয়াছে, অনেক দাঁড় হা'ল ভাঙ্গিয়াছে, অনেক পাল ছিঁড়িয়াছে, ডুবিতে-উঠিতে ঐ সকল নৌকা শেষে শান্তির ঘাটে পঁহুছিয়াছে; আমার অস্থির প্রাণ ঝড়ে তুফানে ভগ্নপ্রায়, উপায় অবলম্বন বিরহিত। অনেক বার প্রায় ডুবিয়া যায় এমন হইয়াছে। আর কেন মন, চল সেই চৈতন্যধাম, শান্তিঘাটে গিয়া ক্ষণ-কাল স্থির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নিরীক্ষণ করি, ব্রহ্মেতে বাস করি, ব্রহ্ম-নিশ্বাস গ্রহণ করি, ব্রহ্ম-নিশ্বাস ত্যাগ করি। সেই আলোক সেবন করি, যাহা দর্শনে মোহ কুয়াসা কাটিয়া যায়; চিদানন্দের স্থান কোথায়, শান্তির দেশ কোথায়, অমৃতের উৎস কোথায়? — অন্তর রাজ্যে। সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া চিদানন্দের ধ্যানে মগ্ন হই—কৃতার্থ হই।

উপদেশ

সম্মুখে ঐ গঙ্গা, পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ, সহজেই এপার ওপার নজরে আসে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদীতে

কত নদী মিশিয়া রহিয়াছে; ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যমুনা সরস্বতী, ইহার সঙ্গে কত খাল, বিল, তড়াগের সম্মিলন, অথচ ইহা সঙ্কীর্ণ। সহজে কিন্তু বুঝা যায় না যে এই নদীতে এত সংযোগ বিয়োগের ব্যাপার আছে। কেবল জ্ঞান, ভাবনা, অনুসন্ধানে উহার ভিতর হইতে এই সমস্ত কথা বাহির হয়। মহাজনগণের জীবনও এইরূপ; উহা আপাততঃ দেখিতে পরিসরে, আকারে, প্রকারে, তোমার আমার জীবন অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু উহার ভিতরে কত সত্যের সন্নিবেশ, কত ভাবের উচ্ছ্বাস, কত অন্তঃসলিল যোগ, কত ভক্তির গভীরতা, কত কত সাধনা, কত চেষ্টা। একজন ধর্ম্মাত্মার অন্তরে কত শাস্ত্রের তত্ত্ব, কত ঋষি-মুনির শিক্ষা, কত আদর্শের সমন্বয়, একজন মানুষের আত্মা মধ্যে কত মানুষের আত্মা। এই সকল ব্যাপার দেখিলে ভাবিলে, অনুসন্ধান করিলে তুমি অবাক্ হইবে। ঈশা-চরিত্রের ভিতর কত বিশ্বাসী শিষ্যের জীবন, কত পরাক্রান্ত মণ্ডলী, কত দুঃখী, পাপী তাপী, ভগ্ন হৃদয়ের আশা, কত অন্ধ রোগীর উদ্ধার! কত জাতির কত জীবনের বিশ্বাস, শান্তি, কত আত্মার আহ্লাদ আগ্রহ, কত দীন হতভাগ্যের সান্ত্বনা, কত ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত জনের নির্ভর সহিষ্ণুতা! এইরূপ সমস্ত মহাজনগণের

প্রকৃতি। যে মহাত্মার দিকে দেখিবে তাঁহারই ভিতরে এইরূপ বৈচিত্র। আবার দেখ এই নদীতে যদি অন্যান্য নদী, উপনদী, জলপ্রপাত না মিলিত হইত তাহা হইলে ইহা এত গভীর হইত না, ইহার স্রোত ক্ষীণ হইত, ইহার জল দুর্গন্ধময় শুষ্ক হইত। ইহার এই শ্যামল তীরে প্রাণ বিমুগ্ধকর সুমিষ্ট বায়ু সেবন ও উপাসনা করা দূরে থাকুক কেহ ইহার নিকটে পদ ধৌত করিতেও আসিত না।

পূর্ব্বগত সাধুগণ ব্যতীত, সঙ্গীগণের সহযোগ ব্যতীত সামাজিক সহায়তা ব্যতীত কোন জীবনই পূর্ণতা পায় না। ঈশার জীবননদীতে ইব্রাহিমের অটল বিশ্বাস, মুসার ধর্ম্মবিধি, দায়ুদের মহাভাব, সলিমনের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আরও অনেক ইহুদি আচার্য্যদিগের জীবন চরিত্র মিশিয়া রহিয়াছে। ইহারই জীবন হইতে যোহন, পিটর, পল প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় জীবনের স্রোত বহন করিয়া বিবিধ পথে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত সংযোগ সম্প্রসারণের উপায় ভিন্ন ঈশা-জীবন কিছুতেই এত গৌরবান্বিত হইত না। অতএব তোমাদের জীবনকে এই প্রকার সংযোগ সম্প্রসারণের অধীন কর। নতুবা কল্যান নাই।

এই নদীতে স্রোত আছে; কত তরী স্রোতের

অনুকূলতায় অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতেছে। তরণীগুলি যখন চলেনা, বিশ্রাম করে, তখনও এই জলেই থাকে। যদি ইহাদিগকে জল ছাড়াইয়া কূলে তুলিয়া রাখ উহা রৌদ্রে শুকাইবে, ফাটিবে, ভাঙ্গিবে অবশেষে কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া চুল্লির ইন্ধন হইবে। তেমনি তোমাদের জীবনতরণী যদি এই সকল মহাজন-জীবন-নদী অবলম্বন করিয়া গম্যস্থানের দিকে যাত্রা করে, সচল স্রোতস্বতী সহজে সেখানে উপনীত করিবে। তাহা না করিয়া যদি সংসার শৈকতে তুলিয়া রাখ কাল সূর্য্যের দাহনে উহা চূর্ণ হইয়া চুল্লীর কাষ্ঠ হইবে। ব্রহ্ম সাধনার জলে ইহাকে নিয়ত সুসিক্ত না রাখিলে কিছুতেই রক্ষা নাই।

এই নদীতীরে দুধারে দণ্ডায়মান সারি সারি বৃক্ষ কিসের সাক্ষ্য দান করিতেছে? ইহারা কি এই নদীর আদি বৃত্তান্তের কিছু সাক্ষ্য দাতা নহে? এই নদী কি প্রকারে বৰ্দ্ধিত হয়। ইহার পরিসর গ্রীষ্মকালে কিরূপ সঙ্কীর্ণ বর্ষাতে ইহা কিরূপ বিস্তৃত হয়, এই তটস্থ তরুরাজী তাহা দণ্ডায়মান হইয়া সকলই দর্শন করে। মহাজনগণের প্রতিভার সাক্ষদাতা, তাঁহাদের বংশজ ধৰ্ম্মমণ্ডলী। ধৰ্ম্মমণ্ডলীর অবস্থা দেখিয়া অনেক পরিমানে সংস্থাপকের জীবনের মহত্ব উপলব্ধি হয়।

এই যে এত জলস্রোত, এই যে নদীর এত প্রাবল্য, এই যে এমন সমুদ্রগামী প্রবল বেগ, ইহার উৎপত্তি কোথায় ? সেই হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বিগলিত হিমানী ও হিমশীলা কিরূপে এত উচ্চ পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল ? অদৃশ্য বাষ্প হইতে হিমানী, উহাই ঘনীভূত হইয়া হিমশীলা, বিগলিত হইয়া জল প্রবাহ, এই জলের বিবিধ আকার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু । আকাশে ইহাদের উৎপত্তি, স্বর্গে ইহাদের স্থিতি, পৃথিবীতে ইহাদের গতি মাত্র । সূর্য্যের উত্তাপে সাগর হইতে বাষ্পাকারে জল উঠে, তুষার হইয়া পর্ব্বতে নামে, আবার সূর্য্যের উত্তাপে জল হইয়া নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়ে । যে সূর্য্যকিরণে উৎপন্ন হিমানী সেই সূর্য্যকিরণেই বিগলিত জলস্রোত ; তেমনি যে ব্রহ্মের ইচ্ছাতে অনন্ত সত্যসিন্ধু হইতে ধর্ম্মের সৃষ্টি, তাহারই প্রবাহ এক একটি মহাজন । সূর্য্যের আলোকে জলবিন্দু যেমন বিবিধ বর্ণ ধারণ করে, তেমনি মহাজনগণের অন্তরে কখনও ভাব, কখন ভক্তি, কখনও জ্ঞান, কখনও আত্মত্যাগ, কখনও আত্মবলিদান ; কিন্তু সমুদয়েরই মূল এক ব্রহ্ম-ইচ্ছাতে । নদীর গতি সমুদ্রে, নদীর জল খাল বিল তড়াগ অনেক ধারণ করে সত্য ; কিন্তু সমুদ্র ভিন্ন

উহার সম্যক্ জল আর কোন আধারে ধৃত হয় না। যে সমুদ্র ইহাকে উৎপাদন করে সেই সমুদ্রই ইহাকে গ্রহণ করে। তেমনি মহাজনগণের জীবনের বেগ নর-নারীগণ বক্ষে ধারণ করিয়া পর্য্যাপ্ত করিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে উহা উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম মধ্যে উহা অদৃশ্য হয়।

দেখ আর এক ব্যাপার — এই বড় নদীতে কত ছোট নদী মিশিয়াছে, অথচ সেই ছোট নদীর চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধর্ম্মমণ্ডলীও এইরূপ, এক এক মণ্ডলীতে কত শত শত লোক মিলিয়া আছে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। যদিও চিহ্ন পাওয়া যায় তথাপি সকল লোকের গতি এক, নিয়তি এক, জীবনের বিবিধ অবস্থার ভিতর সংযোগ সংপ্রসারণেও একতা আছে। নিজের জীবনকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া তুচ্ছ করিলে চলিবে না। যদি ইহার স্রোতকে চলিতে না দেও পচিয়া যাইবে, যদি উহাকে শুষ্ক ডাঙ্গায় ফেলিয়া রাখ জ্বালানি কাষ্ঠ হইবে, যদি ইহাকে মণ্ডলীতে রক্ষা না কর ইহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, যদি ইহাকে অনন্তের সঙ্গে যোগ না কর বিনষ্ট হইবে

এই ভবনদী পার হইতে হইবে। — এ পারে আছ বটে কিন্তু ওপারের লোক তোমাকে ডাকিতেছে, এ পারে প্রবাস ওপারে আবাস—জন্মভূমি; এ পারে

বাজারের সঙ্গী, পথিকের সামান্য আলাপ পরিচয়, ওপারে আত্মীয় স্বজন। এ পারে ক্রন্দন ও শবের টানাটানি, ওপারে চিরসুখ চির আনন্দ, চির প্রশান্তি — মহাজয় মহা কোলাকোলি! এ পারে তৃষ্ণা ওপারে পান, এ পারে ক্ষুধা ওপারে নিবৃত্তি, সুতরাং এ পারে আর চিরদিন কিরূপে থাকিবে? সংসার হইতে স্বর্গের দিকে যাত্রা করিয়াছ। হে যাত্রীক, তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভগ্য আর কি আছে?

প্রিয় বন্ধুগণ, এই নদী আর কত শিক্ষা দিবে? ভগবানের প্রেমের কথা আর কত বলিবে? ভগবান এই উপলক্ষে তোমাদিগকে আজ আশীর্ব্বাদ করুন। সমস্ত পরলোক আজ তোমাদের নিকট উজ্জ্বল, এখন কি নিবৃত্ত হইতে চাও? মন, প্রাণ, যদি অধীর হইয়া, মহা ব্যাকুল হইয়া এই অনন্ত দেবতাকে এবং তাঁহার সমস্ত বিধানকে আজ আনন্দে গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে নিবৃত্ত হও; কিন্তু এসকল কথা ভুলিও না ইহা ভুলিবার বস্তু নহে। দিন রাত ধ্যান করিবার বস্তু, জীবনকে এই মহা সুখ শান্তিতে অবিরত ডুবাইয়া রাখ। "চল ভাই, চল যাই দেব দেব দর্শনে" এই গান গাহিয়া ব্রহ্ম পূজা আরম্ভ করিলে, ব্রহ্ম পূজা শেষ করিলে কি বলিয়া? সত্য কি গোপন করিবে? দেখিয়া শুনিয়া

ব্রহ্মের নিগূঢ় বিচিত্র ব্যবহার কি অস্বীকার করিবে ? কাহার মায়াতে ভুলিবে, কে হে ওপারের যাত্রি ! তোমাকে আবার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বন্ধ করিবে ? তোমার এই দর্শন চির সুদর্শন হইয়া — চিরশান্তি আনয়ন করুক ।

ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মভাব ধর্ম্মচরিত্র

শান্তিকুটীর — কলিকাতা

রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৮১৬ শক, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

যেমন ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্তরে স্তরে গ্রথিত করিয়া গৃহের ভিত্তি, প্রাচীর ও ছাদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় জান, তেমনি ধর্ম্মজীবনের নানাস্তরের কথা শ্রবণ কর। হে সাধক! তুমি এই ধর্ম্মজীবনের কোন স্তরে বাস কর, তাহার সমাচার কি বলিতে পার?

ধর্ম্মজীবন কিসে? চিন্তায়। বুদ্ধ বলেন "যে যাহা ভাবে তাহার জীবন তাই"— চিন্তাতে জীবন জড়িত, জীবন গঠিত, জীবন পর্য্যাপ্ত। যাহার ভাবনা পবিত্র তাহার জীবন পবিত্র, যাহার চিন্তা অপবিত্র — বাহিরে তাহার জীবন নির্দ্দোষ হইলেও ভিতরে অপবিত্র। মনে যখন ভগবানের চিন্তা উদয় হয়, কে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, কে রক্ষা করিতেছেন, এই বিস্তীর্ণ আকাশ পূর্ণ করিয়া কে বসতি করেন, আমার অন্তরে কে বিরাজ করেন, ইতিহাসক্ষেত্রে কে অভিনয় করেন, যুগ ধর্ম্মবিধানকে

কে প্রেরণ করেন, এই সমস্ত চিন্তা মনে হইলে ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয়। তখন আধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বারম্বার মনোমধ্যে এই প্রকার ধর্ম্ম-জনিত গভীর চিন্তা যাতায়াত করিলে তাহা ক্রমে ঘনীভূত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ধর্ম্মচিন্তা প্রগাঢ় হইলে তাহা ধর্ম্মমতে পরিণত হয়। চিন্তা বিশৃঙ্খল হইলে জীবন গঠিত হয় না। তাহা তরল, অনিশ্চিত, ও অস্থায়ী অবস্থায় থাকে। পরিষ্কার চিন্তা মত ও বিশ্বাসের আকার ধরিলে তাহা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

অনেক লোক দেখিতে পাই যাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল কতকগুলি মত মাত্র মনে করেন; উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমত হইলেই সমস্ত হইল। তাঁহারা মতের পক্ষপাতী, মতের দাস, মতের প্রচারক। ধর্ম্মবিষয়ক বিশুদ্ধ মত অত্যা-বশ্যক বটে, আদরের বস্তু বটে, ইহা অবলম্বনীয় বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু কতকগুলি ভাল মত হইলেই যে ধর্ম্মজীবন হইল ইহা মনে করিও না। কত কত উৎকৃষ্ট মতাবলম্বী ব্যক্তি নীতি চরিত্র বিষয়ে হীনতা প্রদর্শন করেন। যেমন ধর্ম্মচিন্তা ঘন হইয়া মতের আকার ধারণ করে, তেমনি ধর্ম্মমত ঘন হইয়া ধর্ম্ম-ভাবের আকার ধারণ করে। যদি চিন্তার সঙ্গে ভাব রস না মিলিল, যদি মতের সঙ্গে প্রেমোদয় না হইল,

যদি জ্ঞান ও প্রেমের সঙ্গে ভক্তিভাব না জন্মিল তাহা হইলে আধ্যাত্ম-জীবনতত্ত্ব কখনও লাভ করিতে পারিবে না। যেমন চিন্তার পরীক্ষা মতে, তেমনই মতের পরীক্ষা ভাবে, ভাব-বিহীন ধর্ম্মমত, প্রাণ-বিহীন দেহের মত, তাহা লইয়া কি হইবে ? ভাবের ঘন অবস্থা প্রেম, প্রেমের ঘন অবস্থা ভক্তি, ভক্তির ঘন অবস্থা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবনের একাকার। এই সকল স্তর পরম্পরা আধ্যাত্ম জীবনকে সুরচিত করে। ইচ্ছা করিলে তুমি আনন্দে তাহার মধ্যে অবস্থান করিতে পার।

ধর্ম্মচিন্তা কর, চিন্তাশীলদিগের সহবাস কর, চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ কর, প্রকৃতি মধ্যে, ইতিহাস মধ্যে, জ্ঞানময়ের গভীর চিন্তায় মগ্ন হও, সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত লাভ করিবে। অনেক লোকের ধর্ম্মমত আছে, কিন্তু ধর্ম্মচিন্তা নাই — যে সকল ধর্ম্মমত অল্প বয়সে শিখিয়াছে চিরদিন তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে, সে বিষয়ে মনে কোন ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না। কিন্তু এমন লোক দেখি নাই যার ধর্ম্মচিন্তা আছে কিন্তু ধর্ম্মমত নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে চিন্তাশীল হও, গভীরচেতা হও, সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব কর। এই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মমত প্রাকৃতিক প্রণালীতে রূপান্তরিত হইয়া ভাবের আকার গ্রহণ করে ;

ধর্ম্মের ভাবে হৃদয় সিক্ত হয়, আর্দ্র হয়, আরও উচ্চ চিন্তার জন্য প্রস্তুত হয়, সম্পূর্ণরূপে সারবান হইয়া নানা প্রকার পরমার্থ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে উচ্চ জীবনের আরম্ভ হয়, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়, আধ্যাত্মিক রহস্য মনকে পূর্ণ করে, ভাবাবেশ হইলে কি না হয়।

হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রমুক্ত হইলে তাহাকে মহাভাব বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ব্যাপার সংগঠিত হয়, বড় বড় দুরাচারীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কত রাজা ফকির হয়, কত জাতির ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অবস্থা সর্ব্বদা ঘটে না। উৎসবের সময় কথঞ্চিত দেখা যায়, শোকে, রোগে ও নির্যাতনের সময় কখন কখন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যখনি এরূপ ঘটে, ইহাকে জীবনে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যেমন বৈশাখে কোন দিন বাতাস শীতল হইল, কোন দিন মেঘ হইল, কোন দিন জল হইল, যদি ত্রিশ দিনের মধ্যে পাঁচ দিন বৃষ্টি হইল সেই কয়দিন কৃষকের আনন্দ; কারণ পাঁচ দিনের জলে হয়ত সমস্ত বৎসরের শস্য রোপিত হইয়া থাকে। তেমনই অন্তরে কখন কখন ভক্তির উচ্ছ্বাস হইলে তদবসরে আমরা চিরজীবনের সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। কিন্তু

এমন অবস্থাও আছে যখন ইহাতে যথেষ্ট হয় না, সর্ব্বদা ভগবৎ সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বদা অন্তরে ভাবের পূর্ণতা ভিন্ন দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে অভয়, পাপে পরিত্রাণ ও আত্মাতে পরমাত্মার গভীর স্পর্শ ভোগের অন্য উপায় নাই।

এইমাত্র ভাগবত হইতে পাঠ করিলাম ভগবান নারদকে বলিতেছেন, "একবার দর্শন দিলাম তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য", এখন সাধন কর ও নিজ যত্নে সিদ্ধি লাভ কর। অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য একবার দর্শন যথেষ্ট; কিন্তু যদি সর্ব্বদা দর্শন না হয় তবে কি কেবল চিন্তা ও মত লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? যদি থাকিতে হয় তাহা নিতান্ত দুর্ভাগ্য। কল্পিত ভক্তি লইয়া সন্তুষ্ট থাকা আরও বিড়ম্বনা। চক্ষু হইতে বাষ্প নির্গত হইল, ঘন ঘন শ্বাস বহিল, উচ্চ হাস্য, উচ্চ ক্রন্দনে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল, লম্ফে ঝম্ফে, দশায়, মূর্চ্ছায়, নিকটে তিষ্ঠিয়া থাকা ভার হইল, তাহা দেখিলেই কি ভক্তির পরাকাষ্ঠা মানিব? তাহা মানিতে পারি না; শরীরে অপ্রাকৃত ভাব আসিলে সাবধান হইবে। ইহা অনেক সময় অত্যন্ত ভ্রান্তি এবং কুসংস্কার-মূলক। আমি ইহা অনেক ব্রাহ্মের ভিতর দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মজীবন ভাল নহে। ভাবের পরীক্ষা

কিসে ? ভক্তির ব্যবহার কি ? ধর্ম্মভাবের প্রমাণ চরিত্রে, ব্যবহারে, কার্য্যে, সদনুষ্ঠানে। যাহার নীতি দূষিত, যাহার চরিত্র মলিন, যাহার স্বভাব জড়ীভূত, যাহার কার্য্য স্বার্থপর, অভিপ্রায় নীচ, তাহার চিন্তা, তাহার মত, কি তাহার ভাবুকতা ঈশ্বরের অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মভাব, প্রেমভক্তি সদনুষ্ঠান বিরহিত নহে। জল ভারাক্রান্ত মেঘ যেমন ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আর আকাশে থাকিতে পারে না, আপনার ভারে আপনি পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, তেমনি ধর্ম্মচিন্তা, প্রেম, ভক্তি, আপনাপনি চরিত্রে সঞ্চারিত, হইয়া শেষে মহদনুষ্ঠানরূপে জগতে বর্ষিত হয়, এবং লোকহিত সাধন করে।

শ্রীচৈতন্য ভক্তির প্রমত্ত অবস্থায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নামকীর্ত্তন ধর্ম্মপ্রচার ও লোককে শিক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ভক্তির শিক্ষা ভারতের সীমা হইতে সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মহম্মদ ঐশী তেজে কত দেশ কত রাজা অধিকার করিলেন। আমরা দুর্ব্বল বাঙ্গালী চরিত্রের শত দোষ দুর্ব্বলতা লইয়া, জড় সড় হইয়া বসিয়া আছি। অলস ভাবে কেবল মত লইয়া, ভাব লইয়া যথেষ্ট হইল মনে করিতেছি।

আর একবার বলি যতক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা হইতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে প্রবলা ভক্তি, ভক্তি হইতে পরোপকার সাধনা, সাধন হইতে চরিত্র নিষ্পাপ না হয়, ততক্ষণ তোমার সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর, সমস্ত মিথ্যা। যদি সমুদয় চরিত্রভূমিতে উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া না উঠে, এবং সেই উৎসাহ জগতের সেবায় প্রবাহিত না হয়, তবে তোমার জীবন অসার।

আধ্যাত্ম জীবনের দ্বার লোকের কাছে ভাল করিয়া বন্ধ করিতে পার; কিন্তু ভগবানের কাছে কিছুই লুকাইতে পারিবেনা। যদি অন্তরে লোভ, রাগ, অহঙ্কার থাকিল, তবে তোমার ভাবুকতা ও কল্পনায় কি হইবে? শীঘ্র মনকে প্রবৃত্তিকে, ব্যবহারকে পবিত্র করিয়া ভগবানের সেবার কার্য্য আরম্ভ কর। তবেই তোমার সকল ভাব সার্থক হইবে। মানুষের নিকট কথায় কিছু হয় না; কার্য্য চাই, চরিত্র চাই, যাহা মুখে বল তাহার প্রমাণ চাই। তবে যিনি অন্তর্যামী, যিনি পরম পবিত্র, যাঁহার ভয়ে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, তাঁহার নিকট আরও কত পবিত্র, কার্য্য, পবিত্র প্রীতি, অকপট সাধনা আবশ্যক ভাবিয়া দেখ।

অতএব সাধক! চিন্তা, মত, ভাব, প্রেম, ভক্তি ও বিশুদ্ধচরিত্রালঙ্কৃত জীবন রচনা করিতে শীঘ্র প্রবৃত্ত হও। ইহার ফল কি পরে দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মচিন্তা পরিপক্ক

হইয়া ব্রহ্মদর্শন রূপে পরিণত হইবে, এখন যাহা ভাবিতেছ পরে তাহা দেখিবে। সত্যের অবয়ব আছে,—স্বয়ং ব্রহ্ম সত্যের অবয়ব, তুমি ভবিষ্যতে কোন দিন সেই অবয়ব দেখিতে পাইবে। প্রেম পরিপক্ক হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক রূপে পরিণত হয়, মানুষ ব্রহ্মসন্তান হয়, ব্রহ্মসন্তান হইলে সকলের উপর প্রীতি হয়, মানুষের মধ্যে পবিত্র প্রেম পরিবার স্থাপিত হয়। পরমেশ্বরে ভক্তি, জীবে প্রেম হইলে সৎকার্য্যে উৎসাহ হয়, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হয়, সংসার যথার্থ তপস্যার ভূমি হয়। শুনা কথা বলিতেছিনা, পঠিত কথা বলিতেছিনা, যাহা শতবার দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি। যাহা সুখে দুঃখে, দেশে বিদেশে প্রচার করিয়াছি, পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। চিন্তাকে নানা অবস্থার মধ্যে বিশ্বাসে ও ব্রহ্ম-দর্শনে পরিণত করিয়াছি, সত্যের অবয়ব নয়ন গোচর করিয়াছি, ভাব পরিপাকে ভক্তি সুধা পান করিয়াছি, ভক্তিভাবে ভগবানের সহবাসে জগতের হিতসাধনব্রত গ্রহণ করিয়াছি, মুক্তি পথে অগ্রসর হইতেছি, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক যেমন নিত্য, সতীর সঙ্গে পতির সম্পর্ক যেমন নিত্য, সহস্র বিঘ্ন ঘটিলেও ইহা বিনষ্ট হইবার নহে: যেমন ইহা হইতে বিনা যত্ন চেষ্টাতে

সহস্র উপকার, আদর, যত্ন, মিষ্টতা উৎপন্ন হয়, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধও তেমনি নিত্য দশসহস্র বিঘ্ন সত্বেও তাহা বিনষ্ট হইবার নহে। যখনি প্রেমময়ের নাম করিবে, অমনি হৃদয় অকূল-সাগরে প্রবল তুফান উঠিবে, ভক্তির প্রবাহে তুমি আপনি ভাসিবে, জগৎসংসার ভাসিবে, যাহার চক্ষু আছে সে দেখিবে, যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করিবে, যদি এবংশ দেখিতে না পায় পরবংশ দেখিবে, যদি বর্ত্তমান দেখিতে না পায়, ভবিষ্যৎ দেখিবে। তুমি ব্রহ্মসন্তান তোমার ভিতর পাপ থাকিতে পারিবেনা। আগুন, জল, স্বর্গ, নরক কি কখনও একত্র থাকিতে পারে? তোমার জীবনব্যাপী ব্রহ্মাগ্নি নিয়ত ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তুমি নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষের সংস্পর্শে দিন দিন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইবে। পরিত্রাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

হে চিন্তামণি, ভাবময়! কেবল কি হৃদয় মধ্যে তোমার ভাবনার মেঘের মত আসিবে আর যাইবে, স্থায়ী হইবেনা? তোমাকে ভাবিয়া অন্তরে ভক্তির বর্ষা হউক, ব্রহ্মজ্যোতি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া চিদালোকে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হউক। কি হইবে মৌখিক প্রার্থনায়, যদি তোমার সঙ্গে নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ না স্থাপন হইল? তোমার "হরিনাম" চিরদিন মিষ্ট লাগিবে কেন, যদি তোমাকে ভক্তিরজ্জুতে

বান্ধিতে না পারি ? যদি অবিশ্রান্ত চরিত্রের উচ্চভূমিতে প্রেমেরউদ্যানে জীবনবৃক্ষে শুদ্ধতার ফল পরিপক্ক না হইল, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐশী শক্তিতে সৎকার্য্যের দ্বারা লোকের সেবা না করিলাম, তবে আর কি করিলাম ? জীবনের ব্রত কোথায় সিদ্ধ হইল ? এই ভাল হইলাম, আবার মন্দ হইলাম, ধর্ম্মে তেজ নাই, ভাবে উচ্ছ্বাস নাই, জীবনে উত্তাপ নাই, চরিত্রে উন্নতি নাই এই দূরবস্থা হইতে মুক্ত কর।

হে প্রাণ স্বরূপ ! এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের ধর্ম্মচিন্তা বিশ্বাসে পরিণত হয়, যেন তাহা হইতে ভাব ভক্তি অনুরাগ বৃদ্ধি লাভ করে—আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রেম মত্ততার রূপ ধারণ করে, যেন তাহা হইতে সকল প্রকার মহৎকার্য্য উৎপন্ন হয়। যেন চিন্তায়, মতে, ভাবে, চরিত্রে অভিন্ন হইয়া তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বাধ্যতা

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ২৮শে মাঘ, ১৮১৬ শক ; ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ

ধর্ম্মচিন্তার কথা বলিলাম, ধর্ম্মভাবের কথা বলিলাম, ধর্ম্মচরিত্রের কথাও বলিলাম। চিন্তা যখন পরিপক্ক হয়, তখন উহা আধ্যাত্মযোগে পরিণত হয়। ঈশ্বরকে এবং তাঁহার সৃষ্টিকৌশল আর পরোক্ষে ভাবিতে হয় না ; ধ্যানযোগ সমাধিতে দেখিতে হয়, ভাব যখন পরিপক্ক হয় তখন উহা পরব্রহ্মের সঙ্গে ও জীবের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে পরিণত হয়। কখনও অন্তরে স্বর্গের আবির্ভাব হইল আর পরক্ষণে অন্তরে নরকের আগুন জ্বলিতে লাগিল এমন হয় না। একবার ভগবানে ভক্তি, জীবে দয়া, আবার তখনই অবিশ্বাস, অভক্তি, বিদ্বেষ, ঘৃণা ; —আবার হৃদয় মরু-ভূমির ন্যায় শুষ্ক এমনও হয় না। বিবেক যখন সতেজ ও পরিপক্ক হয় তখন অন্যায়, মিথ্যা, অসরলতাদি দোষ আর থাকিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে যে ধর্মভাবে ভাবুক হইয়াও, ধর্মচিন্তাতে

সুপটু হইয়াও, বিশুদ্ধ মতাদি পোষণ করিয়াও লোকের নৈতিক চরিত্রে বিষম দোষ দুর্ব্বলতা। সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতর আমি ব্রাহ্মসমাজের নানা দলকেও ইহার ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া বলিতেছি — বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-চরিত্র বড়ই বিরল। কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই দোষে দোষী নহে, কেবল মুসলমান সম্প্রদায় এবিষয়ে অপরাধী নহে। খৃষ্টীয় সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজেও এই দোষ বর্ত্তমান; সুতরাং এই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা আলোচনা করা প্রয়োজন হইতেছে।

আমার কাছে ধর্ম্মচরিত্র বলিলে আনুগত্য, বাধ্যতা, পরতন্ত্রতা বুঝায়। সকল বিষয়ে যে নিজতন্ত্র অনুসারে চলে, নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে তাহার চরিত্র কখনও দোষশূন্য হয় না। বাহ্য প্রকৃতির বিষয়, উহার ধর্ম্ম আনুগত্য, নিয়ম পরতন্ত্রতা, ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অনু-ধাবন কর, । সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, পশ্চিম দিকে কখনও উদিত হইবে না। জল আপনার সমতল অন্বেষণ করিবে, অগ্নি দাহ্যবস্তুকে ভস্মাবশেষ করিবে ইহার অন্যথা হয় না। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংযোগ, বিশ্লেষ কিম্বা প্রকৃতির অন্য প্রকার শক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইলে অল্প সময় মধ্যে সৃষ্টি রসাতলে যায়। মানসিক প্রকৃতির কি অন্য নিয়ম? বিধিপরতন্ত্র না

হইলে, অপরের আনুগত্য স্বীকার না করিলে, নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থ ত্যাগ না করিলে চরিত্র সঙ্গঠিত হইবে না, ধর্ম্মজীবনের মূল নিয়ম এই। অপরের আনুগত্য, কার? ঈশ্বরের না মানুষের? প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ঈশ্বরের, কিন্তু সময়ে সময়ে মানুষেরও বটে। মানুষের সর্ব্বোচ্চ শক্তি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তাহারই ব্যবহারে চরিত্রের তারতম্য। কিন্তু তোমার নিজের ইচ্ছা অনেক সময় শুভ ইচ্ছা নয়। যাহা শুভ তুমি তাহা ইচ্ছা কর না, যাহা অশুভ তুমি তাহাই ইচ্ছা কর। অতএব যদি তুমি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া উচ্চতর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হও তাহাই মঙ্গল। ঈশ্বরের ইচ্ছা, মহাত্মা-দিগের ইচ্ছা, ধর্ম্মমণ্ডলীর ইচ্ছা, তোমার স্বেচ্ছা অপেক্ষা এই তিনই ভাল। যে স্বাধীনতা ভুলিয়া যোগ্য পাত্রের অধীন হয়, সেই পরিণামে প্রবৃত্তি ও পাপের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়।

ভাবুক হইতে পার, মনীষী হইতে পার, দেশ সংস্কারক হইতে পার কিন্তু ধার্ম্মিক হইতে গেলে অন্যের বশীভূত হইতে হইবে। ধর্ম্ম মানে আত্মইচ্ছা ত্যাগ করিয়া, আজ্ঞাধীন হইয়া হুকুমে চলা। যাহার এরূপ শক্তি আছে তাহার ধর্ম্ম আছে। আর ভাবের সময় ভগবান, কার্য্যের সময় আপনার ইচ্ছা; চিন্তার সময়

চিন্তামণি, ব্যবহারে আত্মগরিমা; বলিবার সময় বলি "দীনাত্মারা ধন্য", কার্য্যে দীন নিরাশ্রয়দিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার; কথার বেলা বলিবে "ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তি ধন্য," আর কার্যের বেলা উৎপীড়িত দিগকে আরও উৎপীড়ন করা, এই কি ধর্ম্মনীতি? এই মতের ধর্ম্ম, জ্ঞানের ধর্ম্ম, ভাবের ধর্ম্ম — যাহাতে চরিত্রের শিথিলতা, কার্য্যের অসমদর্শিতা, পবিত্রতার অভাব। ইহা লইয়া কি করিবে? এই যদি জীবনের প্রণালী হয় ইহাতে চরিত্র গড়ে না। ইহাতে না তোমার আত্মা তৃপ্ত হইবে, না তোমার জাতীয় অভাব দূর হইবে, না তোমার কার্য্য লোকের দৃষ্টান্ত স্থল হইবে?

বন্ধুগণ, এই যে অনুগত হওয়ার কথা বলিতেছি, ইহা কাহার আনুগত্য? পরমেশ্বরের — তাঁহার অখণ্ডনীয় শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, নৈতিক নিয়ম, আধ্যাত্মিক নিয়ম এসমুদয় তাঁহারই আজ্ঞা, ইহার বাধ্য হও। ধর্ম্ম-বুদ্ধি অথবা বিবেক নামে যে শক্তি মানুষের স্বভাব মধ্যে নিহিত আছে তাহার তত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। তাহা মানুষের প্রকৃতির অন্তর্গত হইয়া সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিচার নিস্পত্তি করে। যে তাহার অনুগত হইয়া চলে সে ব্যক্তির নিকট তাহা ক্রমে আরও পরিষ্কার হয়। যে অনুগত না হয় তাহার নিকট ক্রমে অস্পষ্ট হয়, শেষে

বিরুদ্ধ হয়। এবং কুপ্রবৃত্তি বিবেকের আকার ধরিয়া নানা পাপে নিযুক্ত করিয়া থাকে। বিবেকের মুখে সরল বাণী, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য যে শুনিয়া চলিতে পারে, তার শারীরিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল কল্যাণ সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু মানুষ মোহপরবশ হইয়া বিবেককে কলুষিত করে। তখন সে কার কথা শুনিয়া চলিবে?

সাধুগণের জীবনে পরীক্ষিত নানা প্রণালী শাস্ত্রে বিবৃত আছে। তোমার অন্তরে নিত্য জাগ্রত প্রহরী বিবেক তোমাকে নানা উপদেশ দিতেছে, এ সকলের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম কর, ও তাহার নিকট বাধ্যতা শিক্ষা করিবে। কিন্তু যখন অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ শুনিতেছ না, যেখানে শাস্ত্রের বিধি পাইতেছনা, কোন মহাজন জীবনে পরীক্ষিত সত্যের সঙ্গে তোমার অন্তঃকরণ মিলিতেছে না, বিবেকের পরিষ্কার নির্দ্দেশ আসিতেছে না, তখন কি করিবে? কতগুলি মোহান্ধ লোক আছে, যাহার আপনার ইচ্ছা, রুচি, ভাব, কথা ভগবানের মুখে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যখন আপনারা যাহা চাহে তখনই বিধাতার মুখে তদনুযায়ী আদেশ প্রাপ্ত হয়; যাই কোন উত্তেজনার সময় কাহাকেও আঘাত করিতে ইচ্ছা হইল, অমনি ভগবান বলিলেন—"যাও, অমুকের মাথা ভাঙ্গো", যাই কাহারও কন্যাকে বিবাহ করিতে

অভিলাষ হইল, আদেষ্টার হুকুম হইল, হাঁ, "অবশ্যই তোমার উহাকে বিবাহ করা শ্রেয়ঃ," ; উৎকোচ গ্রহণের ইচ্ছা হইয়াছে, উপায়ও হইল অমনি অনুকূল বিবেক সদয়ভাবে বলিলেন, "বটেইত, উৎকোচ গ্রহণে একটু দোষ থাকিলেও অনেক ভাল কাজ হইবে"। প্রচুর টাকা আসিল,—দুর্গোৎসব, পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ মহা জাঁক ও জমকে সম্পাদিত হইল, ইহাতে ইহকালও রক্ষা হইল, পরকালও প্রশস্ত হইল, অর্থাৎ এক কোপে ঐহিক পারত্রিক দুই বলিদান করা হইল। সাধুকার্য্যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, ব্রহ্মোৎসবে, লোকহিতে, দাতা বিবেকের নির্দ্দেশ শুনিতে পান না। কিম্বা শুনিয়া চলিতে পারেন না। কিন্তু নিজের বাসনা বিলাষ চরিতার্থ করিবার সময় তাঁহার বিবেক হাত ধরা, সর্ব্বদাই বিধি দিতে প্রস্তুত। এইজন্য ধর্ম্মের এত অপবাদ, আদেশের মত অনেকের কাছে এত অশ্রদ্ধেয়, আমি এইরূপ বিবেক এবং আদেশ মানি না, বিবেক সম্বন্ধে যত কল্পনা, তাহা স্বীকার করিতে পারি না, পুরাতন শাস্ত্র অনুসারে সকল সময় চলিতে পারি না বটে কিন্তু আজকাল ভগবানের আদেশ বলিয়া যে সমস্ত অনিষ্টকর বিষয়ে লোকে ভ্রান্ত হইল তাহাতে যোগ দিতে পারি না। এই অবস্থায় যদি বাধ্য হইতে হয় কাহার বাধ্যতা স্বীকার করিব ? পরমেশ্বরকে দেখিয়াছে কয়জন ? তাঁহার

কথা যারা শুনিয়াছে বলে, তারা শুনিয়াছে কয়জন ? সকল সময় প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আজ্ঞাধীন হইতে পারে কে ? নিজের কল্পনা ও ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিধাতার আজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে জানি না। সকল সময় পরমেশ্বরের আজ্ঞাধীন হইতে পারিবার জন্য প্রার্থনাপরায়ন হইতে নিষেধ করিনা ; কিন্তু আমি নানা প্রকার দেখিয়া শুনিয়া ভুগিয়া বলিতেছি, বৃথা কল্পনা জল্পনা ছাড়িয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ও উচ্চ চরিত্র ভগবতাধীন লোকের আনুগত্য স্বীকার কর, তাহাতে প্রকৃত ঈশ্বরাদেশ শুনিতে পাওয়া সহজ হইবে। যেখানে ভগবানের নিশ্চয় আদেশ স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ পাওয়া সম্ভব নহে সেখানে ধর্ম্মাত্মা মানুষের কথা শুন। স্বাধীনতার, বিবেকীতার ভান ছাড়িয়া, ধর্ম্মের অভিমান ও মতের অভিমান ছাড়িয়া, যোগ্য ব্যক্তির বশীভূত হও — ভয় পাইও না। ইহাকে গুরুবাদ বলিতে চাও বল ; কিন্তু ইহা ভিন্ন তোমার উপায় নাই।

গুরুবাদের মতে ঘোর দায়ীত্ব আছে বটে ; কিন্তু সে দায়ীত্ব শিষ্যের অপেক্ষা গুরুর অধিক। তিনিই সদ্‌গুরু যিনি গুরুবাদের অনিষ্ট হইতে শিষ্যকে রক্ষা করিতে পারেন। যিনি যথার্থ সৎশিষ্য তিনি যোগ্য ব্যক্তি কে তাহা চিনিয়া প্রকৃত আনুগত্য স্বীকার করেন।

কোন্ মানুষের বাধ্য হইবে? মৃতের না জীবিতের? মৃত ব্যক্তিকে গুরুকরণ সহজ, কারণ মৃত তো কথা কয় না; কিন্তু মৃত মহাত্মাদিগের অনেক কথা অনেক ভাব, অনেক শিক্ষা, এখনকার মানুষের জীবনে সংলগ্ন হয় না। পৃথিবী নিত্য নূতন, মনুষ্যপ্রকৃতি নিত্য নূতন, অভাব নূতন, ভাব নূতন, উন্নতি নূতন, শিক্ষক ও দৃষ্টান্তও নূতন চাই, জীবন্ত চাই। ঈশা, গৌরাঙ্গকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতে চাও কর, তাহাতে অনেক উপকার হইবে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা তোমার দৈনিক জীবনে পরিণত করিবার জন্য কোন নিকটস্থ পরামর্শ-দাতা আবশ্যক। সুতরাং জীবিত মানুষের অনুগত হইতে হইবে। যাঁহার তোমার কথার উপর কথা বলিবার শক্তি আছে, তোমার ভাবের দোষ দেখাইবার ক্ষমতা আছে, তোমার কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার আছে, তোমার সহায়তা করিবার সাধ্য আছে, তোমার ভার লইবার উপযোগী বল আছে, তোমার মর্ম্ম বুঝিবার উপযোগী সহানুভূতি আছে, তোমার দৃষ্টান্ত হইবার উপযোগী পবিত্রতা আছে, যাঁর আত্মদর্শন আছে, ব্রহ্মদর্শন আছে, ত্যাগ বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে নির্ভর আছে এমন লোকের অধীনতা স্বীকার করিবে।

যদি আমার কথাতে তোমাদের কোন শ্রদ্ধা থাকে,

তবে এই সত্য মানিতে হইবে। যদি না শুনিতে চাও জীবনে সার্থকতা পাইবেনা। ঈশ্বর বিনা ঈশা কি? ঈশা বিনা ঈশাহি ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মমণ্ডলী বিনা ধর্ম্মবিধি কি? আচার্য্য ও শিক্ষক বিনা মণ্ডলী কি? ইহার একটীকেও ছাড়িতে পারা যায় না।

রোমান কাথলিকদের মধ্যে একটী প্রথা আছে তাঁহারা পোপব্যতীত একজনকে শাসনকর্ত্তা অথবা ডিরেক্টর বলিয়া স্বীকার করেন! যিনি যত বড় লোক হউন না তাঁহাকে পরিচালন করিবার একজন ডিরেক্টর আছেন। তিনি পাদ্রী না হইতে পারেন, জ্ঞানী না হইতে পারেন, দেব-তুল্য লোক না হইতে পারেন, তথাপি সমস্ত বড় বড় পাদ্রী এবং জ্ঞানীদিগকে এমন একজনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। বোধ হয় সকলেই জানেন রোমান কাথলিক গির্জাতে একটী প্রকোষ্ঠ থাকে, তাহার একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। ঐস্থানে একজন পাদ্রী দাঁড়াইয়া থাকেন, আর সমস্ত লোক সেখানে গিয়া নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে ও মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ইহা যদিও একপ্রকার কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে বটে ও এতদ্দারা লোকে মুক্তির অন্যান্য যথার্থ ও প্রকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করে না, তথাপি ইহার ভিতরে কোন সার সত্য নাই এমন মনে করিওনা।

অনেক সময় আমার মনে হয় আমার একজন শাসন-

কর্ত্তা আবশ্যক। তিনি অনেক বিষয় আমা হইতে উন্নত না হইতে পারেন, আমা অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ হইতে পারেন, প্রচারক না হইতে পারেন, খুব শিক্ষিত না হইতে পারেন (অবশ্য ব্রাহ্ম হওয়া চাই, শুদ্ধ চরিত্র ও ভক্তিমান হওয়া চাই) তিনি আমার কর্ত্তা হইবেন। আমি নিজে যাহা করিতে চাই, তোমাদিগকে তাহা করিতে বলি, ইহাতে আমার ভয় কি? কারণ আপনার জ্ঞান যত কেন উন্নত না হউক উহাতে মোহ আছে। আপনার বিবেকের যত কেন প্রশংসা না কর উহার কোথায় না কোথায় স্বার্থ জড়িত থাকিতে পারে। আপনার চরিত্রের যত কেন গৌরব না কর উহাতে অনেক লুক্কাইত কুপ্রবৃত্তি বাস করিতেছে। অতএব বলি যতদূর সঙ্গত হয় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাসী লোক হইতে মানুষকে সহসা অতিক্রম করিও না। যদি নিজে অন্যের বাধ্য হও, অপর সকলেও তোমাদের বাধ্য হইবে। সঙ্গুলী গঠিত হইবে, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বশক্তিমান, আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছ সু-ক্ষণে না কু-ক্ষণে? এতবড় সৃষ্টি তোমার কথা মানে, তোমার আজ্ঞায় উত্তেজিত হয়, তোমারি কথায় শান্ত হয়, তোমার শক্তির তাড়নাতে সূর্য্য উদিত ও অস্তগত

হয় ; প্রভু, আমরা কে এবং কি আমাদের সাহস যে, তোমার কথা অগ্রাহ্য করি ? সামান্য কথা দ্বারা সামান্য ভাবুকতায় তোমাকে তুষ্ট করিব ; জীবনে, কার্য্যে, চরিত্রে, জানিয়া শুনিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিব ?—ইহাতে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইতেছে।

মানুষ সামান্য বিলাসের দ্বারে আত্মবিক্রয় করিল, আপনার গৌরব আপনি ভুলিল, এবং কামিনী কাঞ্চনের অধীন হইয়া আপনার স্বাধীনতার দম্ভে দশ দিক পূর্ণ করিল ; সে দম্ভ কেবল তোমায় অগ্রাহ্য করিবার সময়, ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিবার সময়। তুমি যখন আমাকে ভবে পাঠাইলে আমার কপালে দশ আজ্ঞা লিখিয়া দিলে ; কিন্তু আমি যে তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম না, বন্য পশুর মত যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া বেড়াইলাম। আমরা কেহ জ্ঞানী, কেহ ধনী, কেহ সংস্কারক, কেহ বক্তা,—তোমার অধীন কয় জন ? হে স্বয়ম্ভু, কেমন করিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিব বল, পাপ করিয়াও যখন তোমার ভাণ্ডার হইতে অন্ন জল পাই : তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ করি, তখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া মনে করি, এবার কোন প্রকারে ভগবানের আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইব। প্রভু তোমার অধীন কর এবং তোমার অধীন হইলে যাহাদের অধীন হইতে হয়, তাহাদের নিকট এই মস্তক

অবনত কর। বাধ্যতা ভিন্ন বিদ্যালয় চলে না, কার্য্যালয়, ঘরকন্না চলে না, কোন বিষয় নির্ব্বাহ হয় না, পরিত্রাণ লাভ করিবার সময় কি কেবল অবাধ্য হইব? আমরা কি ভুলিয়া গেলাম, ধর্ম্মজগতে কত অধীনতা, পরস্পরে কত সম্পর্ক, কত লোকে আত্মগৌরব ত্যাগ করিয়া অধীন দাসবৃত্তি গ্রহণ করিল। কেবল এই ব্রাহ্ম-বংশে আত্মগৌরব স্বাধীনতার প্রলাপ কমিল না।

হে পরিত্রাতা আশীর্ব্বাদ কর, সমস্ত বিদ্রোহিতা চলিয়া যাউক, এই সমাজ তোমার বাধ্যতা স্বীকার করুক, তোমার ভক্তদিগের বাধ্যতা স্বীকার করুক। পরস্পরের বাধ্যতা স্বীকার করুক। আর কি বলিব? অনেক দিন লোক সংগ্রাম করিল; কিন্তু কাহারও শান্তি হইল না। এখন শান্তি দাও, পরাধীনতায় স্বাধীনতা দাও, আনুগত্যে পুরুষত্ব দাও, বিধি আজ্ঞা পালনে মুক্তির পথ পরিষ্কার কর, আমরা তোমারই কৃপার ভিখারী, তোমাকে আশার সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

নরক

শান্তিকুটীর, কলিকাতা

রবিবার, ৭ই চৈত্র, ১৮১৯ শক; ২০শে মার্চ, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্বর্গ ও পরলোকের বিষয় অনেকবার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বর্গ ও নরক এই দুইটি অপরাপর সম্প্রদায় যেমন স্বীকার করেন, আমরাও তেমন স্বীকার করিয়া থাকি। অন্যেরা স্বীকার করে বলিয়াই যে, আমরাও মানি তাহা নহে। যেমন পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিয়া, দর্শন করিয়া, তাঁহার সহবাস সুধারস আস্বাদন করিয়া নিশ্চিতরূপে তাঁহাকে বিশ্বাস করি, তেমনি জীবনে স্বর্গের সুখ ও আনন্দ এবং নরকের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছি। স্বর্গ ও নরক যদিও নিশ্চিত বিষয়, কিন্তু এই উভয়ই অতি ঘোরতর প্রহেলিকাময়। মানুষ দেহত্যাগী হইলেই ব্রহ্মলোকে গেল কে বলে? যাহাদিগকে এখানে চিতাক্ষেত্র হইতে বিদায় দিলাম, তাহাদের পথ কতদূর প্রসারিত? তাহারা কোথায় যায় কে জানে? তাহারা কোন উচ্চতম আকাশবাসী তারকাতে, কি কোন সুদূরবর্ত্তী উল্কাপিণ্ডে যায়, কি চিরশান্তিময় ব্রহ্মসত্ত্বাবিহারী হয়, আমরা তাহার কি জানি? ইহলোক হইতে

পরলোকে ন্যায়, অন্যায় বিচারের কিছু তফাৎ থাকিতে পারে, পরলোকের সাধন, ভজন, তপস্যার কিছু পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে, দেহত্যাগী আত্মার পক্ষে স্বর্গদ্বার-দর্শনের অন্তরায় কিছু কম হইতে পারে ; কিন্তু এই আত্মাকে যে অনেক পরীক্ষা এবং অনেক শাসন অতিক্রম করিতে হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

নরক কি, নরকভোগ কি এবং নরক ভোগ কখন শেষ হইবে ? এই বিষয় লইয়া ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যেও বিতর্ক আছে। নরক বলিতে সচরাচর ঈশ্বরের অভাব, ধর্ম্মের অভাব, পুণ্যের অভাব, সাধুতার অভাব এবং সদনুষ্ঠানের অভাব বুঝায়। নরকভোগ বলিতে, ঈশ্বরবিচ্যুতি, ধর্ম্মপুণ্যবিহীনতা, সাধুসহবাসের অভাব, এই বুঝায়। পাপের প্রতি ঘৃণার অভাব, সাধুর প্রতি ভালবাসার অভাব, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগশূন্যতা, ও পুণ্যের প্রতি প্রীতি না থাকিলে কি হয় জান ? অন্তরের সমস্ত রিপু প্রবল হইয়া বনের সিংহ ব্যাঘ্রের মত মনুষ্যকে আক্রমন করে ও গ্রাস করে।

যে রাগী তাহার কি বিপদ ? যে হিংসাপরবশ সে কত ঘৃণ্য, যে লোভী হইয়া পরস্বাপহরণ করে, তাহার রাজদ্বারে কত দণ্ড ভোগ !!! এইরূপে আর আর রিপুগণের অত্যাচারেও মনুষ্যজীবন নিতান্ত বিপদাপন্ন

হয়। যে রাগী তাহার ভিতরে হত্যাকারী বাস করে। রাগ ও হত্যা পরস্পরের সহকারী। যে হিংসার অধীন, সে কুকুর অপেক্ষাও জঘন্য জীবন যাপন করে। হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে যেমন কোন শাসন নাই, আত্মসংবরণ নাই, রিপু প্রাবল্যময় হৃদয়ও তেমনি। ধর্ম্মে ভয় নাই, সংযম নাই, আত্মবিরোধ নাই, কেবল পাপে অনুরক্তি, কুচিন্তার তরঙ্গ হৃদয়ময় খেলিয়া বেড়াইতেছে; কুকার্য্যের স্রোত হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ক্রোধ প্রবল হইয়া হত্যা করিতেছে, অহঙ্কার প্রবল প্রতাপে দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিতেছে, হিংসা অবলীলাক্রমে বিধবার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। সাধুর প্রতি অত্যাচার, ধর্ম্মের অবমাননা, ইত্যাদি পরিপূর্ণ কোন জীবনের চিত্র যদি একবার আঁকিয়া দেখিতে পার, তবে নরক কি বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বরে ভয় ও অনুরাগবিহীন মানব-হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কারের রাজ্য বিস্তার করে। এই রাজ্য যথার্থ নরকধাম। এই নরকে যাহার একবার বাস করিতে হয়, তাহার আর উপায় থাকে না। এই জীবন্ত নরকের বিষয় বলিবার শক্তি ও দর্শন আমার অল্প, তথাপি বলিতে পারি ঈশ্বরে অবিশ্বাস, পবিত্রাত্মাতে অবিশ্বাস, সাধুভক্তগণের প্রতি অবিশ্বাস লইয়া কেহ পরলোকবাসী হইলেও এই ঘোর নরকের

অন্ধকারে বহুকাল তাহাকে ঘুরিতে হয়। যতদিন এই পাপে লিপ্ত শরীর ধারণ করা যায়, ততদিন যাতনার সীমা নাই। সমস্ত রিপুর প্রাবল্যের কথা ছাড়িয়া দাও, এক একটি রিপু কোন জীবনে প্রবল হইয়া তাহাকে এত বিপদে ফেলে যে, তাহার সেই জন্য বহুকাল নরকে বাস করিতে হয়। যদি কাহারও কাম প্রবল হয় তবে কি সাধ্য যে, সে কোন সৎ চিন্তায় নিযুক্ত হয়! যদি কাহারও ক্রোধ প্রবল হয়, তাহা মুহুর্মুহু এমনি জাগিয়া উঠিবে যে, সমস্ত সদ্‌ভাবের যোগ তাহা দ্বারা কাটিয়া যাইবে। এক একটি রিপু সমস্ত জীবনকে নরক করিয়া তোলে। ভাল হইতে বার বার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও এবং বার বার চেষ্টা করিয়াও এক একটি রিপুর অধিকার পরিত্যাগ করা যায় না। পলের খেদোক্তি আমরা অনেকেই অবগত আছি। ইচ্ছা হয় সদ্ভাবের বশীভূত হই, ইচ্ছা হয় পুণ্যজলে পাপ ধৌত করি, ইচ্ছা হয় পুণ্যময়ের সঙ্গ লাভ করিয়া মুক্ত হই; কিন্তু স্বভাবে একবার পাপের শিকড় যদি প্রোথিত হয়, তবে আর কি সহজে তুলিয়া ফেলা যায়? বার বার এই রিপু ও পাপবাসনা প্রবল হইয়া মানুষকে নরকস্থ করে। যদি একবার কোন প্রবল পাপের সঙ্গে আত্মা বদ্ধ হয়, তবে তাহা আহারের সঙ্গে, বস্ত্রের

সঙ্গে, চলা ফিরার সঙ্গে, বাক্যালাপে, চিন্তাতে, কার্যেতে, এমন মিশিয়া যায় যে এই পাপের হাত কিছুতেই ছাড়ান যায় না। তখন তুমি আহার করিয়াও দোষী, পান করিয়াও দোষী, কাহার সঙ্গ লাভ করিয়াও দোষী। ভাল করিয়াও দোষী, মন্দ করিয়াও দোষী, এমন কি ঈশ্বরের কৃপামন্দিরে বাস করিয়া তাহাতেও দোষী। মানুষ পাপ ও নরকের দৌরাত্মে যখন এইরূপে অস্থির হয় এবং পাপীর মন স্বভাবতঃ মুক্তি কামনা করে, তখন তাহার জন্য মধ্যপথ পাওয়া যায়। ইহা স্বর্গও নহে, নরকও নহে। এই স্থানেও পাপীর ঘোর পরীক্ষা, প্রবল শাসন, এখানে সু অভ্যাস তেমন হউক আর না হউক, কু অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে হয়। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে পাপের অধিকার হইতে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

আমরা খুব পাপী নহি; কিন্তু ইহা কি বলিতে পারি যে, আমি আর রাগ করিব না, ইহা কি বলিতে পারি যে, আর কোন রিপুর বাধ্য হইব না, শাক্যের ন্যায় কি আমরা বলিতে পারি যে, "আমি মোহমুক্ত হইয়াছি, আমি পাপমুক্ত হইয়াছি।" আমি বলিতে চাহি না যে, ব্রাহ্মগণ মধ্যে অনেকে নরকে বাস করিতেছেন, কিন্তু অনেকে যে এই মধ্যভূমিতে বাস করিতেছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে পাপের সঙ্গে সংগ্রামে

লিপ্ত আছেন। কেহ কেহ প্রাতে সাধুসঙ্গ, বিকালে পাপীদিগের সঙ্গে সহবাস করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কেহ কেহ সাধুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও অন্যের সঙ্গে যেমন আবশ্যক তেমন ব্যবহার করেন। অতএব পতন ও উত্থান নিয়ত হইতেছে। যাহাদের এই মধ্যভূমিতে বাস করা হইতেছে তাহাদের এখানে অধিক কাল বাস করা হইবে না। পাপ ও পুণ্যের মধ্যস্থলে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। হয় পুণ্যপথে গতি হইবে, না হয় পাপে পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাই প্রকাশিত হইল যে ঈশ্বরবিচ্যুতিই পাপের মূল এবং নরকের পথ। অন্তরে বাহিরে আধিপত্য আর নরক একই। পাপের হলাহল পান করাই নরক ভোগ। নরক বলিয়া স্বতন্ত্র কোন স্থান নাই। মনুষ্যের অন্তরেই নরক। অন্তরস্থ রিপুগণ এই নরকের কৃমিকীট। ইহার বিষময় দংশনে মানুষ মৃত্যুসম যাতনা ভোগ করে। এই নরকভোগ কখন শেষ কে বলিতে পারে? এই মাত্র বলা যায় যে, পাপদগ্ধ হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হইয়া যদি ঈশ্বরলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়, তবে ঈশ্বরপ্রসাদে পাপী ক্রমে ক্রমে এই নরক হইতে মুক্তি লাভ করে।

ভাবযোগসম্বন্ধে কথা এই যে, যে বস্তুর সঙ্গে বা

যে ব্যক্তির সঙ্গে যে ভাবে একবার যোগ হয় তাহা সহজে ভাঙ্গে না। কোন বস্তুর সঙ্গে বা কোন ব্যক্তির সঙ্গে কু ভাবের যোগ হইলে, যত কাল এই বস্তু বা ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে, সে ভাবের অন্য ভাব হয় না। তেমনি সদ্ভাবের যোগ থাকিলে চিরকাল পবিত্র যোগ সংরক্ষিত হয়। আমরা যে সংসার করিয়া ডুবিলাম, সেই সংসার করিয়া বাবা নানক কত উন্নত হইলেন! পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে সকলেই কি পবিত্র ও স্বর্গীয় হয়। মুক্ত জীবের পক্ষেও একটি মুক্ত অবস্থা আছে। আগে যাহাতে ইন্দ্রিয়ের যোগ থাকে, পশ্চাৎ তাহা অতীন্দ্রিয় যোগ হয়। আগে ধনে যোগ, পরে তাহা ব্রহ্মযোগ হয়। নারীতে পবিত্র দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া পরম জননীর আকার অনুভব হয়। সমস্ত সংসার, সমস্ত বিষয় মানুষের পক্ষে নূতন হইয়া স্বর্গের সহচররূপে সংযুক্ত হয়। এই অবস্থা হইলেই নরকভোগ শেষ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গবাস দান করুন।

হে মুক্তিদাতা, স্বর্গের স্বর্গ তুমি। আমাদিগকে তোমাকে ভোগ করিতে দিয়াছ, আর স্বর্গভোগ করিতে কি দিবে না? যখন তোমার প্রেমসাগরে ডুবি, তোমাকে পাইয়া আত্মহারা হই, তখন রাগ দ্বেষ, হিংসা আর

থাকে না ; বিনা চেষ্টাতে তোমার প্রেমক্রোড় লাভ করি। তবে কেন বলি, তোমাকে ছাড়িয়া নরকে ডুবিলাম। তোমার সহবাসের অস্বাদ পাইয়াও কেন তাহা ভুলিয়া পাপের বাধ্য হইলাম ? সোণার সংসারে আমরা কেন পাপী হইলাম ? যে মুখে তোমার নাম করিয়া ধন্য হই, সেই মুখে উত্তেজিত কথা বলিয়া কেন অপবিত্র হই ? সিংহ শার্দ্দূলকে আবদ্ধ করা যায়, রসনাকে কি বশীভূত করিতে পারিব না ? অপবিত্রতা প্রত্যেক লোমকূপে প্রবিষ্ট। মৃত্যুর গহ্বরে পড়িয়া বুঝি প্রাণ হারাই। হে পতিত জনের সহায়, আমাদিগকে উদ্ধার কর। এমন কোন শাসনবিধি, এমন কোন বিস্ময়কর পরিত্রাণ আমাদিগকে দাও, যাহাতে আমরা পাপরিপুর হস্ত হইতে এবং এই ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেমন এই উপাসনাতে ধন্য হইতেছি, তেমনই নিত্য তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া সুখী হই। কাতর অন্তরে তোমার পবিত্র চরণে এই ভিক্ষা করিয়া আশা ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

BL 1255 Majumdar, Protap
.M23 Chunder, 1840-
v.4 1905.
Upadeśa